অনিঃশেষ
অন্তে ২
আলতামাশ

অনিঃশেষ আলো

[২]

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনিঃশেষ আলো

[২]

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
দাওরায়ে হাদীস (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১১৭১১৪০৯, ০১৭১৭৫৫৪৭২৭
e-mail: boighorbd@gmail.com; web: boighorbd.com

ইসলামের মশাল হাতে আরব থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন স্বর্ণযুগের মুসলমানরা। কুফরের আঁধার চিরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর বাঁকে-বাঁকে। রোমের কায়সার, ইরানের কেসরা! সেকালের দুই পরাশক্তি। তাদের পানে চোখ তুলে তাকায় এমন সাধ্য নেই কোনো রাজা-বাদশার। আরবের 'বদ্দু'রা তো গণনার বাইরে। কিন্তু 'আরবের বদ্দু' মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন কেসরার দম্ভ। জয় করে নিলেন ইরানের মাটি ও মানুষের মন। মুসলমানদের হাতে পরাজিত হলো রোমের দাম্ভিক রাজা হেরাক্ল। জয় হলো ফিলিস্তিন ও শাম।

ইতিহাস বিস্ময়ে হতবাক! আট-দশ হাজার মুজাহিদ। একের পর এক দুর্গ-নগরী জয় করে চলল। পরাজিত হলো মহাপ্রতাপশালী সম্রাট হেরাক্লিয়াসের লক্ষাধিক সৈন্যের সুবিশাল বাহিনী। পরবর্তী যুদ্ধে তাঁরা নিজেদের প্রমাণ করেন আরও সাহসী, শক্তিশালী, দুর্দান্তরূপে। জয় হলো সমগ্র মিশর। ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আলো আর আলো, যেন শেষ নেই এই আলোর। কী করে সম্ভব হলো তা? ইতিহাসে কী উত্তর লেখা আছে এ প্রশ্নের? উপন্যাসের আদলে সেই ইতিহাসেরই সবিস্তার বিবরণ ***অনিঃশেষ আলো***।

অনিঃশেষ আলো

এক

সে একটি সময় ছিল। কেমন ছিল তারা মুসলমান আর কেমন ছিল তাদের ঈমান! আজকের পাল্লায় পরিমাপ করুন; মনে হবে, হিসাব ভুল হয়ে গেছে। প্রতীয়মান হবে, এই যে আমরা ইসলামি জয়ের ঐতিহাসিক কাহিনীগুলো পড়ছি, এগুলো বানানো গল্প।

এটি মানবীয় স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ, যেটি প্রকৃতির অটুট নিয়মের অধীনে আত্মপ্রকাশ করে। আর এটি কর্ম ও কর্মফলের দর্শন যে, ফলাফল কাজের অনুরূপ হয়ে থাকে। মানুষ যদি ভুল চিন্তায় পড়ে যায়, তা হলে মস্তিষ্কের কম্পিউটার তার অপারগতার কথা জানিয়ে দেয়। সেই চিন্তার ফলাফল ভুলই হয়। মুসলমান যদি ঈমান থেকে হাত ধুয়ে ফেলে, তা হলে তার চোখে কালকের ইতিহাস আজকের বানানো কাহিনীতে পরিণত হয়। তারাও মুসলমানই ছিলেন, যারা ঈমানকেই তাদের একমাত্র প্রিয় সম্পদ মনে করতেন এবং তাদের চোখে তাদের জীবনের কোনো গুরুত্বই ছিল না। সেটি ঈমানেরই শক্তি ছিল যে, সেই মুসলমানরা সে-যুগের দৈত্যকায় সামরিক শক্তিগুলোকে উপাখ্যানে পরিণত করে দিয়েছিলেন, যেন তাদের সারবত্তা বলতে কিছুই ছিল না।

দুই পরাশক্তি পারস্য আর রোম যখন পরস্পর লড়াই করত, তখন মনে হতো, যেন আসমান-জমিন সব কাঁপছে। পারস্যের যখন যিনি রাজা হতেন, প্রজারা তাকে খোদা বলে মান্য করত। হাতে সামরিক শক্তি থাকলে আর পায়ে সম্পদ থাকলে মানুষ নিজেকে ফেরাউনের মতো খোদা মনে করে বসে। পারস্যের রাজারা নিজেদের খোদার পুত্র মনে করতেন। কিন্তু খোদা ও তাঁর রাসূলের অনুসারীরা যখন সত্যের বার্তা হাতে নিয়ে বের হলেন, তখন 'খোদার পুত্র' ইয়াযদাগরদ তার রাজধানী মাদায়েনকে সমুদয় সম্পদসহ মুসলমানদের পায়ে ছুড়ে ফেলে পালিয়ে গেলেন। ইনি ছিলেন পারস্যের সর্বশেষ কেসরা। তার গোটা সাম্রাজ্যের উপর মুসলমানদের কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে পারস্যে রাজতন্ত্রের ধারা বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা মিশরজয়ের যে-কাহিনী শোনাচ্ছি, তার সঙ্গে ইয়াযদাগরদ-এর পলায়ন ও তার পরিণতির কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ইসলামের আসল প্রাণ উপস্থাপনের স্বার্থে এই ঘটনাটি সংক্ষেপে হলেও বর্ণনা করা আবশ্যক মনে করি। ইয়াযদাগরদ পারস্যকে মুজাহিদদের হাতে তুলে দিয়ে তুর্কিস্তান গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং মনে-মনে আশা জিইয়ে রাখলেন, একদিন-না-একদিন পারস্যে মুসলমানদের মাঝে বিদ্রোহ করানোর কাজে তিনি সফল হবেন এবং সেই সুযোগে তিনি পুনরায় তার শাসনক্ষমতা দখল করবেন আর তখন একজন মুসলমানকেও জীবিত বের হতে দেবেন না।

কয়েক বছর পর এই সুযোগটা তিনি পেয়ে গেলেন। তখন হযরত ওছমান ইবনে আফফান (রা.) খলীফা ছিলেন। খোরাসানে বিদ্রোহ হলো। ইয়াযদাগরদ এই সুযোগটাকে গনিমত মনে করলেন এবং তুর্কিস্তান থেকে মারাদ চলে গেলেন। তিনি বিভিন্ন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং বিদ্রোহের আগুনে তেল ঢালার খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুসলমানরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করে ফেললেন।

ইয়াযদাগরদ কিছু লোককে নিজের কাছে জড়ো করে নিয়েছিলেন। তারা সবাই পালিয়ে গেল। অগত্যা ইয়াযদাগরদ নিজেও যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানে আবার পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এবার তার পলায়নও সহজ রইল না। তার একান্ত কাছের কিছু লোক মুসলমানদের গুপ্তচর বলে প্রমাণিত হলো। মুসলিম সেনাপতি আদেশ জারি করলেন, ইয়াযদাগরদ কোথায় আছে খুঁজে বের করো এবং তাকে গ্রেফতার করো।

পলাতক প্রাক্তন পারস্যসম্রাট আত্মগোপন করে ঘুরে ফিরছিলেন। মুজাহিদরা তার চার পাশে ঘেরাও গুটিয়ে আনছিলেন। অবশেষে একদিন তিনি নদীর কূলে এক ব্যক্তির ঘরে গিয়ে লুকালেন। গৃহকর্তা মুজাহিদদের তার সন্ধান বলে দিলেন। একদল মুসলমান এসে এখানে হানা দিলেন। তারা আরবের মুসলমান তথা মুজাহিদ ছিলেন না। তারা ছিলেন খোরাসানের নাগরিক। তারা সেনাপতির আদেশ অনুযায়ী ইয়াযদাগরদকে গ্রেফতার করার পরিবর্তে হত্যা করে লাশটা নদীতে ফেলে দিলেন।

ইতিহাসে একটি বর্ণনা এমনও আছে যে, এই গৃহকর্তা ইয়াযদাগরদকে চিনতেন না। কিন্তু তার রাজকীয় পোশাক আর লুকোনোর ধরন দেখে অনুমানের উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত হয়ে গেলেন, ইনিই ইয়াযদাগরদ হবেন, যার গ্রেফতারির ঘোষণা হয়েছে। তিনি বাইরে থেকে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মারাদের গভর্নরের কাছে চলে গেলেন এবং তাকে তথ্য জানালেন, ইয়াযদারগদ আমার ঘরে এসে লুকিয়েছেন। গভর্নর একজন সালারকে আদেশ দিলেন, ইয়াযাদারগরদ-এর মাথাটা

কেটে আমার কাছে নিয়ে আসো। এই আদেশ শুনে গৃহকর্তা দৌড়ে ঘরে এসে নিজেই ইয়াযদাগরদ-এর মাথাটা কেটে ফেললেন এবং পরে যখন সালার এলেন, তখন মাথাটা তার হাতে তুলে দিয়ে ধড়টা নদীতে ফেলে দিলেন।

ইয়াযদাগরদকে কে কীভাবে হত্যা করেছে, ইতিহাসে এ-ব্যাপারে মতভেদ আছে। কিন্তু এই বর্ণনায় সমস্ত ঐতিহাসিক একমত যে, নদীতীরের এক গৃহকর্তার ঘরে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার মরদেহটা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

* * *

পারস্যসম্রাট কেসরার অগ্নিপূজক সাম্রাজ্য এভাবেই ইতিহাসের কবরস্তানে দাফন হয়ে গেল আর অপর দিকে রোমসম্রাট কায়সার– যিনি সামরিক শক্তি ও ধন-সম্পদে সত্যিকার অর্থেই দৈত্যকায় ছিলেন– আশ্রয় খুঁজে ফিরছিলেন। তাকে শাম থেকে কীভাবে উৎখাত করা হয়েছিল, তার কাহিনী উপরে বর্ণিত হয়েছে। হালব শামের সর্বশেষ দুর্গ ছিল। সেটিও মুজাহিদরা জয় করে নিলে তারও অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, না পারছিলেন থাকতে, না পারছিলেন কোথাও গিয়ে পালাতে। শাম ছিল দুর্গের দেশ। কোনো-কোনো দুর্গ এতটাই মজবুত ছিল যে, সেগুলোকে অজেয় মনে করা হতো। কিন্তু একটি দুর্গও তাকে আশ্রয় দিতে পারল না। তার বাহিনী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল আর পিছপা হচ্ছিল। যখন অর্ধেক শাম মুজাহিদরা দখল করে নিল, তখন সম্রাট হেরাকল তার বাহিনীকে মুসলমানদের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে পলায়নের পথ অবলম্বন করলেন। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, তাকে গ্রেফতার করে ফেলা হচ্ছে। গ্রেফতারি এড়াতে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

অবশেষে তিনি একটি নিরাপদ জায়গা দেখতে পেলেন আন্তাকিয়া। তিনি ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) সেখানেও পৌঁছে গেলেন আর হেরাকল-এর অবরুদ্ধ বাহিনী পালিয়ে গেল। হেরাকল ওখান থেকেও নিরাপদে বেরিয়ে গেল। এবার তিনি রুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ওখানকার দুর্গ বেশ মজবুত ছিল। কিন্তু ইসলামের সৈনিকরা ওখানেও গিয়ে গর্জে উঠলেন আর হেরাকল পালিয়ে গেলেন।

থাকল শুধু দুর্গঘেরা শামী নগরি হালব। মুজাহিদরা সেটিও নিয়ে নিলেন। কিন্তু হেরাকল হালব থেকে বেশ দূরে ছিলেন। তিনি আরও দূরে চলে যাওয়া শ্রেয় মনে করলেন। তিনি কুস্তুন্তুনিয়া (ইস্তাম্বুল) গিয়ে নিঃশ্বাস ফেললেন।

কুস্তুন্তুনিয়া ছিল তুর্কির (তুরস্কের) একটি নগরী। হেরাকল-এর আমলে সেখানে রোমানদের শাসন ছিল। কুস্তুন্তুনিয়ার এক নাম ছিল বাজিন্তিয়া। এই নাম সেসময় রাখা হয়েছিল, যখন সেখানে বাজিন্তিনির শাসন ছিল। হেরাকল-এর এক পুত্রের নাম ছিল কুস্তুন্তিন, যার আলোচনা এই উপাখ্যানে উপরে এসেছে। এই পুত্রকে

হেরাকল এত স্নেহ করতেন যে, তিনি বাজিন্তিয়ার নাম বদল করে আপন পুত্রের নামে কুস্তুন্তিন রাখলেন। বর্তমান (বিংশ) শতাব্দিতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর আতাতুর্ক মুস্তফা কামাল পাশা তুরস্কের শাসকের পদে অধিষ্ঠিত হলে কুস্তুন্তুনিয়ার নাম পরিবর্তন করে ইস্তাম্বুল রাখেন। আজ এই ইস্তাম্বুল তুরস্কের বড় একটি শহর।

মানচিত্রে আন্তাকিয়ায় চোখ রাখুন। তারপর ইস্তাম্বুল দেখুন। হেরাকল আন্তাকিয়া থেকে পালিয়ে ইস্তাম্বুল পৌঁছে গেলেন। দূরত্বটা প্রায় ৯০০ কিলোমিটার।

সে-সময়কার দ্বিতীয় বৃহৎ সামরিক শক্তি– যাকে আমি দৈত্যকায় বলেছি– শাম থেকে চির দিনের জন্য পালিয়ে গেল। রোম সাম্রাজ্য তখনও অবশিষ্ট ছিল। তুর্কি ও মিশর এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর রোম সম্রাটের পাঞ্জা এই দেশগুলোর উপর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল। কিন্তু তারপরও বলা যায়, অনেক বড় এবং খুবই বিষধর একটা সাপের কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দমটা তার নাকের ডগায় চলে এসেছে। আপনারা আগেই শুনেছেন, হেরাকল সহযোগী যে-বাহিনীটা তার পুত্র কুস্তুন্তিনের নেতৃত্বে মিশর থেকে তলব করেছিলেন, সেটির প্রায় অর্ধেক মারা পড়েছে আর বাকিরা মিশর পালিয়ে গেছে।

এখানে আমি আরও একটা বিষয় খোলাসা করা জরুরি মনে করছি। তা হলো, পেছনে বলে এসেছি, হেরাকল বাজিন্তিয়া খালি করে দেওয়ার আদেশ জারি করেছিলেন এবং নিজে আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে, হেরাকল বাজিন্তিয়া গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং আন্তাকিয়া ও হালবের বাহিনী ও জনসাধারণকে বলেছিলেন, তোমরা এই নগরী থেকে বেরিয়ে যাও আর সবাই যার-যার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো।

* * *

হেরাকল-এর ভাগ্য ভালো ছিল যে, মুজাহিদরা তার পিছু নেইনি। তাঁরা জয়ের-পর-জয় অর্জন করে ফিরছিলেন। তাঁরা প্রত্যয় নিয়ে রেখেছিলেন, শামের সীমানা পেরিয়ে তাঁরা আরও সামনে চলে যাবেন। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) সুসংবাদ পেয়ে গেলেন, শামের সর্বশেষ দুর্গটিও জয় হয়ে গেছে এবং রোমানরা শাম থেকে বেরিয়ে গেছে। এবার আমীরুল মুমিনীন সর্বপ্রথম আদেশ জারি করলেন, আর সামনে অগ্রসর হয়ো না; যেসব এলাকা বিজিত হয়েছে, সেগুলোর পরিচালনা ও প্রতিরক্ষাকে মজবুত করো। এমন আদেশ বা নির্দেশনা প্রদানের আবশ্যকতা ছিল না যে, বিজিত অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে ভালো আচরণ করো বা কাউকে পেরেশান করো না। কারণ, বিজিত অঞ্চলের লোকদের বিজিত মনে না করা এবং তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মুসলমানদের

চরিত্রেরই অংশ ছিল। এ ব্যাপারে তাদের কোনো নির্দেশনা প্রদানের আবশ্যকতা ছিল না।

অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়া ছিল পরম বুদ্ধিমত্তা। এটি ছিল হযরত ওমর (রা.)-এর সামরিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার কারিশমা। তাঁর জানা ছিল, মুজাহিদরা জয়ের আনন্দে মাতোয়ারা। তাঁদের মাঝে জিহাদের জযবা ছিল, শাহাদাদের তামান্না ছিল। কিন্তু তাঁর এটিও জানা ছিল যে, তাঁরাও তো রক্ত-মাংসেরই মানুষ– লোহার তৈরি কোনো বস্তু নয়। এমনও তো হতে পারে, তাঁদের দেহ জবাব দিয়ে বসবে আর শাম ছেড়ে পলায়মান রোমানরা কোথাও পা জমিয়ে মোড় ঘুরিয়ে ফিরে এসে পরাজয়কে জয়ে পরিণত করে দেবে।

মুজাহিদদের আনন্দের কোনো সীমা ছিল না। তাঁরা জয়ের আনন্দে বাগবাগ ছিলেন। সালারগণ তাঁদের দ্বারা শোকরানা নামায পড়িয়ে থাকবেন নিশ্চয়। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) হালবের জয়ের সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে গেলেন।

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রা.) কোন নামাযের ইমামত করেছেন, ইতিহাস দ্বারা তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি এসে নামাযের ইমামত করেছেন, এই তথ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। নামাযের পরে তিনি মুজাহিদদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন। তাঁর সেই সংক্ষিপ্ত ভাষণটি ইতিহাসের পাতায় শব্দে-শব্দে সংরক্ষিত আছে। তিনি শামের বিজয়ে মুজাহিদদের মুবারকবাদ জানানোর পর বললেন–

'পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক যে-সাহায্যের ওয়াদা দিয়েছেন, সেই সাহায্যের কল্যাণে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি যে, বাতিলের আরও একটা শক্তিকে পিষে ইসলামি সালতানাতের সীমানাকে আরও সম্প্রসারিত করে দিয়েছি। ইসলামি সালতানাতের কোনো সীমানা থাকে না। আমরা নিজেদের রাজত্বের জন্য নয়– আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঘর থেকে বের হয়েছি। এই জমিন পুরোটাই আল্লাহর। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ছাড়া আর কারও আইন চলতে পারে না। শহীদগণ আল্লাহর পথে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য জীবন কুরবান করে দিয়েছেন। যাঁরা শাহাদাতবরণ করেছেন, তাঁদের তো আল্লাহ নিজের কাছে আশ্রয় প্রদান করেছেন। কিন্তু সেই লোকগুলোর কুরবানি দেখুন, যাঁদের কেউ পা থেকে, কেউ হাত থেকে, কেউবা দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে বেঁচে আছেন এবং বাকি জীবন পঙ্গুত্ব নিয়ে অতিবাহিত করবেন। কিন্তু তাঁরা কারও মুখাপেক্ষী থাকবেন না। তাঁদের, তাঁদের স্ত্রী-সন্তানদের ও পিতামাতার জীবিকার ভার আল্লাহ নিজের জিম্মায় নিয়ে রেখেছেন। শহীদ ও পঙ্গুত্ববরণকারীদের স্ত্রী-সন্তান ও সংশ্লিষ্টদের সেই ভূমি জীবিকা দান করবে, যাকে তাঁরা আপন রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত করেছেন। নিজেদের দুনিয়ার চোখে দেখো না। তোমাদের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে। তোমরা

প্রতিদিনই কুরআন পড়ো। তোমরা কি পড়নি কিংবা শোননি, আল্লাহ তোমাদের সর্বোত্তম উম্মত বলেছেন আর তোমাদের এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তোমরা মানবতার কল্যাণে কাজ করছ– মানুষকে তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিচ্ছ আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখছ? মানুষকে অত্যাচারী রাজা-বাদশাদের থেকে মুক্ত করা এবং তাদের মিথ্যার শিকল থেকে আযাদ করে সত্যের পথে তুলে দেওয়ার চেয়ে বড় কল্যাণ আর কী হতে পারে? নিজেদের তোমরা অসহায় মনে করো না। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন।'

* * *

এই উপাখ্যানটি আমরা কিছুদিন পেছনে সেই সময়টাতে নিয়ে যাচ্ছি, যখন হালব জয় হয়েছিল। মুজাহিদগণ কিছু নগরীতে ঢুকে পড়েছিলেন, কিছু এখনও ঢুকছেন। আর নগরীর আশপাশে কাবায়েলি খ্রিস্টানদের মরদেহগুলো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। নগরীর নারীরা ও তাদের শিশুসন্তানরা নগরী থেকে বেরিয়ে গেছে এবং আপনজনদের লাশ খুঁজে ফিরছে। তাদের আহাজারিতে হৃদয়গুলো কাঁপছে। এক নারী চিৎকারের মতো উচ্চশব্দে বলে ফিরছে, আমাদের লোকেরা শেষ পর্যন্ত কোন যুদ্ধটা লড়ল! তার কার খাতিরে জীবন দিল!

'দুজন রোমান সেনাপতি আমাদের লোকগুলোকে বিভ্রান্ত করেছে।' এটিও এক মহিলার কণ্ঠ, যেটি কিনা পরক্ষণেই কয়েকজন নারীর কণ্ঠে পরিণত হয়ে গেল।

বেশ সুন্দর একটা চিড়িয়া এসেছিল'– এক মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল– 'ও মহিলাদেরও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিল।'

'এখন ও কোথায়?' এক মহিলা জিজ্ঞেস করল।

জীবিত পেলে ওকেও সেভাবে টুকরো-টুকরো করে ফেলো, যেভাবে ও আমাদের লোকদের হত্যা করেছে।' অপর এক মহিলার উত্তেজিত কণ্ঠে ভেসে উঠল।

এরা সেই নারী, যাদের পুরুষরা হয় মারা গেছে, নাহয় এমন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে, যাদের জীবনে রক্ষা পাওয়ার তেমন কোনো আশা নেই। শিশুরা অলি-গলিতে কান্নাকাটি করে ফিরছে। মহিলারা হেরাকল-এর স্ত্রী লিজাকে খুঁজছে আর বকে চলছে। হালবের মহিলারা তাকে এন্থনিসের স্ত্রী মনে করছে। অথচ এই যুদ্ধের সঙ্গে লিজার এতটুকু আন্তরিকতাও ছিল না। হেরাকল-এর সেনাপতি এন্থনিসের সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় ছিল, যার ফসল হিসেবে তার গর্ভে ইউকেলিস জন্মলাভ করেছিল। কিন্তু হালবে এসে লিজা এন্থনিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে রোমান অফিসার রাওতাসের সঙ্গে তেমনই অন্যায় সম্পর্ক গড়ে নিল, যার শাস্তিস্বরূপ দুজনই একে অপররের তলোয়ারের আঘাতে জীবন হারাল।

লিজা এমনই একজন নারী ছিল এবং এটিই তার চরিত্র ছিল। কিন্তু খ্রিস্টান কাবায়েলিরা তার কাছে এসে তাদের সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত এবং বলত, তোমরা তোমাদের পুরুষদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত করো এবং নিজেরাও তৈরি হয়ে যাও। সেই যুদ্ধটা সংঘটিত হলো এবং মহিলারা তার পরিণতি দেখল। এখন তারা তাদের নিহতদের জন্য বিলাপ দিচ্ছে। এখন তারা বুঝতে শুরু করেছে, তাদের লোকেরা একটা লক্ষ্যহীন যুদ্ধ লড়েছে এবং অনর্থন জীবনগুলো নষ্ট করেছে। লিজা তাদের যে-বুদ্ধি দিয়েছিল, এখন তাকে এরা প্রতারণা বলছে।

'একজন বলেছে, তার সেনাপতি স্বামী মারা গেছে'– এক মহিলা উচ্চৈঃস্বরে বলে ফিরছে– 'অপর রোমান সেনাপতিও শুনেছি মারা গেছে। তার ছেলের কোনো খোঁজ নেই।'

'ওই ডাইনিটাকে খুঁজে বের করো কোথায় আছে'– এক প্রবীণ মহিলা বলল– 'পেলে এই খঞ্জরটা দিয়ে ঝাঁজরা করে দাও।'

মহিলারা নগরীর একজায়গায় জড়ো হয়েছে। একজন সংবাদ জানাল, লিজা সেই ঘরটাতে মৃত পড়ে আছে, যেখানে রোমান ফৌজের অপর সেনাপতি রাওতাস বাস করত। মহিলারা সবাই সেদিকে ছুটে গেল। ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। ভেতরে গিয়ে সবাই দেখল, লিজা অলিন্দে রক্ত দ্বারা গোসল করে পড়ে আছে। মহিলারা যার-যার ভাষায় ও যার-যার মতো ঘৃণা জানাতে শুরু করল। একজন বলল, এই লাশটাকে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে ফেলে দাও। একজন বলল, না; ওর লাশ এখানেই থাকতে দাও আর ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও; পোকা-মাকড়রা ওকে খেয়ে ফেলুক।

আহতদের তুলে-তুলে নগরীর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাদের জন্য সামরিক ব্যারাক তৈরী ছিল। কিছু লোক তাদের আপনজনদের নিজেদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল। শত্রু-বন্ধুর ভেদাভেদ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আহত লোকটা মুসলমান ছিল বা খ্রিস্টান মুসলমানরা সবার সেবা-চিকিৎসার ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। মুসলিম মহিলারা এই কাজ আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। শারিনাও একাজই করছিল। একটা গলিপথ অতিক্রম করার সময় সে তার কানে আওয়াজ এল, এই ঘরে রোমান সেনাপতির স্ত্রীর লাশ পড়ে আছে। শারিনা মোড় ঘুরিয়ে সেই ঘরে চলে গেল। এখনও দু-তিনজন নারী ওখানে রয়ে গেছে।

দেখে শারিনা হতভম্ব হয়ে গেল, আরে এ তো লিজার লাশ! লিজাকে শারিনা খুব ভালো করেই জানে। লিজার চোখের সামনেই সে হেরাকল-এর মহলে জন্মেছে, প্রতিপালিত হয়েছে, বড় হয়েছে। তার মাও হেরাকল-এর স্ত্রী ছিল।

শারিনা এক তো এই ভেবে বিস্মিত হলো যে, লিজা এ পর্যন্ত এসে পৌঁছল কী করে! দ্বিতীয়ত একে হত্যা করলটা কে! মুসলমানরা তো নারীর গায়ে হাত তোলা জঘন্য পাপ মনে করে।

শারিনা যখন শুনেছিল, দুজন রোমান সেনাপতিও মারা গেছে, তখন সে তাদেরও লাশ দেখেছিল। রাজবংশের কন্যা বলে তার ফৌজের সবকজন সেনাপতিকে চিনত। এস্থনিসের লাশ দেখেও সে হতভম্ব হয়েছিল। রাওতাসকে তো সে বেশ ভালো করেই জানত। হেমসে সালার আবু উবায়দা (রা.)-এর আদেশে তাকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছিল। তখন শারিনা তার সঙ্গে মিলিত হতো।

এখন শারিনা লিজার লাশও দেখল। কিন্তু এই মহিলা এখানে কীভাবে এল,কেন এল, এই প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এস্থনিস ও রাওতাস সম্পর্কে সে নিজেই তথ্য বের করে নিল, হালবের খ্রিস্টানদের এরা দুজনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়েছে। আর এস্থনিসকে সম্রাট হেরাকল নিজেই এ লক্ষ্যে পাঠিয়ে থাকবেন। কিন্তু সম্রাট হেরাকল তার একজন স্ত্রীকে এখানে কেন পাঠালেন? প্রশ্নটা তার মাথায় ভনভন করতে লাগল। শারিনা কিছুই বুঝতে পারল না।

যে-দু-তিনজন মহিলা লিজার লাশের কাছে দণ্ডায়মান ছিল, তারাও বাইরে বেরিয়ে গেল। শারিনা অস্থির মনে ও বিস্মিত চোখে ওখানে দাঁড়িয়ে লাশটা দেখতে লাগল।

'না-না'– শারিনা একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেল– 'এটা হতে পারে না। সবাই মিথ্যা বলছে।'

শারিনা চমকে উঠল। এ সেই রূপসী তরুণী, যাকে সে ইউকেলিসের লাশের কাছে দেখেছিল। ইউকেলিস তাকে রোজি নামে ডেকেছিল এবং তার পরক্ষণেই সে মারা গিয়েছিল। শারিনা এই মেয়েটাকে ইউকেলিসের লাশের বসে হাউমাউ করে চিৎকার করা ও কান্নাকাটি করা অবস্থায় রেখে এসেছিল। তাকে একথাটাও জিজ্ঞেস করেনি যে, তুমি কে বা এর তুমি কী হও? এখন বোধহয় কেউ রোজিকে বলে থাকবে, ইউকেলিসে মায়ের লাশ অমুক ঘরে পড়ে আছে। শুনে সে ছুটে এসেছে এবং লিজার লাশটা ধরে এমনভাবে টানাটানি করতে শুরু করল, যেন তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলছে।

'তুমি মরতে পার না মা!'– রোজি লিজার লাশের মাথাটা নাড়াতে-নাড়াতে বলল– 'তুমি বলতে, আমাকে তুমি ইউকেলিসের বউ বানাবে। উঠো; ইউকেলিসের কাছে চলো; ও তোমার অপেক্ষা করছে।'

শারিনার চোখে অশ্রু নেমে এল। সে বুঝে ফেলল, এই মেয়েটা ইউকেলিসের মৃত্যুর বেদনা সহ্য করতে পারেনি এবং তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গেছে। শারিনা তার কাঁধে হাত রেখে ধরে তুলে দাঁড় করালেন।

'রোজি!'– শারিনা বলল– 'আমি একে জাগিয়ে তুলব। ইনি গভীর ঘুম ঘুমিয়ে আছেন। কী হন ইনি তোমার?'

'ইনি ইউকেলিসের মা'– শারিনা উত্তর দিল– 'আমার কিছু হন না। আবার আমার সব কিছু ইনিই। আমাকে ইউকেলিসের পাশে দেখে ইনি খুব খুশি হতেন। বলতেন, ছেলের জন্য আমি তোমারই মতো বউ খুঁজছিলাম।'

মেয়েটার জন্য শারিনার খুব মায়া লাগল। ভাবল, একে কীভাবে বোঝাব, তোমার ইউকেলিসও মারা গেছে, তার মাও দুনিয়া থেকে চলে গেছে; তোমার স্বপ্নের দুই ব্যক্তির একজনও এখন বেঁচে নেই। কিন্তু রোজি কল্পনার জগতে হারিয়ে গেছে। শারিনা তার সঙ্গে কথা বলতে থাকল। কিন্তু বলল না, এই যে-মহিলা বারান্দায় পড়ে আছেন, ইনি জীবিত নন।

এমন সময় আরেক মহিলা উক্ত ঘরে এল এবং মেয়েটাকে বাহুতে জড়িয়ে নিল। বয়সে ও আকার-গঠনে একে রোজির মা বলে মনে হলো। রোজিকে বলতে শুরু করল, ঘরে চলো; এখানে তোমার কোনো কাজ নেই। কিন্তু রোজি এমনভাবে উত্তর দিচ্ছিল, যেন লিজা জীবিত।

'এখান থেকে চলে যাও তুমি মা!'– রোজি বলল– 'আমি ইউকেলিসকে ডাকতে যাচ্ছি। ও এসে তার মাকে তুলে নেবে।'

শারিনা রোজির মাকে ইঙ্গিত করল, মেয়েকে আপাতত স্বাধীন ছেড়ে দিন। রোজির মাকে শারিনা একটা কক্ষে নিয়ে গেল এবং জিজ্ঞেস করলম, ব্যাপারটা কী? শারিন বুঝে ফেলেছে, ইউকেলিস ও রোজি একজন অপরজনকে ভালবাসত। কিন্তু তার আরও কিছু জানবার প্রয়োজন ছিল। রোজির মা তাকে সব শোনাল।

রোজির মা সমর্থন জানাল, রোজি ও ইউকেলিস একজন অপরজনের জন্য পাগলপারা ছিল। ইউকেলিস রোজিকে যা-যা বলেছে, রোজি সব তার মায়ের কানে দিয়েছে। ইউকেলিস বলেছিল, তার পিতা হেরাকল আর তার এক ভাই কুস্তুন্তিন তাকে খুন করাতে চাচ্ছে। তারই সূত্র ধরে এন্থুনিস তাকে ও তার মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। ইউকেলিস রোজিকে আরও বলেছিল, সে হেরাকল-এর নয়– এন্থুনিসের ঔরসজাত।

রোজি সমস্ত কথা তার মাকে বলে দিয়েছিল। এখন মা সেগুলো শারিনার কানে দিচ্ছে। ইউকেলিসের মায়ের স্বামী ছিলেন হেরাকল আর তার জনক ছিল একজন সেনাপতি এই তথ্যে শারিনা এতটুকুও বিচলিত বা বিস্মিত হলো না। কারণ, এমনটা রাজা-বাদশাদের জীবনে একটা সাধারণ বিষয় ছিল।

রোজির মা শারিনাকে এই তথ্যও জানাল যে, এন্থুনিস মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের সাম্রাজ্য গড়তে চাচ্ছিল, যাকে সে যিশুখ্রিস্টের সাম্রাজ্য আখ্যা দিত।

রোজির মা ও শারিনা কক্ষে বসে কথা বলছিল। এমন সময় তারা দুজনই বাইরে থেকে চিৎকারের মতো শব্দ শুনতে পেল– 'ইউকেলিস ও তার মাকে হেরাকল খুন করিয়েছেন; আমি সম্রাট হেরাকলকে হত্যা করতে যাচ্ছি।'

রোজির ধাবমান পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রোজির মা তার পেছনে-পেছনে ছুটে গেলেন। শারিনা এক বোঝা বেদনা মাথায় নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে লিজার মরদেহটা দেখল। বাইরে গিয়ে দেখল, রোজি নগরীর প্রধান ফটকের দিকে ছুটে যাচ্ছে আর তার মা পেছন থেকে চিৎকার করছে– 'ওকে ধরো, ওকে যেতে দিয়ো না।'

ওখানে পরিস্থিতিটা এমন তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো মা-ই তার মেয়ের খোঁজ রাখার সুযোগ পাচ্ছিল না। কিছু মানুষ লাশগুলো তুলে-তুলে আনছিল। অনেকে রক্তাক্ত জখমিদের ধরে-ধরে তাদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল। অঞ্চলটা একটা মৃত্যু-উপত্যকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

* * *

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) আদেশ দিয়ে রেখেছেন, ইসলামি সালতানাতের বিস্তৃতি আপাতত শামের সীমানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখো এবং এখন আর সামনে অগ্রসর হয়ো না। আবু উবায়দা ও খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এর তেজস্বী ও ইতিহাসনির্মাতা সিপাহসালারও আমীরুল মুমিনীনের এই সিদ্ধান্তকে বিচক্ষণতাসুলভ ও যথার্থ মনে করতেন। তাঁদের অনুভূতি ছিল, বিজিত অঞ্চলগুলো অনেক বিস্তৃত। এগুলোর শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং এগুলোকে প্রভাবকরূপে গড়ে তোলা খুবই জরুরি। কেবল জয় করতে থাকব, কেবলই সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকব আর পেছনের বিজিত লোকদের কথা ভুলে যাব এটা কোনো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। এভাবে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে এবং একজন দেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা তৈরি হতে পারে।

সব কজন সালার আমীরুল মুমিনীনের এই সিদ্ধান্তকে যথাযথ বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু একজন সালার এমন ছিলেন, যাঁর রক্তের ফোয়ারা শীতল হচ্ছিলই না। ইনি হযরত আমর ইবনে আস (রা.)। শামজয়ের আনন্দে তিনি সর্বান্তকরণে শরিক ছিলেন। কেন থাকবেন না? তিনি তো রাত-দিন এক করে এবং জীবনটা হাতে নিয়ে তিনি এই জয় অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এখনও তিনি শান্ত হতে পারেননি। এখনও তিনি ক্ষান্ত হতে পারছেন না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) যে-সময় হালব এসেছিলেন এবং মুজাহিদদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেছিলেন, হযরত আমর ইবনে আস (রা.) তখন অন্য এক নগরীতে ছিলেন। যেখানেই ছিলেন, তিনি তাঁর অস্থিরতা লুকোতে পারেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় আমীরুল

মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তকে অদূরদর্শিতা বলে মন্তব্য করে বসলেন। তিনি প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন। দিনকতক পর তাঁর এই অস্থিরতা ও প্রতিবাদী কথাবার্তা সিপাহসালার আবু উবাইদা (রা.)-এর কানে পৌঁছে গেল। আবু উবায়দা (রা.) সেখানে চলে গেলেন, আমর ইবনে আস (রা.) যেখানে ছিলেন। বিজিত অঞ্চলগুলো পরিদর্শনে ভ্রমণ করা এবং ওখানকার পরিস্থিতি দেখে আদেশ-নিষেধ জারি করা তাঁর আবশ্যক ছিল। সেই সঙ্গে হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-এর সঙ্গে কথা বলা তিনি বিশেষ জরুরি কাজ বলে বিবেচনা করলেন।

ওখানে পৌঁছেই তিনি আমর ইবনে আস (রা.)কে প্রথম কথাটি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এমন খাপছাড়া-খাপছাড়া কথা বলেন কেন, যার ফলে মুজাহিদদের উপর খারাপ ক্রিয়া পড়তে পারে?

'আমাদেরকে রোমানদের পিছু নেওয়া দরকার ছিল'– আমর ইবনে আস (রা.) বললেন– 'আমি মিশর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে চাই। রোমানরা ছিন্নভিন্ন হয়ে ভয়পাওয়া ভেড়া-বকরির মতো পলায়ন করছিল। আমরা যদি তাদের ধাওয়া করতাম, তা হলে অতি সহজে আমরা মিশর ঢুকে যেতে পারতাম।'

'আমি বিস্মিত আমর ইবনে আস!'– আবু উবায়দা (রা.) বললেন– 'আপনি কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন, খ্রিস্টান কাবায়েলিরা প্রতিটি শহরে শুধু এজন্য বিদ্রোহ করেছিল যে, ওখানে আমাদের লোকসংখ্যা খুবই কম ছিল? এ তো মহান আল্লাহ করুণা যে, আমরা প্রতিটি এলাকায় বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছি। আপনি খানিক চিন্তা করুন, আমাদের বাহিনী যদি এই দেশ থেকে বের হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায়, তা হলে আবারও বিদ্রোহ হয়ে যাবে এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে।'

নির্ভরযোগ ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়, আমার ইবনে আস (রা.) সাধারণ স্তরের সালার ছিলেন না। তাঁর চিন্তাও ভাসাভাসা বা আবেগতাড়িত ছিল না। মিশরকে সালতানাতে ইসলামিয়ায় যুক্ত করা তাঁর একটি প্রত্যয় ছিল। প্রত্যয়ও এমন, যেন আল্লাহ তাঁকে একাজেরই জন্য সৃষ্টি করেছেন। মিশরজয় তাঁর জন্য একটি উন্মাদনায় পরিণত হয়েছিল, যে-ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) পুরোপুরি অবগত ছিলেন। দিনকতক আগে যখন ফিলিস্তিনে রোমানদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন হযরত ওমর (রা.) বাইতুল মুকাদ্দাসজয়ের জিম্মাদারি হযরত আমর ইবনে আস (রা.)-এর কাঁধে অর্পণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি খারাপ সংবাদ শুনতে চাই না। উত্তরে হযরত আমর (রা.) একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন, 'আল্লাহ আমীরুল মুমিনীনকে জয়েরই সংবাদ শোনাবেন'।

* * *

সে-সময় বাইতুল মুকাদ্দাসে রোমানদের বিখ্যাত এক সেনাপতি ছিলেন, যার নাম ছিল আতরাবুন। তার সামরিক যোগ্যতা ও রণকৌশলে তিনি এতটাই দক্ষ ছিলেন যে, অনেক সময় সম্রাট হেরাকল স্বয়ং তার সামনে মাথা নুইয়ে দিতেন। এই সেনাপতি ছিলেন সালার আমর ইবনে আস (রা.)-এর প্রতিপক্ষ।

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রা.)-এরই মতো সুদক্ষ সমরনায়ক ছিলেন। শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার ঢং বেশ ভালোই জানতেন। হযরত ওমর (রা.)ও তাঁর এই যোগ্যতা ও গুণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। আর সেজন্যই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছিলেন। তাঁকে আতরাবুনের মোকাবেলায় পাঠানোর সময় তিনি মন্তব্য করেছিলে, 'আমি আরবের আতরাবুনকে রোমের আতরাবুনের মোকাবেলায় জড়িয়ে দিলাম। এবার দেখব, ফলাফল কী আসে।'

হযরত ওমর (রা.) আতরাবুনের সমরকৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন, রণাঙ্গনে আতরাবুন শেয়ালের মতো এমন কৌশল অবলম্বন করে যে, শত্রু তার ফাঁদে আটকে যায় এবং বুঝতেই পারে না, কী থেকে কী হয়ে গেল। পাশাপাশি আমীরুল মুমিনীন এও জানতেন, এই গুণ ও যোগ্যতাগুলো আমর ইবনে আস (রা.)-এর মাঝেও বিদ্যমান আছে।

আমর ইবনে আস (রা.) বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হলে দেখতে পেলেন, আতরাবুন তার বাহিনীসহ আজনাদাইনের দিকে যাচ্ছেন। আজনাদাইন ও বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যকার ব্যবধান তেমন বেশি ছিল না। আমর ইবনে আস (রা.) আতরাবুনের বাহিনীটা দেখলেন। পরে নিজের বাহিনীর প্রতি তাকালেন। অনুভূত হলো, সহযোগী বাহিনীর তাঁর বড় বেশি প্রয়োজন; আতরাবুনের সামনে তাঁর এই ক্ষুদ্র বাহিনীটি টিকতে পারবে না।

হযরত ওমর (রা.) সংবাদ পাওয়ামাত্র পেছন থেকে সহযোগী বাহিনী রওনা করিয়ে দিলেন এবং আমর ইবনে আস (রা.) আজনাদাইন ও বাইতুল মুকাদ্দাসের কাছাকাছি একজায়গায় ছাউনি ফেলে অবস্থান নিলেন। আমর ইবনে আস (রা.) বুদ্ধি ঠিক করলেন, সামরিক আক্রমণের আগে একটি মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণ চালাব। তিনি সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে আতরাবুনের কাছে দুজন দূত প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা আসলে ছিল গোয়েন্দা। তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল গোয়েন্দাগিরি যে, তোমরা দুর্গের অভ্যন্তরে গিয়ে দেখে আসো, তাদের সৈন্যসংখ্যা কত, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কেমন এবং দুর্গের ফটক কতখানি মজবুত ইত্যাদি। আতরাবুন দূতদের সসম্মানে বসালেন এবং

কথাবার্তা বলে বিদায় করে দিলেন। তিনি এমন আনাড়ী সেনাপতি নন যে, শত্রুপক্ষের দূতদের নগরীতে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করার সুযোগ দেবেন।

দূতরা ফিরে এলে সালার আমর ইবনে আস (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, বলো, কী-কী দেখে এসেছ এবং কী সংবাদ নিয়ে এসেছ? কিন্তু দূতরা তাঁকে হতাশ করে দিলেন যে, আমরা কিছুই দেখতে পাইনি এবং কোনোই সংবাদ আনতে সক্ষম হইনি।

হযরত আমর ইবনে আস (রা.) সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নিজে দূত সেজে যাবেন এবং তাদের বুঝতে দেবেন না, আমি স্বয়ং বাহিনীর সিপাহসালার। তিনি বেশ বদল করে রওনা হয়ে গেলেন।

আতরাবুন তাঁকেও সম্মানের সঙ্গে স্বাগত জানালেন। আমর ইবনে আস (রা.) নিজের পরিচয় দিলেন, আমি মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার আমর ইবনে আস-এর দূত। সন্ধিস্থাপনে প্রথমবারের দূতরা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর অতিরিক্ত আরও কিছু নির্দেশনা নিয়ে এসেছি।

সন্ধি নিয়ে আলোচনা হলো। আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, আপনার কথাগুলো আমি সিপাহসালারের কাছে পৌঁছাব এবং তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার আসব।

'আমার চোখ কখনও আমাকে ধোঁকা দেয়নি'– আতরাবুন মিটিমিটি হেসে বলল– 'আমি কোনো দূতের সঙ্গে নয়– আরবের সিপাহসালার আমর ইবনে আস-এর সঙ্গেই কথা বলছি। তুমি কি আমরা ইবনে আস নও?'

'না'– আমর ইবনে আস (রা.) উত্তর দিলেন'– 'আমি যদি আমর ইবনে আসই হতাম, তা হলে অযথা নিজের উপর মিথ্যা আবরণ তৈরির কোনোই প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সিপাহসালার আমর ইবনে আস এতই নির্ভীক ও দুঃসাহসী মানুষ যে, তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি।'

এবার আতরাবুন হি-হি করে হেসে দিল। বোঝাতে চেষ্টা করল, যেন সে মেনে নিয়েছে, ইনি আমর ইবনে আস নন; বরং তার দূত। তারপর কথার ফাঁকে আতরাবুন বাইরে বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এসে আবার আলোচনা শুরু করল।

আতরাবুনের বের হওয়া দেখে আমর ইবনে আস (রা.) বুঝে ফেললেন, এখন আর আমার রক্ষা নেই। আমি ধরা খেয়ে গেছি। এখন তারা হয়ত আমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে আটকে রাখবে নাহয় হত্যা করে ফেলবে। তিনি মাথায় বুদ্ধি আনতে চেষ্টা করলেন, কীভাবে এখান থেকে বের হওয়া যায়। কিন্তু কোনো উপায় তাঁর মাথায় এল না। যদি এই সাক্ষাত দুর্গের বাইরে কোথাও হতো, তা হলে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ বের করা যেত। কিন্তু নগরীর ভেতর থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিল না।

অবশেষে তাঁর মাথায় বুদ্ধি একটা এল। তিনি এমন একটা ভাব ধরলেন, যেন আতরাবুনের সবগুলো শর্ত তিনি মেনে নিয়েছেন। এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন, যেন রোমানদের শক্তি দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েছেন।

আমর ইবনে আতরাবুনকে বললেন, এবার শুনুন; আমি আমার আসল পরিচয়টা বলি। আমি আমর ইবনে আস-এর দূত নই– আমাকে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) প্রেরণ করেছেন। আমার সঙ্গে দশজন উপদেষ্টা আছেন। তাঁরা দুর্গ থেকে খানিক দূরে একজায়গায় বসে আমার অপেক্ষা করছেন। আমি গিয়ে তাদের নিয়ে আসব। তারপর আপনার শর্তগুলো মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেব।

আতরাবুন শুনে খুব খুশি হল যে, একজন নয়– দশজন মুসলমান তার জালে এসে ধরা দিয়েছে। সে আমর ইবনে আস (রা.)কে বলল, ঠিক আছে; তাদের এখানে নিয়ে আসুন।

আমর ইবনে আস (রা.) ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর জন্য দুর্গের ফটক খোলা হলো। বাইরে বের হয়েই ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি জীবনে রক্ষা পেয়ে চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে কোনো উপদেষ্টা ছিলেন না। তিনি একা ছিলেন। আতরাবুনের চোখে ধুলা দিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন।

ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাও লিখেছেন, আলোচনা চলাকালে যখন বাইরে বের হয়েছিল, তখন তার রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে এসেছিল, এই যে আরব লোকটা ভেতরে বসা আছে, যখন সে দুর্গ থেকে বের হতে যাবে, তখন তাকে হত্যা করে ফেলবে কিন্তু পরে যখন সে নিজেই আমর ইবনে আস (রা.)-এর ফাঁদে পড়ে গেল, তখন পুনরায় বাইরে গিয়ে বলে এল, লোকটাকে নিরাপদে চলে যেতে দিয়ো। এ সঙ্গে করে আরও কিছুলোক নিয়ে ফিরে আসবে।

আতরাবুন যখন বুঝতে পারল, মুসলমানদের সিপাহসালার আমর ইবনে আস তাকে ধোঁকা দিয়ে জীবিত বেরিয়ে গেছেন, তখন রাগে-ক্ষোভে তিনি আগুন হয়ে গেলেন এবং যাকেই সামনে পেলেন, তারই উপর কোপ ঝাড়তে শুরু করলেন।

* * *

তারপর যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় হলো, তার বিবরণ প্রথম দুই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে তার সঙ্গে আরও কিছু তথ্য যোগ করছি।

বাইতুল মুকাদ্দাস খ্রিস্টানদের জন্য অতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল, যতখানি গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানদের জন্য। কিন্তু রোমান খ্রিস্টানরা যখন দেখতে পেল, মুসলমানরা একের-পর-এক বিজয় অর্জন করে চলছে, তখন তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের বরকতময় ও ঐতিহ্যবাহী বস্তুগুলোকে ইস্তাম্বুল সরিয়ে নিতে শুরু

করল। পাশাপাশি সম্রাট হেরাকল ওখানে সেনাসংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন এবং তার নেতৃত্ব সেনাপতি আতরাবুনের হাতে অর্পণ করলেন। খ্রিস্টান বাহিনী ও নাগরিকদের ধর্মীয় চেতনাকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য উপস্থিত ছিলেন প্রধান পাদরি সাফরিনুস। তিনি রোমান বাহিনীকে ধর্মীয় ব্যাপারে এতখানি আবেগপ্রবণ করে তুললেন, যেন বাহ্যত তারা প্রবল ঝড়ের রূপ ধারণ করল। তারা প্রত্যয় নিল, এত সহজে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে হাত গুটিয়ে নিতে রাজী নয়।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস বাইতুল মুকাদ্দাসকে অবরোধে নিয়ে নিলেন। কিন্তু মোকাবেলা এতখানি তীব্র ও রক্তক্ষয়ী ছিল যে, অবরোধ সফল হওয়ার কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। আমর ইবনে আস পিছন থেকে বিশেষ সাহায্যের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং আমীরুল মুমিনীনকে বার্তা পাঠালেন, যত বেশি সাহায্য পাঠানো সম্ভব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) প্রতিটি রণাঙ্গনের তরতাজা পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকতেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের রণাঙ্গনের খবরাখবর তো তিনি আরও বেশি জানতেন। তাঁর জানা ছিল, বাইতুল মুকাদ্দাসে আতরাবুনের মতো অভিজ্ঞ ও ঘাঘু সেনাপতি বিদ্যমান রয়েছেন এবং হেরাকল-এর সবটুকু মনোযোগ বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর নিবদ্ধ। সবকিছু বিবেচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি নিজেই সাহায্য নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের রণাঙ্গনে হাজির হবেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) বেশ কিছু সাহায্য নিয়ে মদীনা থেকে রওনা হলেন এবং জাবিয়া নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সিপাহসালার আমর ইবনে আস ও অন্যান্য সালারদের তিনি ওখানেই ডেকে পাঠালেন এবং যুদ্ধের নতুন পরিকল্পনা ঠিক করলেন।

ইতিহাসে স্পষ্টরূপে লিখা আছে, রোমানদের গুপ্তচর সবজায়গাই বিদ্যমান ছিল। তারা হযরত ওমর (রাযি.)-এর আনীত সাহায্য দেখে ফেলেছে। আরও দেখেছে, হযরত হযরত ওমর তাঁর সবকজন সালারকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তারা পুরো রিপোর্ট আতরাবুনের কাছে পৌঁছিয়ে দিল। এক বর্ণনায় আছে, আতরাবুন নিজে বেশ বদল করে ওখানে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের এসব তথ্য নিজে সংগ্রহ করেছিল।

মুসলমানরা সাময়িকের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন। এখানে একটা মজার ঘটনা ঘটল যে, প্রধান পাদরি দূতমারফত বার্তা পাঠিয়েছিলেন, হযরত ওমর যদি নিজে বাইতুল মুকাদ্দাস আসেন, তাহলে দুপক্ষে সন্ধি হতে পারে। কিন্তু হযরত ওমর ও সকল সেনাপতি ধরে নিয়েছিলেন, রোমান সেনাপতি আতরাবুন তাঁদের ধোঁকায় ফেলতে চাচ্ছে। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর হযরত ওমর (রাযি.) বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারপর হযরত ওমর যে-

পোশাকে এবং যেভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, সে এক মজার কাহিনী। কিন্তু অত কথা লেখার জায়গা তো এখানে নেই। এখানকার আলোচ্যবিষয় ভিন্ন কিছু। অবশ্য এতটুকু বলে রাখব যে, হযরত ওমর যখন বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করলেন, তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের বড় এক পাদরি তাঁকে বলেছিলেন, আপনি নগরীতে প্রবেশ করছেন; খানিক ভালো পোশাক পরে নিন এবং ঘোড়ায় চড়ে যান; তাহলে রোমানরা আপনাকে বুঝতে ভুল করবে না।

হযরত ওমর (রাযি.) পাদরিকে যে-উত্তরটি দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের আঁচলে আজও সংরক্ষিত আছে। আমীরুল মুমিনীন বললেন, 'আল্লাহ আমাদের যে-মর্যাদা দিয়েছেন, তা শুধু ইসলামের বদৌলতে দান করেছেন। ইসলামে পোশাক আর ঘোড়া মর্যাদার মাপকাঠি নয়। এসব জিনিস আমাদের প্রয়োজন নেই। মর্যাদা হয় মানুষের– উন্নত মানের পোশাক আর উন্নত জাতের ঘোড়ার নয়।'

প্রধান পাদরি সাফরিনুস স্বয়ং হযরত ওমরকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এলেন এবং যথাযথ সম্মানের সাথে তাঁকে নিয়ে গেলেন। আশা ছিল, আলোচনা হবে। উভয় পক্ষ যার-যার শর্তাবলি পেশ করবে। তারপর পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে। আবার এমনও হতে পারে, শেষ পর্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ হবে। কিন্তু ঘটল যা, তা হলো, প্রধান পাদরি সাফরিনুস বললেন, চুক্তির শর্তগুলো আপনি নিজের হাতে লিখুন।

হযরত ওমর (রাযি.) নিজের শর্তাবলি অনুযায়ী চুক্তিপত্র লিখলেন, যেটি খ্রিস্টানদের প্রধান পাদরি সাফরিনুস কোনো প্রকার আপত্তি ব্যতীত গ্রহণ করে নিলেন। এভাবে বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের ঝুলিতে এসে পড়ল।

আমীরুল মুমিনীন ও তাঁর সেনাপতি বিস্মিত হলেন যে, খ্রিস্টানদের দুর্ধর্ষ সেনাপতি আতরাবুনটা কোথায়! আমীরুল মুমিনীন সাফরিনুসকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেলেন, ও কিছু সৈন্য সঙ্গে করে রাতেই পালিয়ে গেছে এবং গন্তব্য তার মিশর। ব্যাপার হলো, মুসলমানদের অব্যাহত বিজয় দেখে আতরাবুন বুঝে ফেলেছিল, এরা বাইতুল মুকাদ্দাসও না নিয়ে ছাড়বে না এবং এখানে তার বাহিনী গণহত্যার শিকার হবে।

সামরিক বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আতরাবুন তার বাহিনীর মানসিক অবস্থাও আঁচ করতে পেরেছিল। তার বাহিনীর উপর মুসলমানভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ শুরু করার আগে তারা দেখে নিত, পালাবার পথ কোন দিকে। আতরাবুন বড়ই দূরদর্শী সেনাপতি ছিল। নিজের সামরিক শক্তি নষ্ট করার পরিবর্তে তার কাছে ভালো মনে হলো, বাহিনীটাকে সঙ্গে করে মিশর চলে চাই এবং ওখানে তাদের নতুনভাবে গড়ে তুলে পুনরায় মুসলমানদের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যাই।

আতরাবুন চুপিচুপি বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করে মিশর গিয়ে আশ্রয় নিল।

* * *

বাইতুল মুকাদ্দাসজয়ের পর একদিন সেখানেই হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে বসলেন এবং বললেন, একটি জরুরি কথা বলতে এসেছি। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, বলুন।

'আমীরুল মুমিনীন!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'আল্লাহর কসম! আপনি আতরাবুনকে ঠিক সেরকম জানেন, যেমন জানে আপনার ডান হাত বাম হাতকে। আমি কখনও মেনে নেব না, আমাদের আমীরুল মুমিনীন এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হবেন যে, আতরাবুন আমাদের ভয়ে এখান থেকে পালিয়েছে। আমরা আল্লাহর উপর সমীপে আশা রেখে চলার মতো মানুষ। আমরা স্বপ্ন দেখি না এবং নিজেদের প্রবঞ্চনায় লিপ্ত করা মুজাহিদদের চরিত্র নয়।'

'ইবনে আস!'– হযরত ওমর আমর ইবনে আসকে থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'যা বলতে চেয়েছ, দীর্ঘ ভূমিকা ছাড়া ঝটপট বলে ফেলো। আমি শুনছি।'

'আমীরুল মুমিনীন!'– হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের আতরাবুনের পেছনে যাওয়া উচিত।'

'তুমি কি এখনও যথেষ্ট মনে করছ না যে, আমরা কঠিন একটা রণাঙ্গন জয় করে ফেলেছি?' হযরত ওমর বললেন।

'না; একে আমি যথেষ্ট মনে করি না আমীরুল মুমিনীন!'– আমর ইবনে আস বললেন– 'আমরা যদি এই বিজয়কে যথেষ্ট মনে করে বসে থাকি, তা হলে আতরাবুন বাহিনী প্রস্তুত করে আমাদের আক্রমণ চালাবে। হেরাকল আর আতরাবুন এক শয়তানের দুটা নাম। আতরাবুন এতটাই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী যে, আল-জাজিরা ও ফিলিস্তিনের খ্রিস্টান গোত্রগুলোতে বিদ্রোহের জন্য উসকে দিতে পারে এবং নিজে মাটির তলে অবস্থান করে সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পারে। এমনসব প্রস্তুতির জন্যই সে মিশর গেছে। আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, আমরা তাকে স্থিরভাবে বসার সুযোগ দেব না। আমি আপনার অনুমতি চাই। মিশর অভিযান ও আক্রমণের আমি নেতৃত্ব দেব।'

'শুধু আতরাবুনের উপর নিজের সবটুকু মনোযোগ নিবদ্ধ করো না আমর!'– হযরত ওমর (রাযি.) বললেন– 'তুমি কি দেখছ না, আমরা ইরানের কেসরার বিরুদ্ধে লড়াই করছি এবং শামেও আমরা রোমের মতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে ময়দান খুলে রেখেছি? এমতাবস্থায় যদি এত দূরে আমরা আরও একটি রণাঙ্গন খুলে বসি, হতে পারে, আমাদের অবশিষ্ট ময়দানগুলো দুর্বল হয়ে যাবে।'

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর সঙ্গে হযরত আমর ইবনে আস (রাযি)-এর আলোচনা এখানেই শেষ হয়নি। তিনি আমীরুল মুমিনীন-এর সম্মুখে

মিশরের পুরো ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন। তারপর তিনি কুরআনের এমন কতগুলো আয়াত পাঠ করে শোনালেন, যেগুলোতে মিশরের আলোচনা আছে। বিশেষ করে তিনি বনী ইসরাইল ও হযরত মুসা (আ.)-এর কথা উল্লেখ করেন। হযরত মুসা (আ.) কীভাবে তাঁর জাতিকে নিয়ে ফেরাউন থেকে পলায়ন করেছিলেন, নীলনদ আল্লাহর আদেশে কীভাবে তাঁদের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল, ফেরাউন সেই রাস্তায় উঠে কীভাবে ডুবে মরেছিল পুরো কাহিনী বিস্তারিত শোনালেন। হযরত আমর বিশেষভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, আরবের মুসলমানরা ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী কখনও ভুলতে পারবে না এবং এই কাহিনীরই সূত্র ধরে আরবরা মিশরকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে রেখেছে। কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ এই ঘটনাটিকে নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) চুপচাপ হযরত আমরের কথাগুলো শুনছিলেন। এমন তো হতে পারে না, হযরত ওমরের জন্য কথাগুলো নতুন ছিল। মিশরের ইতিহাস ও কুরআনে মিশরের আলোচনা সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি আমর ইবনে আসকে থামালেন না যে, তোমার বলতে হবে না; এসব আমি জানি। হযরত ওমর দেখছিলেন, আমর ইবনে আস কোন নিয়তে এবং কোন চেতনায় কথাগুলো বলছেন। এমন তো ছিল না যে, আমর ইবনে আস মিশরের রাজা হতে চাচ্ছেন। বরং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, মিশর ছাড়া ইসলামি সালতানাত পরিপূর্ণ হতে পারে না।

আমর ইবনে আস (রাযি.) আরব ও মিশরের যোগসূত্রের ইতিহাসকে হযরত ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হেজাযবাসী, বিশেষ করে মক্কার অধিবাসীরা আরব-মিশরের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা ভুলতে পারে না। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) আরবদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন এবং তাঁর মা হযরত হাজেরা মূলত মিশরি ছিলেন। আর তা এভাবে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী সারার সঙ্গে ইরাক থেকে ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিন থেকে মিশর চলে গিয়েছিলেন। মিশরের বাদশা হযরত হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সামনে পেশ করলেন। ইবরাহীম (আ.) হযরত হাজেরাকে বিবাহ করে নিলেন এবং তাঁরই গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ.) জন্ম নিলেন। ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথমা স্ত্রী দেখল, ইবরাহীম (আ.) তাঁর তুলনায় নতুন স্ত্রী হাজেরার প্রতি বেশি মনোনিবেশ করছেন। তাতে তাঁর মনে অসন্তোষ জন্ম নিল এবং তিনি কসম খেলেন, তিনি হাজেরার সঙ্গে থাকবেন না। হযরত ইবরাহীম (আ.) হাজেরা ও ইসমাঈলকে জাযীরাতুল আরব চলে এলেন এবং সেই জায়গাটায় অবস্থান গ্রহণ করলেন, যেটি আজ মক্কা নামে খ্যাত। হযরত ইসমাঈল (আ.) জুরহুম গোত্রের এক মেয়েকে বিবাহ করলেন, যার গর্ভে তাঁর বারোটি পুত্রসন্তান

জন্ম নিল। তাঁর এই পুত্ররাই আরবের পূর্বপুরুষ। যেহেতু হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাতুল মিশরি, সেই সুবাদে আরবের সঙ্গে মিশরের একটি পবিত্র সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল।

তারপর হযরত আমর ইবনে আস আরব ও মিশরের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন এবং বললেন, মিশরের সঙ্গে আরবের সম্পর্ক শুধু বাণিজ্যিকই নয়–চেতনাগতও। বরং তাকে তিনি আত্মিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করলেন। তারপর বললেন, আরব মিশর সম্পর্কে বহু কিছুই জানত বটে; কিন্তু যখন কুরআন নাযিল হলো, তখন মিশরের সেই বিষয়গুলোও আরবদের গোচরীভূত হলো, যেগুলো কখনও তাদের মাথায় আসেনি। মিশরে ইরানি ও রোমানদের লড়াই দীর্ঘ দিন যাবত অব্যাহত ছিল। ইরানিরা ৬১৬ খ্রিস্টসনে মিশরের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করে এবং রোমানদের পরাজিত করে ৯ বছর মিশরের দখল প্রতিষ্ঠিত করে রাখে।

তারপর হেরাকল উঠে দাঁড়ালেন এবং ইরানিদের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করে তাদের মিশর ও শাম থেকে তাড়িয়ে দেন। আল্লাহপাক অহীর মাধ্যমে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন, রোমানরা একদিন-না-একদিন ইরানিদের উপর জয়ী হবে। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হলো। রোমানরা ইরানিদের মিশর থেকে তাড়িয়ে নিজদেশে পাঠিয়ে দিল।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন। যখন মুসলমানদের অবস্থা ঠিক হয়ে গেল এবং মুজাহিদ বাহিনী তৈরি হয়ে গেল, তখন নবীজি ইরানের কেসরা, রোমের কায়সার, হীরা, গাসসান ও ইরানের সম্রাটদের কাছে দূতমারফত দাওয়াত পাঠালেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে মিশর পাঠিয়েছিলেন, তাঁর নাম হলো হযরত হাতেব (রাযি.) আর চিঠির ভাষ্য নিম্নরূপ–

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মিশরসম্রাট মুকাওকিসের প্রতি।

শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর, যে সত্যের অনুসরণ করে।

আম্মা বা'দ!

আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। তুমি যদি ইসলাম কবুল করে নাও, তাহলে শান্তিতে থাকবে এবং আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ বিনিময় দান করবেন। হে কিতাবের অনুসারী! সেই বাস্তবতার দিকে চলে আসো, যার ব্যাপারে তোমরা ও আমরা একমত। আর তাহলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও দাসত্ব করব না, কোনো

বস্তুকে বা কোনো মানুষকে আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করব না। তারপরও যদি কোনো মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তাকে বলে দাও, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়।'

ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল হাকাম লিখেছেন, অন্য যেসব রাজা আল্লাহার রাসূলের পত্র পেয়েছিলেন, তারা সবাই নবীজির এই পত্র ও দূতের সঙ্গে চরম অবমাননাকর আচরণ করেছেন। বিশেষত ইরানের কেসরা। কেসরা নবীজির পত্রখানা ছিঁড়ে টুকরা-টুকরা করে ফেলেছিলেন। শুনে নবীজি মন্তব্য করেছিলেন, আল্লাহ তার রাজ্যকে এভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন। কিন্তু মিশরসম্রাট মুকাওকিস আল্লাহর রাসূলের পত্রখানা পরম যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং পূর্ণ মনোযোগসহকারে পাঠ করেছিলেন। রাতে তিনি দূত হযরত হাতেব (রাযি.)কে একান্তে ডেকে পাঠালেন এবং পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে নিজের পাশে বসালেন। তারপর বললেন, আপনার রাসূল সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। হযরত হাতেব (রাযি.) নবীজি সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন এবং তাঁর নবুওতের প্রমাণস্বরূপ জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য কতগুলো প্রমাণ উপস্থাপন করলেন।

'আমি জানতাম, একজন নবী আসবেন'– 'কিন্তু আমার ধারণা ছিল, এই নবী শামে আসবেন। কারণ, এর আগে সকল নবী-রাসূল ওখানেই প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি, একজন নবী দুর্যোগকবলিত ভূখণ্ড আরবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তোমাদের এই নবীর সমর্থন ও সহযোগিতায় আমাকে সঙ্গ দেবে না। সাবধান! এখানকার কেউ যেন তোমার-আমার এই কথোপকথন সম্পর্কে জানতে না পারে। আমি বুঝতে পারছি, এই ভূখণ্ডের উপর তোমারে নবীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমাদের নবীর সাথীরা আমাদের এই ভূমিতে চড়াও হবে এবং তারা দেশটা দখল করে নেবে। আমি কিবতিদের কাছে তাঁর সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করব না। তুমি তোমার বন্ধুর কাছে ফিরে যাও।'

পরদিন সকালে মুকাওকিস হযরত হাতেব (রাযি.)কে পুনরায় ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে পাশে বসিয়ে রেখে কেরানি দ্বারা আরবিতে একখানা পত্র লেখালেন–

'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের কাছে কিবতিসম্রাট মুকাওকিসের সালাম। আমি আপনার পত্রখানা পড়েছি। আপনি তাতে যা কিছু লিখেছেন এবং আমাকে যে-আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি তার সবই বুঝেছি। আমি জানতাম, একজন নবীর আগমন এখনও বাকি আছে। কিন্তু ধারণা ছিল, তিনি শামে আত্মপ্রকাশ করবেন। আপনার দূততে আমি যথাসাধ্য মর্যাদা দিয়েছি। আর আপনার সমীপে আমি দুটি মেয়ে উপস্থাপন করলাম, যারা কিবতিদের উঁচু বংশের সন্তান। আর বাহন হিসেবে আমি উন্নত জাতের একটা খচ্চর উপহার দিলাম।'

এই মেয়েদুটোর একজনের নাম ছিল মারিয়, যিনি নবীজির সহধর্মিণীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মিশরি ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকেল লিখেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে-মধ্যে বলতেন, 'তোমরা কিবতিদের সঙ্গে সদাচারের আদেশ মান্য করো। কারণ, তোমাদের উপর তাদের হক আছে এবং তোমাদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তাও আছে।'

* * *

হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)কে মিশরিদের সঙ্গে তাঁদের এই সম্পর্কের কথাও মনে করিয়ে দিলেন। কিবতিরা ছিল খ্রিস্টান। কিন্তু তারা আলাদা একটা সম্প্রদায় তৈরি করে নিয়েছিল। সে-সময় মিশরের উপর রাজত্ব ছিল সম্রাট হেরাকল-এর। তিনিও খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু কিবতি সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিবতি ছাড়া খ্রিস্টানদের আরও এক-দুটা গোষ্ঠী ছিল। তারা পরস্পর সংঘাত-সংঘর্ষে জড়িয়ে থাকত।

সম্রাট হেরাকল একাধিক গোষ্ঠীর সমন্বিত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটা সরকারি ধর্ম তৈরি করে নিয়েছিলেন এবং আদেশ জারি করলেন, সবাই এই ধর্মটিকে সঠিক বলে মেনে নাও। তিনি মিশরের রাজধানী এসকান্দারিয়ায় ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার নেতৃত্ব কায়রাস নামক এক পাদরির উপর ন্যস্ত করেছিলেন এবং তাকে এত ব্যাপক ক্ষমতা দিলেন যে, তিনি চরম বাড়াবাড়ি ও অবিচার-অত্যাচারের মাধ্যমে মানুষকে এই সরকারি ধর্মটি মেনে বাধ্য করলেন। অন্যান্য গোষ্ঠীর অনুসারীরা দমে গেল; কিন্তু কিবতিরা এই নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। কায়রাস তাদের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাতে শুরু করলেন। পুরো দশটি বছর কিবতি খ্রিস্টানরা কায়রাসের নিপীড়ন ও বর্বরতার শিকারে পরিণত হয়ে থাকল। তাদের আর্তি-আহাজারি শুনবার মতো কেউ ছিল না।

আমর ইবনে আস (রাযি.) আমীরুল মুমিনীনকে বললেন, মিশরের কিবতি সম্প্রদায়কে এই নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করা আমাদের দীনি কর্তব্য।

তারপর আমর ইবনে আস আমীরুল মুমিনীনের সামনে মিশরের উর্বর জমি, মূল্যবান পাথর ও খনিজ সম্পদের সমারোহ এবং সম্পদের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহর এই জমি থেকে উৎপন্ন ও অর্জিত সমুদয় সম্পদ রোমসম্রাটদের রাজমহলে চলে যায় আর এখানকার জনসাধারণ না খেয়ে-না পরে জীবন কাটায়। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সম্পদ উৎপাদন করছে, তাদের দুবেলা রুটির জোগান দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে আর তাদের শ্রমের ফসল রাজমহলের বিলাসিতায় ব্যয় হয়।

'আমীরুল মুমিনীন!'– হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) অতন্ত আবেগঘন ভাষায় বললেন– 'আমার মন বলছে, নীলনদ আমাদের ডাকছে। আমি আপনাকে আমার একটি ব্যক্তিগত কাহিনী শোনাতে চাই, যাকে আমি আল্লাহপাকের ইশারা মনে করছি।'

তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণের আগেকার মিশর গমন, সেখানকার একটি অনুষ্ঠানে যোগদান এবং ভাগ্যনির্ধারক বল তাঁর গায়ে পতিত হওয়ার ঘটনা সবিস্তার শোনালেন, যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা এই গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছি।

'আমীরুল মুমিনীন!'– ঘটনাটি শুনিয়ে হযরত আমর ইবনে আস বললেন– 'আমি কখনওই মাথায় এই চিন্তা ঢুকতে দেব না যে, বলের ইঙ্গিত ছিল, আমি একদিন-না-একদিন মিশরের রাজা হব। রাজত্ব শুধুই আল্লাহর। আমার প্রত্যয় হলো, মিশরে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করতে হবে। আমি আপনার অনুমতি চাই।'

হযরত ওমর (রাযি.) অত্যন্ত ধৈর্য ও মনোযোগের সাথে আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কথাগুলো শুনতে থাকলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তাঁর ধরন বলছিল, তিনি সম্মত হয়ে গেছেন। বাস্তবতাও এটিই ছিল যে, হযরত ওমর (রাযি.) সম্মত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মিশরের উপর সামরিক অভিযানের অনুমতি এত তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় না। তিনি হযরত ওসমান ইবনে আফফান ও মদিনার অন্য কয়েকজন সাহাবির সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু তাঁদের একজনও সম্মতি দিলেন না এবং বললেন, এখনই এত দূরে আরেকটি ময়দান চালু করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর এই চিন্তা ও প্রত্যয়কে খুবই মূল্যায়ন করলেন এবং তাঁকে খুব সাহস জোগালেন। তারপর তিনি নিজেও এর পক্ষে একটি পয়েন্ট তুলে ধরলেন। বললেন, কিবতি খ্রিস্টানদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা আছে বটে এবং আমাদের তাদের এই অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করব ঠিক; কিন্তু আমি শুনেছি, ওখানে নাকি আরও একটা নিপীড়নমূলক রীতির প্রচলন রয়েছে। যখন তাদের ফসলের জন্য পানির প্রয়োজন হয়, তখন নীলনদের প্রবাহ থেমে যায়। এর প্রতিকারের জন্য কিবতিরা প্রতিবছর একবার একটা কুমারী মেয়েকে তার পিতামাতার কাছ থেকে তাদের অনুমতিক্রমে নিয়ে আসে এবং মূল্যবান পোশাক ও অলংকারাদি পরিয়ে তাকে নীলনদে ফেলে দেয় আর মেয়েটা নদীতে ডুবে মরে যায় আর কিবতিরা বলে, এবার আর নীলনদের প্রবাহ থামবে না; এটি এখন বইতেই থাকবে।

আমর ইবনে আস তথ্যের সত্যতা ও বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, কিবতিরা যখন ইসলামের পথে উঠে আসবে, তখন ইনশাআল্লাহ এসব কুপ্রথারও অবসান ঘটবে।

* * *

এখন আমরা এই কাহিনীকে সেই জায়গাটিতে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে হালবে খ্রিস্টান গোত্রগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং মুসলমানদের হাতে নিজেদের গণ্যহত্যা করিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল।

সেনাপতি আবুউবায়দা (রাযি.) যখন হালবে পৌঁছলেন, তখন খ্রিস্টান গোত্রপতিরা তাঁর কাছে গিয়ে স্বীকারোক্তি দিল, আমাদের ভুল হয়ে গেছে এবং সেই ভুলের শাস্তি আমরা পেয়ে গেছি।

গোত্রপতিরা সেনাপতি আবুউবায়দাকে আরও জানাল, রোমান বাহিনীর এক সেনাপতি আর একজন অফিসার আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং তারা-ই আমাদেরকে মুসলমানবিরোধী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিল। আবুউবায়দা (রাযি.) শারিনার স্বামী হাদীদ ইবনে মুমিন খাযরাজ-এর কাছ থেকে আগেই তথ্য পেয়েছিলেন, এ্যান্থনিস ও রাওতাস এই গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করেছিল। হাদীদ সেনাপতিকে আরও জানিয়েছিল, হেরাকল-এর এক স্ত্রী আর তার যুবক পুত্রও পালিয়ে এখানে চলে এসেছে। হাদীদকে এসব তথ্য শারিনা জানিয়েছিল।

'আল্লাহু আকবার– আল্লাহু আকবার!'– সিপাহসালার আবুউবায়দা বললেন– 'রোমসাম্রাজ্য ডালপালাবিশিষ্ট একটা মহীরুহ ছিল। এখন দেখো, তার ডালগুলো কীভাবে ভেঙে-ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। একজন রোমান সেনাপতি বিদ্রোহ করে এদিকে চলে এসেছে। রোমসম্রাটের স্ত্রী পুত্রসহ তার সঙ্গে এসে পড়েছে। আপন সাম্রাজ্যের ভিত তৈরি করতে তারা এখানে এসেছিল। আল্লাহর ইশারা বোঝো, রোমসাম্রাজ্যের বিশাল বৃক্ষটা এভাবেই ভেঙে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে আর মাটি তার শিকড়গুলোকে পানি থেকে বঞ্চিত করে দেবে।'

সেনাপতি আবুউবায়দা (রাযি.) কয়েকদিন হালব অবস্থান করে হেমস ফিরে যান। তিনি শামের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন সালারের কর্তৃত্বে সোপর্দ করে বলে দিলেন, এই অঞ্চলগুলোর পরিচালনা, জিযিয়া ও অন্যান্য কর আদায়ের ব্যবস্থাপনা সচল করে তুলুন। এভাবে শামের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেল।

হালব ও আন্তাকিয়ার মধ্যখানে পঁয়তাল্লিশ মাইল পথের ব্যবধান। সেকালে এসব অঞ্চলের বেশিরভাগই ছিল বন। কিছু অংশ টিলাময়। অল্প কিছু এলাকা ছিল বালুকাময়। আন্তাকিয়া রোম-উপসাগরের কূলে অবস্থিত। ব্যবসায়ীদের সাম্পানগুলো মালামাল নিয়ে এখানে এসে ভিড়ে এবং এখান থেকেই পণ্য বোঝাই করে ফিরে যায়। মিশরে ব্যবসায়ীদের বন্দর ছিল এসকান্দারিয়া। এই সবগুলো

অঞ্চলের উপর এখন মুসলমানদের কর্তৃত্ব। এ অঞ্চলে খ্রিস্টানদের দু-তিনটা গোত্র আবাদ ছিল। তাদের বসতিগুলো একটা অপরটা থেকে দূরে-দূরে ছিল।

হালবজয়ের অনেক দিন পর আন্তাকিয়া থেকে হালবগামী, হালব থেকে আন্তাকিয়াগামী লোকেরা জানাল, এই অঞ্চলে একটা ডাইনি বা প্রেতাত্মা দিগ্বিদিক ঘুরে ফিরছে। প্রাণীটা মাঝে-মধ্যে চিৎকার করছে এবং কিছু একটা বলছে। কিন্তু তার কথা কেউ বুঝতে পারছে না। মানুষ তার শব্দ শুনে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে।

আজকের বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ডাইনি-প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। তেরোশো বছর আগে এ ব্যাপারে মানুষের মাঝে আরও বেশি পশ্চাদপদতা পাওয়া যেত। কেউ যদি বানিয়েও বলত, আমি একটা ডাইনি, একটা প্রেতাত্মা বা পরী বসে থাকতে দেখেছি, তাও মানুষ বিনাবাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করে নিত। সেখানে হালব-আন্তাকিয়া মধ্যকার অঞ্চলের ডাইনিটার আওয়াজ তো বহু মানুষই শুনেছে। কাজেই এসব খবর প্রত্যাখ্যান কিংবা অস্বীকার করার প্রশ্নই আসে না।

একদিন এক মুসাফির হালবে প্রবেশ করল এবং সরাইখানায় এসে উঠল। লোকটা এতটাই সন্ত্রস্ত ছিল যে, তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। সরাইখানার লোকেরা বুঝে ফেলেছে, পথে লোকটা ভয়ানক কিংবা রহস্যময় কিছু একটা দেখেছে। তারা লোকটাকে সাহস জোগাতে ও সান্ত্বনা দিতে লাগল। বলল, ব্যাপারটা আমাদের খুলে বলো; তা হলে আর কোনো মুসাফির ওপথে যাবে না।

সে বলল, আমি খচ্চরে চড়ে বস্তি থেকে হালবের দিকে আসছিলাম। একজায়গায় এসে খুব কাছে থেকে আওয়াজ শুনলাম, কে যেন বলছে– 'আমি তার রক্ত পান করব। সে আমার রক্ত ঝরিয়েছে।' তার সে চিৎকার শুরু করে দিল। শব্দটা নিঃসন্দেহে একজন মহিলার ছিল।

একে তো ঘন বন; মাঝে-মধ্যে টিলা-ঢিপি। তাই কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, ওটা কী বা কে। কোনো মানুষ, নাকি রহস্যময় কোনো সৃষ্টি। ফলে লোকটার মনে ভয় ধরে গেল এবং শরীরটা কেঁপে উঠল। সে দ্রুত ওই অঞ্চলটা অতিক্রম করে চলে আসতে চেষ্টা করল। কিন্তু বাহন তার খচ্চর। খচ্চর তো আর বেশি দ্রুত চলতে পারে না। খচ্চর ঘোড়ার মতো দৌড়াতে পারে না।

লোকটা টিলা-ঢিপির মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করে একজায়গায় এসে মোড় নিল। অমনি এক যুবতী মেয়ে তার সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল। মেয়েটার মাথার চুলগুলো এলোমেলো, মুখটা ফ্যাকাশে, পরিধানের কাপড়টা কয়েক স্থানে ছেঁড়া; কিন্তু খুবই রূপসী।

মুসাফিরের মনে চিন্তা এল, এই বন-বিয়াবানে এ-বয়সের এমন একটা মেয়ের কী কাজ থাকতে পারে? নিশ্চয় এটা কোনো মৃত মেয়ের প্রেতাত্মা কিংবা ডাইনি;

মানুষের রূপ ধারলণ করে আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে। লোকটা ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে খচ্চর থেকে নেমে গেল এবং প্রাণীটার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে পড়ল।

'আমি একজন গরিব মুসাফির'– মুসাফির অনুনয়-বিনয় করল– 'আমার ছোট-ছোট কয়েকটা ছেলেমেয়ে আছে। তাদের মুখে চারটা খাবার তুলে দিতে মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘুরে ফিরছি। বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি? আমার জীবনটা রক্ষা করুন।'

প্রাণীটা কোনো রা করল না, কোনো কথা বলল না। সে খচ্চরটার কাছে এল। জিনের সঙ্গে একটা থলে বাঁধা ছিল, যাতে মুসাফিরের পানাহারের সামগ্রী ছিল। থলের সঙ্গে ছোট একটা মশকও ছিল। প্রেতাত্মা থলেটা খুলে নিল। মশকটাও নিল। তারপর হাঁটু-গেড়ে-বসা মুসাফিরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

'হেরাকল কোথায়?' প্রেতাত্মা জিজ্ঞেস করল।

'আমি সঠিক বলতে পারব না'– মুসাফির কাঁপা কণ্ঠে উত্তর দিল–

'আমি শুধু এতটুকুই জানি, হেরাকল মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে শাম থেকে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু কোথায় গেছেন জানা নেই। হতে পারে, তিনি মিশর গেছেন। কারণ, মিশরে তাঁর রাজত্ব আছে। শুনেছি, এসকান্দারিয়ায় তার মহল আছে এবং তিনি সেখানে বাস করছেন।'

'আমি তার রক্ত পান করতে যাচ্ছি'– প্রেতাত্মা দাঁতে দাঁত পিষে বলল– 'ও আমার রক্ত ঝরিয়েছে। সে আমাকে হত্যা করিয়েছে। যদি তোমার জানা থাকে সে কোথায়, তা হলে আমাকে বলে দাও; অন্যথায় আগে আমি তোমার রক্ত পান করব।'

'আমার ছেলেমেয়েদের উপর এই অবিচার করবেন না'– মুসাফির কেঁদে-কেঁদে বলল– 'আমি গরিব মানুষ। রাজা-বাদশাদের খবর রাখতে আমি অপারগ। তুমি যদি খোদায় বিশ্বাস কর, তা হলে তাঁর নামে আমাকে জীবন ভিক্ষা দাও।'

মুসাফির সরাইখানার লোকদের বলল, প্রেতাত্মা আমার খাবারের থলে ও মশকটা নিয়ে একদিকে হাঁটা দিল। আমি আঁড়চোখে তার পানে তাকাতে-তাকাতে টিলার আড়ালে চলে এলাম এবং খচ্চরের পিঠে চড়ে হালবের দিকে এসে পড়লাম।

দিনকতক পর আন্তাকিয়ায় এমনই আরও দুজন মুসাফির এল। তাদের অবস্থাও প্রথম মুসাফিরের মতোই ছিল। তারাও ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। তারা মানুষকে বলছিল, অমুক পথে কেউ যেয়ো না; ওখানে একটা ডাইনি বা কোনো নিহত ব্যক্তির প্রেতাত্মা ঘুরে ফিরছে আর চিৎকার করছে। প্রথম মুসাফিরের মতো তারাও

প্রেতাত্মার একই বিবরণ দিল। তাদের কাছেও সে হেরাকল-এর কথা জিজ্ঞেস করেছে এবং তার রক্ত পান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

কিন্তু কোনো দিক থেকে এমন সাক্ষ-প্রমাণ পাওয়া গেল না যে, সে কোনো মানুষকে সামান্যতমও ক্ষতি করেছে কিংবা কাউকে উত্যক্ত করেছে। কাজ একটা-ই করেছে যে, যখন যাকে পেয়েছে, তার খাবারগুলো নিয়ে গেছে আর হেরাকল-এর রক্ত পানের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছে।

উক্ত অঞ্চলে ছোট-বড় যে-গোত্রগুলো ছিল, তাদের অধিবাসীরাও তার ডাক-চিৎকার শুনেছে। কিন্তু কখনও সে কোনো লোকালয়ে প্রবেশ করেনি।

তার ভয়ে মানুষ সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

পথচারীরা যেসব খবর ছড়িয়েছে, তাতে অনুমিত হচ্ছে, সে আন্তাকিয়ার দিকে যাচ্ছে। আন্তাকিয়াও তখন মুসলমানদের অধিকৃত অঞ্চল। কিন্তু সেসময় আন্তাকিয়ার গভর্নর কে ছিলেন ইতিহাস সে-ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে পারছে না।

* * *

প্রেতাত্মা হোক, ডাইনি হোক বা পাগলিনী হোক মেয়েটা আন্তাকিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। মানুষের কানে তার সংবাদ চলে পৌঁছে গেছে আগেই। এবার যখন তারা জানতে পারল, সে লোকালয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন তারা ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। জনতা এতটাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল যে, তারা এখন ঘর থেকে বের হওয়াই একরকম বন্ধ করে দিল।

একদিন চারজন লোক– যারা আন্তাকিয়ার অমুসলিম নাগরিক ছিল– মুসলিম সেনাপতির কাছে এসে বলল, দীর্ঘদিন যাবত একটা ডাইনির সংবাদ শুনে-শুনে মানুষ এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে যে, তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চরমভাবে ব্যহত হচ্ছে। ভয়ে জনতা ঘর থেকে বের হওয়াই ছেড়ে দিয়েছে এবং চলাফেরা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আমরা ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু শুনে এসেছি'– দলনেতা বলল– 'আমরা জানি, ডাইনি, প্রেতাত্মা ও জিন-পরীর সামনে মানুষ একদম অসহায়। এদের মোকাবেলায় মানুষ কিছুই করতে পারে না। কিন্তু আমরা শুনেছি, ইসলামের কোনো-কোনো আলেমের কাছে এমন শক্তি থাকে, যার মাধ্যমে রহস্যময় উপায়ে তাঁরা ওদের কাবু করতে ফেলতে পারেন।'

এরা মূলত নগরবাসীর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধিদল। নগরবাসী এদের মাধ্যমে আবেদন পাঠিয়েছে, মুসলমানরা যাতে এর একটা বিহিত করে এই শ্বাসরুদ্ধকর ও ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে তাদের মুক্তি দান করেন।

'হ্যাঁ; তোমরা ঠিকই শুনেছ'– সেনাপতি বললেন– 'ইসলামে এমন শক্তি আছে, যার দ্বারা ডাইনি, প্রেতাত্মা ও জিন-পরীদের কাবু করে ফেলা যায়। এই শক্তির রহস্য হলো একটি বিশ্বাস। আর তা হলো, যে মরে যায়, সে আর ফিরে আসে না। না আসল রূপে, না কোনো প্রেতাত্মার রূপে। ইসলাম একটি বাস্তববাদী ধর্ম, যে কিনা ডাইনি-টাইনি বিশ্বাস করে না। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও; তাহলে এই শক্তি তোমাদের মধ্যেও তৈরি হয়ে যাবে। তারপর প্রেতাত্মা বল আর ডাইনি বল, এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বীরত্বের সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে পারবে, তুমি কে?'

কিন্তু সালার অনুভব করলেন, ইসলামের এসব সূক্ষ্ম কথা এরা বুঝবে না। এদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তিনি তাঁর নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারকে ডেকে পাঠালেন। কমান্ডার এলে তাকে বললেন, যেকজন লোক দরকার নিয়ে যাও এবং এদের প্রেতাত্মার রহস্যটা বুঝিয়ে দাও।'

'মহামান্য সেনাপতি!'– প্রতিনিধিদলের এক সদস্য বলল– 'আপনার ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির উপর আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করতে চাই, এমন ঝুঁকি আপনি নেবেন না; আপনাদের লোকদের এমন বিপদের মধ্যে ফেলবেন না। হতে পারে, সে আপনার লোকদের দেখে উধাও হয়ে যাবে। আর তখন তারা নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু যদি উধাও না হয়, তা হলে তো সে অবশ্যই এদের ক্ষতিসাধন করবে আর সেই ক্ষতিটা হতে পারে অনেক মারাত্মক। আপনার লোকেরা তার হাতে প্রাণও হারাতে পারে।'

সেনাপতি তাঁর কমান্ডারকে বললেন, যদি তোমাদের দেখে ও উধাও না হয়, তা হলে ধরে এখানে নিয়ে আসবে।

নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডার দায়িত্বটা বরণ করে নিলেন। তিনি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে ডাইনিটার অবস্থান জেনে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। নানাজন নানা জায়গার নাম বলল যে, আমি অমুক স্থানে দেখেছি। এভাবে তিন-চারটা জায়গার নাম এল। এক-দুজন লোক একটা বিশেষ জায়গাও চিহ্নিত করল।

কমান্ডার বেশ কজন রক্ষীসেনা নিয়ে চার-পাঁচজনের একটা করে দল গঠন করলেন এবং তাদের নগরীর উপকণ্ঠে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন। তারা ডাইনির অনুসন্ধানে ঘন বন-বনানী ও টিলা-টিপির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সূর্যাস্তের সামান্য আগে রক্ষীদের একটি দল একজায়গা থেকে হাঁক-চিৎকারের শব্দ শুনতে পেল, কে যেন বলছে– 'আমি হেরাকল-এর রক্ত পান করতে যাচ্ছি।'

রক্ষীদের এই দলটি আরেকটি দলকে ডেকে আনল। এভাবে বারো-চৌদ্দজন রক্ষী একত্র হয়ে গেল। তারা ছড়িয়ে গিয়ে সামনের দিকে এগুতে লাগল। তার আগে তারা নিজেদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্ক একজনকে কমান্ডার নিযুক্ত করে নিল।

কমান্ডার বললেন, সবাই আল্লাহর নাম স্মরণ রেখে কুরআন পাঠ করতে থাকো। কমান্ডারের নির্দেশনা অনুসারে তারা ঘেরাওয়ের আদলে সামনের দিকে এগুতে থাকল। ওদিক থেকে থেমে-থেমে ডাইনিটা হাঁক-চিৎকার কানে আসছে, যাতে বোঝা যাচ্ছে প্রাণীটা ধীরে-ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

অবশেষে প্রাণীটা রক্ষীদের চোখে পড়ে গেল। তারা ওকে সেই অবয়বেই দেখল, যেমনটা নানাজনের কাছ থেকে শুনেছিল। কমান্ডার অর্ধবৃত্তের আদলে তার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন আর সে উলটো পায়ে আস্তে-আস্তে পিছনের দিকে সরে যেতে থাকল। দুই পক্ষের মধ্যকার দূরত্ব ধীরে-ধীরে কমে যেতে লাগল।

'তুমি যদি ডাইনি বা প্রেতাত্মা হও, তা হলে এক্ষুনি উধাও হয়ে যাও'– কমান্ডার বললেন এবং নিজের বর্শাটা হাতে নিয়ে এমনভাবে তাক করে ধরলেন, যেন ওকে আক্রমণ করবেন– 'আর যদি তুমি মানুষ হও, তা হলে আমাদের কাছে হাতে এসে ধরা দাও; তোমার সঙ্গে আমরা মানুষের মতোই আচরণ করব। আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আমরাও তোমাকে ভয় করি না, তুমিও আমাদের ভয় করো না।'

'আমাকে হেরাকল-এর কাছে পৌঁছিয়ে দাও'– ও বলল– 'হেরাকল আমার ঝরিয়েছে। আমি তার রক্ত পান করতে যাচ্ছি।'

'আমরা তোমাকে হেরাকল-এর কাছে পৌঁছিয়ে দেব'– কমান্ডার বললেন– 'তুমি তো জান, হেরাকল আমাদের শত্রু। আমরাও চাই কেউ তাকে হত্যা করুক। তোমার সঙ্গে আমরা আমাদের একজন লোক দেব। সে তোমার কাজও করে দেবে আর তার প্রহরায় তুমি নিরাপদও থাকবে।'

কমান্ডার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি বর্শাটা হাতে প্রস্তুত রাখলেন। পাশাপাশি তিনি তার মনভোলানো কথাবার্তাও বলতে থাকলেন। কমান্ডার ওর চিন্তার সঙ্গে নিজেকে একাকার করে নিলেন। এভাবে তিনি একেবারে কাছে চলে গেলেন এবং তার একটা বাহু ধরে ফেলে বললেন, আমাদের সঙ্গে এস; আমরা তোমার জীবন ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যাব।

মেয়েটা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই কমান্ডারের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। ঘোড়ার কাছে গিয়ে কমান্ডার তাকে নিজের ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলেন আর নিজে ঘোড়ার বাগ ধরে পায়ে হাঁটতে লাগলেন। বাহিনীর অন্যান্য রক্ষীরা সবাই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার।

তারা একনাগাড়ে মেয়েটার পানে তাকিয়ে আছে। সম্ভবত তারা ধারণা করছিল, এই বুঝি ডাইনিটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। কিন্তু সেনাপতির বাসভবনের সামনে এসে দাঁড়ানো পর্যন্ত সে বহাল তবিয়তে কমান্ডারের ঘোড়ার পিঠে বসা-ই রইল।

* * *

পশ্চিমাকাশে সূর্যটা ডুবে গেছে সে অনেকক্ষণ আগে। সেনাপতি পরম ব্যাকুলতার সাথে তাঁর রক্ষীবাহিনীর ফিরে আসার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। এতক্ষণে তাঁর মনে শঙ্কা ঢুকে গেছে, আমার লোকগুলো কোনো ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল কিনা! কোনো বিপদ তাদের গ্রাস করে ফেলল কিনা! ইত্যবসরে দারোয়ান এসে সংবাদ দিল, রক্ষীবাহিনী একটা মেয়েকে ধরে এনেছে। সালার হঠাৎ করে চমকে উঠলেন। বলতে-না-বলতে বাহিনীর কমান্ডার মেয়েটাকে নিয়ে সালারের কক্ষে ঢুকে গেলেন।

ইতিমধ্যে সালার বাসভবনের বাইরে বিপুলসংখ্যক উৎসুক জনতা এসে ভিড় জমাল। ডাইনি ধরার অভিযানের সংবাদ জনতা আগেই জেনে ফেলেছিল। অমুসলিম প্রতিনিধিদল সেনাপতির সঙ্গে কথা বলে ফিরে এই অভিযানের খবরটা জনতার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে টানটান উত্তেজনার মধ্যে জনতা অপেক্ষায় প্রহর গুণছিল, শেষ পর্যন্ত কী সংবাদ আসে। এখন তারা সেনাপতির বাসভবনের সামনে এসে ভিড় জমাতে শুরু করল।

উৎসুক জনতার এই সমাবেশের কথা সেনাপতিকে জানানো হলো। তিনি মেয়েটাকে একনজর দেখেই বুঝে ফেললেন, এ তো মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তিনি বললেন, বাইরে থেকে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে ভেতরে নিয়ে আসো।

দশ-বারোজন লোক ভিতরে প্রবেশ করল। সেনাপতি তাদের বসতে বললেন। সকলের দৃষ্টি মেয়েটার উপর নিবদ্ধ। মেয়েটা নির্লিপ্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন ও যে এতগুলো পুরুষ লোকের মাঝে বসা সেই অনুভূতিই তার নেই।

'তোমার নাম কী বেটী?' সেনাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার নাম ইউকেলিস।' মেয়েটা উত্তর দিল।

কক্ষে উপবিষ্ট লোকদের মাঝে ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল। একজন বলল, একজন বলল, এ তো পুরুষালি নাম আর এমন নাম তো রোমানদের হয়ে থাকে।

'আমি ইউকেলিস'– মেয়েটা বলল– আর ইউকেলিস হলো রোজি। উইকেলিস জীবিত আর রোজি খুন হয়ে গেছে।'

'রোজিকে কে খুন করেছে?' সেনাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

'হেরাকল'– মেয়েটা উত্তর দিল– 'আমি হেরাকলকে খুন করতে যাচ্ছি। আমি তার রক্ত পান করব। তোমরা একজন আমাকে সেই পথে তুলে দাও, যেপথে গেলে আমি হেরাকল-এর কাছে যেতে পারব।'

'তুমি কি তোমার আত্মা?– সালার জিজ্ঞেস করলেন– 'নাকি তোমার দেহ?'

'আমার আত্মা হলো ইউকেলিস' মেয়েটা উত্তর দিল– 'ইউকেলিসের আত্মা আমার মাঝে।'

মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কার কন্যা এবং কোথা থেকে এসেছ? কিন্তু সে এর কিছুই বলতে পারল না। উত্তরে যা-কিছু বলল, সবই অর্থহীন ও অবোধগম্য উচ্চারণ। সেনাপতি বুঝে ফেললেন, যে কারণেই হোক মেয়েটার মানসিক ভারসাম্য ঠিক নেই।

এ হলো হালবের রোজি, ইউকেলিসের সঙ্গে যার অপার ভালবাসা ছিল। ইউকেলিস হালবের অবরোধে মারা গেল আর রোজি তার মরদেহটা তখন দেখল, যখন শারিনা তার পাশে বসা ছিল। ইউকেলিস তখনও পর্যন্ত জীবিত ছিল। সে শারিনা ও রোজির হাতেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। তারপর রোজি ইউকেলিসের মায়ের লাশের কাছে গেল। ওখানে সে যে-প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল, তার বিবরণ আপনারা উপরে পড়ে এসেছেন। ইত্যবসরে রোজি মা ওখানে এসেছিল আর রোজি ঘর থেকে বেরিয়ে একদিকে দৌড়াতে শুরু করেছিল। রোজির মা তার পিছনে-পিছনে গিয়েছিল। কিন্তু রোজিকে হঠাৎ মাটি গিলে ফেলেছিল। রোজি তার মায়ের চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সে এত দ্রুততার সঙ্গে পলায়ন করছিল যে, তার মায়ের পক্ষে আর তাকে ধরা সম্ভব হয়নি।

ইউকেলিস তাকে বলেছিল, হেরাকল ও তার পুত্র কুস্তুন্তিন তাকে হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছে। ফলে তার মা সেনাপতি এ্যাহুনিসের সঙ্গে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। হেরাকল জানতেই পারেননি, ইউকেলিস ও তার মা লিজা কোথায় চলে গেছে।

রোজি যখন ইউকেলিসে রক্তাক্ত লাশটা দেখল, তখন শোক-বেদনা তার মাথাটাকে আমূল নাড়িয়ে তুলেছিল। তার মস্তিষ্কে বুঝ ঢুকে গেল, ইউকেলিসকে মুসলমানরা নয়– হেরাকল খুন করিয়েছে। সে এতটুকই জানত যে, আন্তাকিয়া থেকে বড়-বড় কিশতি-জাহাজ মিশর যাওয়া-আসা করে আর হেরাকল মিশর চলে গেছেন। সে ইউকেলিস-হত্যার প্রতিশোধ নিতে রওনা হয়ে গেল। সেযুগে পঁয়তাল্লিশ মাইল পথের দূরত্ব কম ছিল না। রোজি সাধারণ রাস্তা থেকে সরে বন-বাদাড়ের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করতে লাগল, যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। কিন্তু যেহেতু তার মাথাটা ঠিক ছিল না, তাই বন-বিয়াবানে ঘুরতে-ঘুরতে সে আন্তাকিয়ায় পৌঁছে গেল।

* * *

সেনাপতির পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল, মেয়েটাকে তিনি কী করবেন। তাঁর কাছে মেয়েটার মাতলামির কোনো চিকিৎসাও ছিল না। আর এটা তো হতেই পারে না যে, ইসলামি বাহিনীর সেনাপতি একটা মেয়েকে পাগলিনী মনে করে ঘর থেকে বের করে দিবেন। মেয়েটাকে ধরে জনসম্মুখে নিয়ে আসায় উপকার এটুকু হয়েছে যে, ডাইনি বা প্রেতাত্মা-ভীতি থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। ও যদি বলে দিত, ও কার কন্যা বা বাড়ি কোথায়, তাহলে সেনাপতি যে করে হোক তাকে পিতামাতার কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। যদি মুসলিম সেনাপতির জায়গায় কোনো রোমান সেনাপতি হতো, তা হলে মেয়েটাকে পাগলিনী সাব্যস্ত করে হত্যা করে লাশটা জঙ্গলে ফেলে দিত। কিন্তু এখানে তো কোনো কমান্ডার কিংবা সেনাপতির আইন চলে না। আইন চলে এখানে মহান আল্লাহর।

সেনাপতি মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তাকে ঘরের মহিলাদের হাতে সোপর্দ করে বলে দিলেন, একে গোসল করাও, ভালো পোশাক পরাও; তারপর খাবার খাওয়াও। ফিরে এসে তিনি সেই লোকদের মাঝে বসে পড়লেন, যারা তাঁর সাক্ষাতরুমে বসে আছে।

'আমাকে আপনারা পরামর্শ দিন'– সালার উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ করে বললেন– 'মেয়েটাকে আমি নিজের ঘরেও রাখতে পারি না; আবার এই অবস্থায় বেরও করে দিতে পারি না। তার দেখভাল ও সম্ভ্রমের হেফাজত এখন আমার দায়িত্ব। তাকে আমি একজন নিষ্ঠাবান ও হৃদয়বান মানুষের হাতে তুলে দিতে চাই, যে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে রাখবে। আমার ডাক্তার তার চিকিৎসা চালিয়ে যাবে। আশা করি, চিকিৎসা পেলে সে সুস্থ হয়ে যাবে আর তখন নাম-পরিচয় ও ঠিকানা বলতে পারবে।

সবাই চুপচাপ বসে আছে। তার মানে এই পাগলিনী মেয়েটার দায়িত্ব নিতে কেউ রাজী নয়। সকলের পিছনে তিন ব্যক্তি উপবিষ্ট। তারা পরস্পর কানাঘুষার মাধ্যমে পরামর্শ করছে বলে মনে হলো।

'আন্তাকিয়ার গভর্নর!'– তিনজনের একজন বলল– 'আমরা তিন ব্যক্তি মিশর থেকে এসেছি এবং কাজ সমাধা করে ফিরে যাচ্ছিলাম। এপথ দিয়ে অতিক্রম করার সময় শুনতে পেলাম, লোকেরা বলাবলি করছে, একটা প্রেতাত্মাকে ধরে আনা হয়েছে। ডাইনিটাকে দেখার জন্য আমরা থেমে গেলাম। আর এখন জানতে পারলাম, ওটা প্রেতাত্মা বা ডাইনি নয়– ও একজন মানুষ। আমরা নিশ্চিত মেয়েটা মুসলমান নয়। কোনো খ্রিস্টান কবিলার মেয়ে হবে নিশ্চয়। আমরা কিবতি খ্রিস্টান। আপনার যদি

আমাদের উপর আস্থা হয়, তাহলে মেয়েটাকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাই। অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে আমরা তার চিকিৎসা করাব। সুস্থ হয়ে গেলে যদি সে পিতামাতার কাছে চলে যেতে চায়, তাহলে আমরা তাকে ঠিকানামতো পৌঁছিয়ে দেব। আর যদি আমাদের কাউকে বিয়ে করে আমাদেরই সমাজে বাস করতে চায়, তাহলে তারও ব্যবস্থা করে দেব। মেয়েটা যুবতী। রূপ-সৌন্দর্য তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আমরা যেহেতু খ্রিস্টান আর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেও খ্রিস্টানই হবে, তাই আমাদের সঙ্গে গেলে তার কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে তার দেখভাল করব।'

উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে তার সমর্থনে তিন-চারটা আওয়াজ উঠল। অবশেষে সেনাপতি সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন– 'ঠিক আছে, তোমরা তাকে নিয়ে যাও। তবে যদি সে তোমাদের সঙ্গে যেতে রাজি না হয়, তখন কী হবে?'

'আন্তাকিয়ার গভর্নর!'– ওই লোকটি বলল– 'আশা করি, সমস্যা হবে না। মেয়েটা কিছুই বুঝবার যোগ্যতা রাখে না। তার মাথায় একটাই চিন্তা, সে হেরাকলকে খুন করতে যাচ্ছে। আমি তাকে বলব, তুমি আমার সঙ্গে চলো; আমি তোমাকে আমার কাছে রাখব এবং আমি আর তুমি দুজনে মিলে হেরাকলকে হত্যা করব। তখন সে আমার সঙ্গে যেতে দ্বিমত করবে না।

সবাই তার কৌশলটা পছন্দ করল এবং ধরে নিল, লোকটা আসলে বুদ্ধিমান এবং সামাজিক ব্যক্তিত্ব।

মেয়েটাকে ডেকে আনা হলো। সে যখন সেনাপতির সাক্ষাতরুমে প্রবেশ করল, সঙ্গে-সঙ্গে কক্ষটা নীরবতায় ছেয়ে গেল। ইতিমধ্যে তাকে গোসল করানো হয়েছে, ভালো পোশাক পরানো হয়েছে এবং খাবার খাওয়ানো হয়েছে। মেয়েটা এতই রূপসী যে, দেখার সাথে-সাথে সবাই বিস্ময়ে মূক হয়ে গেল। মুখে তার নিষ্পাপতার ছাপ। সেনাপতি মেয়েটাকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি তোমার জন্য তিনজন লোক ঠিক করেছি, যারা তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এবং হেরাকল-হত্যায় তোমাকে সহযোগিতা করবে।

মেয়েটার ওষ্ঠাধরে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠল। মিশরি লোকটি তার সঙ্গে মমতামাখা ও আশা জাগানিয়া কথা বললে সে তার সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল।

সেনাপতি তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেন, মেয়েটা আজকের রাতটা আমার ঘরে মেহমান থাকবে; কাল সকালে ফজর নামাযের পর-পর তোমাদের হাতে তুলে দেব।

* * *

পরদিন সকালে ফজর নামায আদায় করে সেনাপতি ঘরে ফিরে দেখতে পেলেন, তারা তিনজন ঘরে বসে আছে। তিনি রোজিকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা রোজিকে নিয়ে চলে গেল। আন্তাকিয়া থেকে এসকান্দারিয়া পর্যন্ত স্থলপথও ছিল। কিন্তু এক-দুদিন পর একটা জাহাজ এসকান্দারিয় যাওয়ার কথা আছে। তাই তারা নৌপথে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল।

রোজির মুখে একটা-ই বুলি– 'হেরাকলকে খুন করে আমি তার রক্ত পান করব। মিশরি লোকগুলো তাকে সাহস জোগাতে থাকল যে, একাজে আমরা তোমাকে সার্বিক সহযোগিতা দেব। আমরা তোমার সঙ্গে থাকব। রাতে রোজি শুয়ে পড়লে তারা জাহাজের ছাদে বসে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা মারছে, গল্প করছে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ছে।

'হুররিশ!'– একজন তার এক সাথীকে বলল– 'আমার বিশ্বাস জন্মে গেছে, তোমার মেয়েটা রক্ষা পেয়ে যাবে। মেয়েটা কুমারী বলেই মনে হচ্ছে।'

'আশা তো তা-ই করছি'– হুররিশ বলল– 'আমি এই ব্যথাটা বরণ করে নেওয়ার জন্য তৈরিই হয়ে গিয়েছিলাম যে, মেয়েটাকে আমার বলি দিতেই হবে। খোদার খাস মদদ যে, এই মেয়েটাকে পেয়ে গেলাম। আমাদের পাদরি যদি মেয়েটাকে কবুল করে নেন, তাহলে আমি কন্যা হারানোর বেদনা থেকে রক্ষা পেয়ে যাব।'

'রক্ষা পাবে নিশ্চয়'– অপর সাথী বলল– ' তুমি খোদায়ি মদদ পেয়ে গেছ।'

রোজিকে নিয়ে আসায় হুররিশের বিরাট এক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এ ছিল তার জন্য এমন একটা সমস্যা, যাকে সে অসহনীয় মনে করত। আন্তাকিয়ার গভর্নর ও মুসলিম সেনাপতির মনে ঘুণাক্ষণেরও সন্দেহ জাগেনি যে, এই লোকটা মানবীয় সমবেদনার আড়ালে তাঁকে ও রোজিকে ধোঁকা দিচ্ছে। রোজি তো কিছু বুঝবারই যোগ্য ছিল না।

কিবতি খ্রিস্টানরা বিশেষ একরাতে নীলনদকে একটা কুমারী যুবতী মেয়ে বলি দিত। ইতিহাসে এসেছে, যে-মেয়েটাকে বলি দেওয়া হতো, তাতে তার পিতামাতার সম্মতি থাকত। এমনটা কখনও হয়নি যে, কোনো মেয়েকে জোরপূর্বক তুলে এনে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

এবারকার বলি যে-গোত্রের জিম্মায় ছিল, সেই গোত্রে হুররিশের মেয়েটা-ই যুবতী ও কুমারী ছিল। অন্য যেসব মেয়ে ছিল, তারা হয় ছোট, নাহয় বিবাহিতা। পাদরি হুররিশকে বলে দিলেন, এ বছর তোমার মেয়েকে বলি দেওয়া হবে। হুররিশের সাকুল্য সন্তান এই মেয়েটা-ই। তার আর কোনো মেয়েও নেই, ছেলেও নেই। ফলে মেয়েটাকে সে জান-প্রাণ ভালবাসত আর মেয়েও তাকে অনুরূপ ভালবাসত। পাদরি

পিতার অনুমতি ছাড়া মেয়েকে বলি দিতে পারবেন না বটে; কিন্তু হুররিশের জানা আছে, সম্মতি না দিয়েও পার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। ফলে তার পরিবারে যথারীতি মাতম শুরু হয়ে গেল।

এতদিনে বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটাকে এই পরিণতির মুখোমুখি হতে হতো না। মেয়ের মা চেয়েছিলও বারবার। কিন্তু মায়ার জ্বালায় হুররিশ মেয়েকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে পারেনি। মেয়ে নিজেও বলির জন্য প্রস্তুত নয়। একবার সে চিন্তা করেছিল, গির্জায় গিয়ে পাদরিকে বলবে, আমার বিয়ে হয়নি বটে; কিন্তু আমি কুমারী নই। আমি অনেক বড় পাপী। দুজন যুবকের সঙ্গে আমি পাপ করেছি। কাজেই আমার বলি কবুল হবে না এবং নীলনদের প্রবাহ বন্ধই থাকবে।

কিন্তু হুররিশ ও তার স্ত্রী মেয়েকে কঠোরভাবে বারণ করে দিল এবং বলল, না; তুমি মিথ্যা বলো না। মিথ্যা বললে পাপও হবে আবার সমাজে আমাদের মান-সম্মানও ক্ষুণ্ন হবে। আবার এমনও হতে পারে, মানুষ বলবে, তুমি জীবন বাঁচাতে মিথ্যা বলছ।

বিষয়টা একটা কুপ্রথা ঠিক; নীলনদের প্রবাহ বন্ধ হওয়ার বিশ্বাসও ছিল ভুল। কিন্তু নিজেদের এই বিশ্বাসকে তারা অত্যন্ত কঠোরতার সাথে লালন করত। হেরাকল সরকারি যে-ধর্মটা চালু করেছিল, তাতে এই বলিপ্রথা হত্যার মতো অপরাধ ছিল। কিন্তু তারপরও এই কিবতিরা প্রথাটাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করত। নিরাপত্তার জন্য তারা দিনের বদলে রাতে এই বলিপর্ব সম্পাদন করত।

পাদরি যখন হুররিশকে বলেছিলেন, এ-বছর তোমার মেয়েকে বলি দেওয়া হবে, তখন সে কোনো প্রকার প্রতিবাদ ছাড়াই মাথাটা নুইয়ে দিয়েছিল। বলির রাত আসতে আরও মাসদুয়েক সময় বাকি আছে। মেয়ের চিন্তায় হুররিশ দিন-দিন বিমর্ষ হতে লাগল। এই পরিস্থিতিতে তাকে ব্যবসায়িক কাজে তার আর দুজন ব্যবসায়ী বন্ধুর সাথে আন্তাকিয়াসহ আরও দুটি জায়গায় যেতে হলো।

তার বন্ধুরা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তুমি খোদার নামে মেয়েকে বলি দিচ্ছ। আর এই বলিপর্ব অনুষ্ঠিত হয় মানবতার কল্যাণে। কাজেই খোদা তোমার এই বেদনাকে আনন্দে পরিণত করে দেবেন এবং এর বিনিময়ে তুমি অনেক পুণ্য লাভ করবে।

কিন্তু এসব কথা হুররিশের উপর কোনোই ক্রিয়া করছিল না। দিন-দিন তার মনোবেদনা বাড়তেই থাকল।

* * *

কাজ সমাধা করে হুররিশ মিশর ফিরে যাচ্ছিল। জাহাজের অপেক্ষায় দুদিন তাকে আন্তাকিয়ায় আটকে থাকতে হলো। ঘটনাক্রমে সে জানতে পারল, আন্তাকিয়ার গভর্নর এটা ডাইনি বা প্রেতাত্মা ধরিয়ে এনেছেন। ফলে তাকে দেখার জন্য গভর্নরের বাসভবনে সাক্ষাতক্রমে গিয়ে বসল। আলোচনার একপর্যায়ে রোজি তার হাতে এসে পড়ল।

ফেরার পথে একরাতে হুররিশ ও তার সঙ্গীরা রোজিকেও জাহাজের ছাদে নিয়ে বসাল এবং তার মনটা জয় করার নিমিত্ত হেরাকল-এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করল। হুররিশ তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কুমারী?

'তা তো অবশ্যই'– রোজি উত্তর দিল– 'আমি অতখানি কুমারী, যতখানি ছিলেন মারয়াম, যিনি ঈসা মসীহকে জন্ম দিয়েছিলেন। তা কথাটা জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

'তোমার উপর আমাদের কোনোই সন্দেহ নেই'– হুররিশ বলল– 'জিজ্ঞেস করলমা এজন্য যে, বড়রা বলেছেন, নির্যাতিত কুমারী মেয়ে যদি কোনো অত্যাচারীকে হত্যা করে, তাহলে কোনো পাপ হয় না। হেরাকল-এর মতো অত্যাচারী আরেকজন রাজার নাম আমরা কোনোদিন শুনিনি।'

জাহাজ এসকান্দারিয়ার জেটিতে গিয়ে ভিড়ল। যাত্রীরা সবাই নেমে পড়ল এবং যার-যার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। হুররিশের বাড়ি এসকান্দারিয়া থেকে বেশ দূরবর্তী এক গ্রামে। তাই তারা একটা উট ভাড়া করল। সময়টাও এখন গভীর রাত। তারা উটে চড়ে রওনা হলো।

পরদিন সকালে হুররিশ তার দুই বন্ধুকে নিয়ে সেই গ্রামটাতে গেল, যেখানে তাদের ধর্মীয় কেন্দ্রের অবস্থান। সবার আগে সে বড় পাদরির সঙ্গে দেখা করল এবং মিথ্যা তথ্য দিল, আন্তাকিয়ায় এক কিবতি খ্রিস্টানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, তার কারবার খুবই খারাপ হয়ে গেছে। এমনকি না খেয়ে দিন কাটানোর মতো অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। স্বপ্নে হযরত ঈসা (আ.) তাকে বলেছেন, তোমার কুমারী মেয়েটাকে নীলনদে বলি দিয়ে দাও; তাহলে তোমার কারবার ঠিক হয়ে যাবে। পাশাপাশি নীলের কূলে বসবাসকারী লোকদেরও প্রভূত কল্যাণ হবে এবং তাদের প্রার্থনায় তোমার জীবন সতেজ ও সুখময় হয়ে উঠবে।

হুররিশে সফরসঙ্গীরাও তার সাথে ছিল। গির্জায় বসে তারা তাকে সমর্থন জোগাল। এবং বলল, উক্ত কিবতি খ্রিস্টান তার মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং বলেছেন, এবছরই যেন একে নীলনদে বলি দেওয়া হয়।

হুররিশ প্রবল দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, মেয়েটাকে অবশ্যই বলি দিতে হবে। কারণ, ও আমাদের হাতে আমানত। আর আমানতে খেয়ানত করা উচিত হবে না। পাদরি তাকে দু-চারটা প্রশ্ন করলেন এবং বললেন, মেয়েটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

পরদিন রোজিকে গির্জায় নিয়ে আসা হলো। পাদরি তাকে দেখে শুধু এতটুকু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজের মর্জিতে এসেছ, নাকি তোমাকে জোরপূর্বক আনা হয়েছে? রোজি প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝেই উত্তর দিল, আমি নিজের মর্জিতে এসেছি।

ঘটনা কী ঘটতে যাচ্ছে, তার কিছুই রোজি জানে না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সরলমনা মেয়েটা পূর্ণ আস্থা ও আনন্দের সাথে কথা বলছিল, যেন মনে তার কোনোই শঙ্কা বা সংশয় নেই। পাদরি মঞ্জুরি দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে; এ-বছর একেই বলি দেওয়া হবে।

* * *

হুররিশ ও তার স্ত্রী রোজিকে পরম যত্নের সাথে তাদের ঘরে রাখল এবং তার সঙ্গে তার বিকৃত মস্তিষ্ক অনুপাতে কথাবার্তা বলতে থাকল। এভাবে তার জীবনের শেষ দিনটি এসে পড়ল। আজ রাত রোজিকে নীলনদে বলি দেওয়া হবে।

সন্ধ্যার সময় রোজিকে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হলো। তাকে হুররিশের মেয়ের মূল্যবান পোশাক ও অলংকারাদি পরিয়ে অপরূপ সাজে সাজানো হলো। নিজের কন্যাকে বাঁচানোর মূল্য হিসেবে হুররিশ তার সমুদয় স্বর্ণালংকার বিসর্জন দিয়ে দিল।

দশ-এগারো বছর আগে এই প্রথাটা প্রকাশ্যে পালন করা হতো। চারদিকে প্রচার করিয়ে দেওয়া হতো, আজ রাত নীলনদের কূলে অমুক স্থানে একটি মেয়েকে বলি দেওয়া হবে। দৃশ্যটা দেখার জন্য মানুষ দলে-দলে এসে জমায়েত হতো। ওই মেয়েটাকে পবিত্র মনে করে মানুষ তার হাতে চুমো খেত। কিন্তু হেরাকল এই বলিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা এবং সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছিলেন। তার পর থেকে তারা প্রতি বছর প্রথাটা লুকিয়ে-লুকিয়ে পালন করে আসছে। এখন আর এর জন্য প্রচার করা হয় না। জনতা জানে না, কবে বা কখন বলিপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

রোজিকে লোকালয় থেকে অনেক দূরে নীলনদের কিনারায় একজায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। হুররিশ তাকে বলেছিল, নদীর কূলে নিয়ে তোমাকে একটা নৌকায় তুলে এসকান্দারিয়া নিয়ে যাব। কিবতিদের বড় পাদরি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকটি গোত্রের জনাকয়েক নেতাও ছিল।

পাদরি রোজির গায়ে সুগন্ধময় পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কী যেন পাঠ করলেন। তারপর তার উভয় কাঁধে পালাক্রমে আঙুল রেখে বাহুতে ধরে

তাকে নদীর কূলে নিয়ে গেলেন। ওখানটায় কূল বেশ খাঁড়া ছিল। পাদরি রোজির পিছনে এসে তাকে একটা ঠেলা দিল আর হতভাগা মেয়েটা নদীতে পড়ে গেল।

রাত অন্ধকার ছিল। পাদরি ও অন্যান্য লোকেরা একটা ধর্মীয় গীত গাইতে শুরু করল। নদীটা বেশ গভীর ছিল। কিন্তু স্রোতে তেমন গতি ও তীব্রতা ছিল না। এর আগে কখনও এমন হয়নি যে, বলি-দেওয়া কোনো মেয়ে নদী থেকে জীবন নিয়ে উঠে এসেছে। যাকেই নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেই নদীতে ডবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু রোজির বেলায় ঘটনা ভিন্ন ঘটনা।

রোজি তার গোত্রের অধিপতির কন্যা। খুবই চঞ্চল ও চতুর মেয়ে। তার বসতির নিকট দিয়েই বয়ে গেছে ফোরাত নদী। রোজি তার কয়েকটা বান্ধবীকে নিয়ে ফোরাতে চলে যেত এবং সাঁতার কাটত। প্রথমে সাঁতরাত কূলে। পরে ধীরে-ধীরে নদীর অনেকখানি মাঝে চলে যেত, তীব্র খরের মধ্যে সাঁতার কেটেও সে নিরাপদে কূলে ফিরে আসত। একসময়ে রোজি একটা সুদক্ষ সাঁতারু মেয়ে হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। সে নদীর উঁচু-উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে নদীতে ঝাঁপ দিত এবং সাঁতার কেটে আবার বেরিয়ে আসত। তার পিতা তার নিরাপত্তার জন্য দুজন লোক ঠিক করে রেখেছিল। তারা তার সঙ্গে নদীতে চলে যেত এবং প্রয়োজনে তাকে ও তার বান্ধবীদের সাহায্য করত।

সেই রোজিকে এখন পিছন থেকে ধাক্কা মেরে নীলনদে ফেলে দেওয়া হলো। নদীতে নিক্ষিপ্ত সে না-জানি কী-কী ভাবনা ভেবেছিল। কিন্তু সবার আগে ভেবে নিল, যে করেই হোক নদী থেকে আমাকে প্রাণ নিয়ে বের হতে হবে।

নদীতে পড়ে যাওয়ার পর সে পানির উপরে উঠে আসার পরিবর্তে তলে দিয়েই সাঁতার কাটতে থাকল এবং খানিক দূরে চলে গেল। যখন দম বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, এবার সে উপরে উঠে এল এবং অপর কূলের দিকে সাঁতরাতে লাগল। অন্ধকারে তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। দেখবেইবা কে? এই ঘোর অন্ধকার রাতে যারা তাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে, সরকারের লোকদের হাতে ধরা খাওয়ার ভয়ে তারা তো সেখান থেকে চলেই গেছে।

রোজি অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে নদীর অপর কূলে গিয়ে ভিড়ল এবং নদী থেকে উঠে গেল। এবার সবার আগে সে অনুভব করল, যেন এতক্ষণ সে একটা স্বপ্ন দেখছিল আর এখন হঠাৎ সজাগ হয়ে গেছে। তার প্রকৃত বুঝ ও ভাবনা ফিরে এসেছে এবং মস্তিষ্ক স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মেয়েটা নিজের পরিসংখ্যান নিল এবং পরিধানে অনেকগুলো অলংকার দেখে বিস্মিয়ে হতবাক হয়ে গেল যে, এগুলো আমাকে পরাল কে!

রোজি ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল এবং চিন্তা করতে লাগল, এখন আমার কী হবে? পিতামাতা ও আপন বাড়ি-ঘর থেকে এখানে কত দূরে এসে পৌছেছে তার কিছুই

রোজি জানে না। এটা কোন নদী– ফোরাত? নাকি অন্য কোনো নদী, তাও রোজি বলতে পারে না।

ক্লান্তি ও অবসন্নতার কাছে হার মেনে রোজি ওখানেই বসে পড়ল।

রাতটা অন্ধকার ছিল বটে; কিন্তু রোজির মস্তিষ্ক আলোকোজ্জ্বল হতে লাগল। তার যুদ্ধের কথা মনে পড়ল– রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হঠাৎ তার ইউকেলিসের কথাও মনে পড়ে গেল। ইউকেলিসের ভালবাসা তার রক্তের প্রতিটি কণিকায় মিশে গিয়েছিল। এখন তার স্মরণ তার মস্তিষ্ক ও শরীরটাকে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিল। তার মনে পড়ে গেল, সে রক্তমাখা লাশ আর গুরুতর আহত লোকদের মাঝে ইউকেলিসকে খুঁজে ফিরছিল।

রোজির মাথাটা খুলতে শুরু করল। ইউকেলিসের লাশ! একটা ঘরে ইউকেলিসের মায়ের মরদেহ! সবগুলো দৃশ্য রোজির মনে পর্দায় একটা-একটা করে ভেসে উঠতে শুরু করল। এই লাশগুলো দেখে রোজির মনে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে স্বপ্নের জগতে চলে গিয়েছিল। বাস্তব জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

সে ছিল মেয়েটার আবেগের আতিশয্য। অতি আবেগই তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। রোজি পাগলিনী হয়ে যায়নি যে, তার মস্তিষ্ক বাস্তবতাকে গ্রহণই করবে না। এবার আরেকটা ধাক্কা খেল, যার ফলে সে স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তব জগতে ফিলে এল। তার হেরাকল-এর কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, সে হেরাকলকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর বনে-বাদাড়ে ঘুরে ফিরছিল। মানুষ তাকে ডাইনি মনে করেছিল। কেউ তার সামনে এসে পড়লে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেত আর সেই সুযোগে সে তার খাদ্য-পানীয়গুলো কেড়ে নিয়ে নিত। এভাবে তাকে না ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে, না পিপাসার্ত।

রোজির সেই লোকগুলোর কথাও মনে পড়ল, যারা তাকে পরম মমতা ও আদরের সঙ্গে এনে জাহাজে তুলেছিল। এবার মনে পড়ল, লোকগুলো মিশরের নাম উচ্চারণ করত। ফলে তার মনে বিশ্বাস জন্মে গেল, সে এখন মিশরে আছে। আরও মনে পড়ল, নতুন পোশাক পরিয়ে দুজন মহিলা তাকে অনেকগুলো অলংকার দ্বারা সজ্জিয়ে তুলেছিল। যতটুকু মনে পড়ে তখন তাকে বলা হয়েছিল, এস; এবার গিয়ে তুমি হেরাকলকে হত্যা করো। তখন সে এই ভেবে খুশি হয়েছিল, এবার আমি ইউকেলিস-হত্যার প্রতিশোধ নেব।

রোজির বিগত দিনগুলোর স্মৃতিমালা একটা-একটা করে মনে পড়তে লাগল। কিন্তু ছিল সবই আলো-আঁধারির মতো। যে-বাস্তবতাগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, সেগুলো ছিল আলোর মতো উজ্জ্বল। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পাচ্ছে না, এই নদীটাতে তাকে ধাক্কা মেরে কেন ফেলে দেওয়া হলো।

* * *

ইউকেলিসের স্মরণ রোজিকে অশ্রুসজল করে তুলেছে ঠিক; কিন্তু এখন এই বেদনা এতটা তীব্র নয় যে, আগের মতো তার মস্তিষ্কটা বিকল করে তুলবে। এখন তার মস্তিষ্কে খুবই ভয়ানক বাস্তবতা ভেসে উঠেছে। এক হলো এই অলংকারগুলো, যা কিনা খুবই মূল্যবান। আর এই সোনাগুলো থেকে বেশি দামি সম্পদ সে নিজে। একে তো টগবগে যুবতী, তদুপরি এতটা-ই রূপসী যে, খোদ রোমসম্রাট হেরাকলও যদি দেখেন, তাহলে একে তিনি তার হেরেমের শোভা বানিয়ে নেবেন।

নিজেকে তো আর লুকানো যায় না। তবে গায়ের অলংকারগুলো লুকিয়ে ফেলা সম্ভব। রোজি ঝটপট অলংকারগুলো খুলে ফেলল, যাতে দস্যুদের জন্য কোনো আকর্ষণ না থাকে। একবার ভাবল, সবগুলো অলংকার নদীতে ফেলে দিবে। কিন্তু পরে চিন্তা করল, না; এগুলো থাকলে কাজে লাগতে পারে; এগুলোর বিনিময়ে কারও থেকে সাহায্য নেওয়া যাবে।

অলংকারগুলো লুকানোর জন্য রোজির পোশাকে কোনো পকেট নেই। তাকে ঘাগরার মতো একটা পোশাক পরানো হয়েছে। সে ঘাগরাটা পায়ের কাছ থেকে একটুখানি ছিঁড়ে নিল এবং অলংকারগুলো তাতে বেঁধে পুটুলিটা পোশাকের তলে লুকিয়ে বেঁধে নিল। এতক্ষণে রাত অর্ধেকেরও বেশি কেটে গেছে। এবার তার ভাবনাগুলোকে ছাপিয়ে চোখে নিদ্রা এসে দানা বাঁধল। কাছেই একটা গাছ ছিল। রোজি গাছটার তলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েটা গভীর ঘুমে হারিয়ে গেল।

* * *

রোজি যখন চোখ খুলল, ততক্ষণে দিনের আলোতে তার চোখদুটো ধাঁধিয়ে উঠেছে। মেয়েটা আশপাশে কতগুলো মানুষের উপস্থিতি অনুভব করল। বিড়বিড়িয়ে চোখদুটো মেলতে-মেলতে উঠে দাঁড়াল। দেখল, অনেকগুলো উৎসুক মানুষ চারদিক ঘিরে ধরে বিস্ময়ের সাথে তাকে দেখছে।

'কে তুমি?'– জনতার মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করল– 'এখানে এভাবে পড়ে আছ কেন?'

'সবই বলব'– রোজি বলল– 'আমাকে এমন একটা ঘরে নিয়ে চলো, যেখানে মহিলারা আছে। আমি প্রতারণার শিকার হয়ে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। আমি নদী থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

রোজি দেখল, তাকে দাঁড়ানো লোকগুলো মজুর শ্রেণীর সরল-সহজ মানুষ। মন্দচরিত্র বা অপরাধপ্রবণ মানুষ হলে এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখত না।

ওখানে ভাষার কোনো সমস্যা ছিল না। মিশরেও আরবির প্রচলন আছে। বলার ভঙ্গিতে কিছু ব্যবধান আছে এ-ই যা পার্থক্য।

'আমাদের বাবা আসছেন'– ওই লোকটি বলল– 'আমরা সবাই খ্রিস্টান– কিবতি খ্রিস্টান।'

'আমিও কিবতি।' রোজি লোকগুলোর সঙ্গে আত্মীয়তা পোক্ত করার মানসে মিথ্যা বলল।

খানিক পরই একলোক ঘোষণার মতো করে বলে উঠল, সরো, সরো; বাবা আসছেন।

সবাই এমনভাবে পিছনের দিকে সরে গেল যে, একদিক দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। সেই পথে একজন প্রবীণ লোক রোজির সামনে এসে দাঁড়াল। পরনের পোশাক ও হাঁটার ধরনে বোঝা যাচ্ছিল, সমাজের উচ্চ মর্যাদার কেউ হবেন। কিন্তু রোজিকে দেখে তিনি সহসা যেন চমকে উঠলেন। এমনভাবে চকিত হয়ে উঠলেন যে, কয়েক পা দূরেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চেহারাটা তার এমনভাবে বদলে গেল, যা তিনি লুকোতে পারছিলেন না।

'আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি'– বাবা বললেন– 'ওখানে আমার স্ত্রী আছে, দুটা মেয়ে আছে, এক পুত্রবধূ আছে।'

'আমি এমন ঘরেই যেতে চাই, যেখানে মেয়েরা আছে।' রোজি বলল।

বাবা তাকে সঙ্গে করে রওনা হলেন। রোজি আশপাশটার পরিসংখ্যান নিল। একদিকে নীলনদ। কূলে ছোট-বড় অনেকগুলো নৌকা বাঁধা। সামান্য দূরে সম্মুখে আরও কয়েকটা পালতোলা নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। এইমাত্র কূলে ভিড়া এক-দুটা নৌকা থেকে কিছু লোকজন নামছে। কোনোটাতে আবার মানুষ আরোহণ করছে। এটা একটা জেটি, যেখান থেকে মানুষ নদীটা পারাপার হয়ে থাকে।

নদী থেকে আড়াই/তিন ফার্লং দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ওখানে ছোট-বড় ঝুপড়িঘরও আছে আবার উন্নতমানের পাকা ঘরও আছে। এটা নৌকার মাঝি-মাল্লা ও জেলেদের বসতি। এলাকার নাগরিকরা সবাই খ্রিস্টবাদের অনুসারী। এতক্ষণে জেটিতে লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে।

বাবার পদমর্যাদা গোত্রপতির মতো। ধর্মপরিচয়ে কিবতি খ্রিস্টান। এই গোষ্ঠীতেও তিনি নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। রোজির সঙ্গে কোনো কথাবার্তা না হলেই তিনি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং একটা কক্ষে বসালেন। তারপর ঘরের মহিলাদের ডেকে রোজিকে বললেন, এবার তুমি এদের তোমার কাহিনী শোনাও।

রোজি তার ঘটনাটা বিস্তারিত শোনাল। কেমন মানসিক অবস্থায় আন্তাকিয়া পৌছল, তারপর কীভাবে মিশর এল এবং তারপর তার জীবনের উপর দিয়ে কীরূপ ঝড় বয়ে গেল রোজি সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিল।

বাবা চুপচাপ শুনতে থাকলেন। রোজির বক্তব্য শেষ হলে বাবা তার স্ত্রীকে বললেন, একে গোসল করাও, পোশাক বদলে দাও, খাবার খাওয়ায়। তিনি রোজির মাথায় হাত রেখে পরম মমতার সঙ্গে বললেন, এই ঘরটাকে তুমি নিজের ঘর মনে করো; যথাসময়ে আমি তোমাকে তোমার ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেব।

বাবা বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং দু-তিনজন লোকের নাম বলে কাকে যেন আদেশ করলেন, ওদের এক্ষুনি এখানে নিয়ে আসো।

* * *

বাবার বাড়িটা সুপ্রশস্ত একটা হাবেলি। এই হবেলিই প্রমাণ করছে, তিনি সমাজের উচ্চপর্যায়ের একজন লোক। তিনি হাবেলির অপর একটা কক্ষে গিয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে সেই লোকগুলো এসে হাজির হলো, যাদের তিনি তলব করেছিলেন। তাদের একজন বলল, শুনলাম, একটা একলা মেয়েকে নাকি ধরে আনা হয়েছে?

'হ্যাঁ; ও আমার ঘরেই আছে'– বাবা বললেন– 'তোমাদের আমি সেজন্য ডেকে পাঠিয়েছি। তোমরা জান, গত রাতে নীলনদে এক মেয়েকে বলি দেওয়া হয়েছিল। এ সেই মেয়ে; নদী থেকে বেরিয়ে এসেছে। নীল আমাদের কুরবানি গ্রহণ করেনি; উগরে বাইরে ছুড়ে ফেলেছে। নীল আমাদের প্রতি রুষ্ট। এখন তার প্রবাহ থেমে যাবে কিংবা এমন বান আসবে যে, আমাদের ফসলাদি সব ভেসে যাবে, লোকালয়গুলো ডুবে যাবে এবং দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হব। এ আমাদের জন্য সৌভাগ্য যে, গত রাতে আমাকেও বলির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আর আমি মেয়েটাকে দেখে এসেছিলাম। আজ সকালে খবর এল, একটা মেয়ে নদীর কিনারায় ঘুমিয়ে আছে, যার অবস্থা বলছে, সে নদী থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

'আমাদের জন্য কী আদেশ?' একজন জানতে চাইল।

'তা পুরোহিত বলবেন'– বাবা বললেন– 'আমি মেয়েটাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের একজন আমার সঙ্গে চলো। একটা বিষয় আমি বুঝতে পারলাম না। বলির সময় মেয়েটাকে অনেকগুলো স্বর্ণালংকার পরানো হয়েছিল। এখন একটা জিনিসও তার গায়ে নেই! হাতের আঙুলে আংটিগুলো পর্যন্ত নেই! তাকে আমি কথাটা এজন্য জিজ্ঞেস করিনি, যাতে সে বুঝে না ফেলে, বলির আগে আমি তাকে দেখেছি। ও তো জানেই না, কেন ওকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। যদি বুঝতে পারে, ওকে পুনরায় নদীতে নিক্ষেপ করা হবে, তাহলে ও এখান থেকে উধাও হয়ে যাবে।'

বাবার জানা ছিল না, রোজি অলংকারগুলো খুলে তার ঘরের মহিলাদের দেখাচ্ছিল আর বলছিল, যেলোক আমাকে আমার পিতামাতার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে, তাকে এই সবগুলো অলংকার দিয়ে দেব।

একব্যক্তিকে সঙ্গে করে বাবা একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে পাদরির সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন। পাদরি সেখান থেকে বেশ দূরে আরেকটি লোকালয়ে বাস করেন।

রোজি গোসল করে রাতের ক্লান্তি দূর করে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

সূর্যটা অস্ত যেতে এখনও খানিক দেরি। এ-সময়ে বাবা ফিরে এলেন। রোজি এখনও ঘুমোচ্ছে। বাবা তার স্ত্রীকে বলল, পাদরি বলেছেন, আজ রাতেই এই মেয়েটাকে পুনরায় উক্ত জায়গায় নিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া হবে এবং এবার হাত-পা বেঁধে ফেলা হবে, যাতে সাঁতার কেটে উঠে আসতে না পারে।

স্ত্রী জানাল, মেয়েটার কাছে অনেকগুলো স্বর্ণালংকার আছে, যেগুলো সে লুকিয়ে রেখেছিল। বাবা বললেন, এক্ষুনি ওকে প্রস্তুত করে অলংকারগুলো পরিয়ে দাও। যারা ওকে নিয়ে যাবে, তারা এসে পড়েছে।

'ঠিক আছে; জাগিয়ে তুলে এখনই প্রস্তুত করে দিচ্ছি'– স্ত্রী বলল– 'নীলের কোলে তো ও আজীবন ঘুমোবেই।'

বাবার স্ত্রী কথাটা বলল রোজির কক্ষে প্রবেশ করে। ততক্ষণে মেয়েটা আপনা থেকেই সজাগ হয়ে আছে। মহিলার কথাটা তার কানে ঢুকেছে। তারপর যখন বৃদ্ধা তাকে তুলে তৈরি করতে শুরু করল, তখন রোজি জিজ্ঞেস করল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন? বাবা তার স্ত্রীকে বলে রেখেছিলেন, ওকে আসল কথাটা বলা যাবে না। কিন্তু তারপরও মহিলা এমন কিছু বলে ফেলল, যার সূত্র ধরে রোজির মনে সন্দেহ তৈরি হয়ে গেল এবং সে বেঁকে বসল।

বিষয়টা বাবাকে জানানো হলো। তিনি রোজিকে ফুসলাতে শুরু করলেন। বাবার মনে ভয় ধরে গেছে, মেয়েটা যখন ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছে, তখন কোনোভাবে তথ্যটা সরকারি লোকদের কানে পৌঁছে যেতে পারে। তখন তো বিপত্তির সীমা থাকবে না; পুলিশ এসে আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে।

বাবা একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ মানুষ। পরিস্থিতি এড়াতে তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি স্নেহ, মমতা ও প্রতারণার জাল ব্যবহার করলেন। রোজিকে বললেন, ঠিক আছে; তুমি অলংকার পরো না। রোজি বলল, এগুলো আমি কাছে রাখবই না; আমি এগুলোর মালিক নই।

সূর্য ডুবে গেছে। রোজিকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। জনতার কানে-কানে খবর পৌঁছে গেছে, সকালে নদীর কূলে যে-মেয়েটাকে পাওয়া গিয়েছিল, গত রাতে তাকে বলির জন্য নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং আজ রাত তাকে আবারও ফেলা হবে। নীলনদে ডুবে তাকে মরতেই হবে। নাহয় নীল নারাজ হয়ে সব ধ্বংস করে দেবে।

রোজিকে দেখার জন্য জনতা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এই মহল্লার সব কজন বাসিন্দা কিবতি খ্রিস্টান। আর বলি স্রেফ কিবতি মেয়েদের দেওয়া হয়। তারা রোজিকে একটি পবিত্র ও বরকতময় মেয়ে মনে একনজর দেখতে উদগ্রীব। তারা জানে না, মেয়েটাকে প্রতারণার মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রোজিকে বাইরে বের করে আনা হলে জনতা কেউ তার হাতে, কেউবা গায়ের পোশাকে ভক্তিসহকারে চুম্বন করতে হুটোপুটি শুরু করে দিল।

'ও এসে পড়েছে!'– কয়েকটা আওয়াজ উঠল– 'বলির মেয়েটা এসে পড়েছে।'

আওয়াজটা এক কান থেকে আরেক কানে পৌঁছে গেল এবং সবার কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগল, বলির মেয়ে এসে পড়েছে। শব্দগুলো রোজির কানে গিয়ে আছড়ে পড়ল। রোজি অনেকক্ষণ পর্যন্ত শুনতে থাকল, মানুষ বলছে, যে-মেয়েটা আজ রাতে বলি দেওয়া হবে, ও এসে পড়েছে। এবার সে বুঝে ফেলল, আমাকে ধোঁকা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; আবারও আমাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া হবে।

'আমি যাব না'– রোজি বেঁকে বসল– 'তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ!'

রোজিকে নিয়ে যেতে যে-দুজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তারা রোজির বাহু চেপে ধরে সামনের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করল। কিন্তু রোজি আমি যাব না, আমি যাব না বলে চিৎকার জুড়ে দিল। তারা রোজিকে সামনের দিকে টানছে আর রোজি ছাগলের মতো খুট ধরছে আর চিৎকার করছে। মেয়েটা একটা হুলস্থুর কাণ্ড ঘটিয়ে চলছে।

'দুজনে ধরে উচকে নিয়ে চলো'– বাবা শাসকসুলভ কণ্ঠে বললেন– 'তারপর নৌকায় তুলে নিয়ে যাও।'

রোজি বসে পড়ল। তারা দুজন রোজিকে তুলে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু রোজি তাদের কাবুতে আসছে না।

* * *

দুপক্ষের ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তিনজন লোক সামনের দিকে এগিয়ে এল এবং দুজনকে পিছনে সরিয়ে দিল। তাদের একজন রোজিকে উঠতে বলল, রোজি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। সে লোকটার পানে চোখ তুলে তাকাল আর অমনি চুপসে

গেল, যেন মেয়েটা চিৎকার করতে-করতে হঠাৎ মরে গেছে। তার মুখের রং-রূপও একদম বদলে গেল। চোখদুটো ঠায় দাঁড়িয়ে গেল। যেদুজন লোক রোজিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল, লোকটা তাদের দূরে সরিয়ে দিল।

'তুমি?'– রোজি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে লোকটাকে কানে-কানে জিজ্ঞেস করল– 'তুমি রবিন না?'

'রবিন ছিলাম'– লোকটা উত্তর দিল– 'আজ বহুদিন হলো, আমি রবিন নই– উয়াইস।

'প্রতিশোধ নেওয়ার তা হলে চমৎকার মওকা একটা পেয়ে গেছ।' রোজি বলল।

'ফালতু কথা বাদ দাও'– তিনজনের অপর একজন বলে উঠল– 'যদি বাঁচতে চাও, তা হলে চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলো।'

'আমার হৃদয়ে তোমার কোনো শত্রুতা ছিল না'– উয়াইস বলল– 'আমি তোমার ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রেখেছি।'

'এত কথা বলার জায়গা এটা নয় উয়াইস!'– অপরজন বলল– 'একে ওদের কব্জা থেকে বের করে নিয়ে চলো।'

কথোপকথটা চলছিল অতি সঙ্গোপনে– কানে-কানে।

'ওহে কিবতিরা!'– উয়াইস দর্শনার্থীদের উদ্দেশ করে ঘোষণা দিল– 'এই মেয়েটা নীলনদকে খুশি করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে হলে ও বলির জায়গায় যেতে রাজী।'

'থামো'– বাবা এগিয়ে এসে বললেন– 'তোমরা তিনজনই অপরিচিত। একজনকেও আমি চিনি না। তবে আমি আনন্দিত যে, এই পবিত্র দায়িত্বটা তোমরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছ। কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে আমার দুজন লোক দেব; তারাও তোমাদের সঙ্গে যাবে।

উয়াইস ও তার সাথীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়া করল।

'দুজন নয়'– উয়াইস বলল– 'ছয়জন দিন। আমরা কিবতি। কিবতিদের আমরা ধোঁকা দিতে পারি না।'

যেদুজন লোক রোজিকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল, বাবার ইঙ্গিতে তারা উয়াইস ও তার সাথীদের সঙ্গে যোগ দিল। উয়াইস যেন হঠাৎ জাদু করে রোজিকে কাবু করে ফেলেছে। যেখানে মেয়েটা না যেতে ছাগলখুট ধরেছিল, সেখানে এখন অবলীলায় ও স্বাচ্ছন্দে সামনের দিকে হাঁটছে। জনতা সামনে গিয়ে-গিয়ে তাকে ছুঁয়ে ধন্য হতে চেষ্টা করছে।

ঘাটে মাঝারি সাইজের একটা নৌকা প্রস্তুত দাঁড়িয়ে ছিল। বৈঠাহাতে বসা ছিল মাঝিও। যে-দুজন লোক সঙ্গে যাচ্ছিল, তারা ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বটে; কিন্তু মাঝিপাড়ার অধিবাসী বলে তারাও নৌকা বাইতে জানে ভালো। নৌকাটা ছিল পালতোলা। তারা মাঝিকে বলল, তোমার যেতে হবে না; নৌকা আমরাই চালিয়ে নিয়ে যাব। মাঝি নৌকা থেকে নেমে গেল।

রোজি, উয়াইস ও তার দুই সাথী নৌকায় চড়ে বসল। তারপর বাবার পাঠানো লোকদুজন উঠে এসে পাল তুলে দিল। বাবা বললেন, রাতে যথাসময়ে পৌঁছে আমি অনুষ্ঠানে যোগ দেব।

নৌকা চলতে শুরু করল। নৌকাটা যেদিকে যেতে হবে, সেই দিকটা স্রোতের বিপরীত। বাতাস ছিল বটে; কিন্তু স্রোত ছিল অনেক তীব্র। ফলে নৌকার গতি বেশ শ্লথ। সূর্য ডুবে গেছে আগেই। রাত অন্ধকার হতে চলছিল। ঘাটটা ধীরে-ধীরে পিছনে সরে যাচ্ছিল। একসময় তা সাঁঝের আঁধারে হারিয়ে গেল।

* * *

নৌকা আনুমানিক অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে। পালতোলা নৌকা স্রোত ঠেলে ধীরে-ধীরে গন্তব্যপানে এগিয়ে চলছে। বাবার লোকদুজন নৌকার মাঝে পাটাতনে বসে আছে। উয়াইস তার সঙ্গীদ্বয় ও রোজিকে নিয়ে গলুইয়ে বসা। হঠাৎ উয়াইস তার সাথীদের ইঙ্গিত করল। তিনজনই খঞ্জর বের করে হাতে নিল। তাদের শিকার তিন-চার পা দূরে উপবিষ্ট। তারা ধীর পদক্ষেপে উঠে দাঁড়াল এবং প্রতিপক্ষের কিছু বুঝে ওঠার আগেই খঞ্জরগুলো উপর থেকে নিচে নেমে এসে তাদের হৃৎপিণ্ডে গেঁথে গেল। উয়াইসরা তাদের ধরে নদীতে ফেলে দিল।

'এবার বলো রোজি!'– উয়াইস বলল– 'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে, নাকি এখনও সন্দেহ আছে?'

'হ্যাঁ উয়াইস!'– রোজি বলল– 'এখন আর আমার মনে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু আমাকে তোমরা নেবে কোথায়?'

'শাম...হালব'– উয়াইস উত্তর দিল– 'তোমার পিতামাতার কাছে। আমরা মুসলমান রোজি! আমরা মানুষের কল্যাণ চাই, ভালো কাজ করি।'

'এখানে তোমরা কী করতে এসেছিলে?' রোজি জানতে চাইল।

'ব্যবসা'– উয়াইস বলল– 'আমাদের মালামাল এসকান্দারিয়ায় পড়ে আছে। এখানে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।'

উয়াইস রোজিকে মিথ্যা তথ্য দিল। ব্যবসার সঙ্গে তিনজনের একজনেও কোনো সম্পর্ক নেই। তারা ইসলামি বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের সদস্য। উয়াইস যুবক।

ছিল খ্রিস্টান। বছরদুয়েক আগে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে গুরুতর আহত হয়েছিল। বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তার সহকর্মীরা তাকে বাঁচানোর কোনোই চেষ্টা করেনি। জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

মুজাহিদরা তাদের জখমিদের তুলে নিচ্ছিল। উয়াইস– যে কিনা তখনও রবিন ছিল– এক মুজাহিদের হাতজোড় করে অনুনয় করেছিল, আমাকে বাঁচাও। মুজাহিদ প্রথমে তাকে পানি পান করাল। তারপর অন্য একজনকে ডেকে দিয়ে নিজে চলে গেল। মুসলমান নারীরা এল এবং লোকটা খ্রিস্টান ও তাদের শত্রু দেখা সত্ত্বেও তাকে তুলে সেখানে নিয়ে গেল, যেখানে আহত মুজাহিদদের ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা চলছিল।

দু-তিন দিন পরই রবিন দাঁড়াবার শক্তি ফিরে পেল। আরও কদিন পর এবার সে হাঁটতে শুরু করল। মুসলমানদের সদাচারে রবিন খুবই প্রভাবিত হলো। কেউ তাকে শত্রু বা অমুসলিম মনে করেছে এমনটা আঁচই করেনি সে। একজন মুসলমান পুরুষ তাকে পানি পান করিয়েছিল। দুজন মুসলিম নারী তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে তুলে এনেছিল। অথচ তার সতীর্থরা, সমধর্মীরা মরণাপন্ন অবস্থায় দেখেও তুলে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

রবিন যখন পুরোপুরি সুস্থতা লাভ করল, তখন আইনত সে মুসলমানদের যুদ্ধবন্দী। কিন্তু সেনাপতির আদেশে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। তার কারণ বোধহয় এই ছিল যে, তাকে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তুলে আনা হয়েছিল– গ্রেফতার করা হয়নি। এবার যখন সে মুক্তির আদেশ পেল, তখন নিজের জীবনের অনেক বড় একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। বলল, আমি আপনাদের ছেড়ে যাব না; আমি মুসলমান হতে চাই। তাকে সেনাপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি কালেমা পড়িয়ে রবিনকে মুসলমান বানিয়ে নিলেন এবং নাম রাখলেন উয়াইস।

উয়াইসের বাড়ি হাল্ব। রোজি উয়াইসেরই গোত্রের মেয়ে। সুদর্শন যুবক উয়াইসকে তার খুবই ভালো লাগত। ধীরে-ধীরে ছেলেটা তার প্রেমাস্পদে পরিণত হলো। বিপরীতে রোজির সঙ্গে উয়াইসের হৃদ্যতার অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়াল যে, মেয়েটা যেন তার আত্মার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে গেল একটা বিপ্লব। রোজি ইউকেলিসকে পেয়ে গেল। উয়াইস তার মনবাগান থেকে হারিয়ে গেল আর উয়াইসও ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে ভিন্ন জগতের বাসিন্দা বানিয়ে নিল।

উয়াইস জানতে পারল, রোজি এক রোমান সেনাপতির ছেলের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। বিষয়টাকে সে আপত্তির চোখে দেখল এবং মেয়েটার বিরুদ্ধে বেঈমানির অভিযোগ তুলল। রোজিও পরিষ্কার ভাষায় বলে দিল, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ;

এটা স্বধর্মের সঙ্গে তোমার বিশ্বাসঘাতকতা। কাজেই তোমার সঙ্গে আমি কোনোই সম্পর্ক রাখব না।

উয়াইস বলল, আমি যদি কোনো সেনাপতির পুত্র হতাম, তাহলে আমার সঙ্গে কোনোদিনও তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করতে না। তারপর দুজনে কথা কাটাকাটি হলো। তিক্ততা তৈরি হলো। রোজি বলল, তুমি স্বধর্মে ফিরে এসো। উয়াইস বলল, মুসলমানরা আমাকে নতুন জীবন দান করেছে। মুসলমানদের মাঝে আমি যে-চরিত্র দেখেছি, তোমার ধর্মের লোকেরা তার কল্পনাও করতে পারে না। আর এই চরিত্র তাদের শিখিয়েছে ইসলাম।

তারপর রোজি একান্তভাবেই ইউকেলিসের হয়ে গেল আর উয়াইস মুজাহিদ বাহিনীতে যুক্ত হয়ে গেল।

* * *

অল্প কদিনেই উয়াইস নিজের যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হলো। শুধু জিহাদি চেতনায় সমৃদ্ধ বীর মুজাহিদই নয়– ঘোড়সওয়ারি, তরবারিচালনা, বর্শাবাজি ও তিরন্দাজিতে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী উয়াইস। তারপর একসময় তার এমন একটি প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া গেল, শত্রুদেশে গোয়েন্দাগিরি করতে ও নাশকতা চালাতে যার প্রয়োজন হয়।

আমর ইবনে আস দেখলেন, আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) মিশরে সামরিক অভিযান পরিচালনায় নীতিগতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন বটে; কিন্তু জানা নেই, তিনি কবে নাগাদ এই আদেশ জারি করবেন। ফলে আপনা থেকে তিনি একটি পরিকল্পনা তৈরি করে নিলেন। একটা শঙ্কা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, যে-রোমান বাহিনীটা শাম থেকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পলায়ন করেছিল, তার সেনাপতি তাদের সংগঠিত করে নেবে এবং হেরাকল শামের উপর জবাবি হামলা চালাবেন।

এর একটা প্রতিকার তিনি ঠিক করে নিলেন। তিনি ভাবলেন, যেভাবে আল-জাযিরার খ্রিস্টানরা মুসলিম বিজেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছিল, তেমনি মিশরেও বিদ্রোহ করানো হবে। একদিন তিনি পরামর্শের জন্য তাঁর অধীন সালারদের মিটিং তলব করলেন এবং তাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে নিজের পরিকল্পনা উপস্থাপন করলেন।

'মিশরের কিবতি খ্রিস্টানদের হেরাকল ও আতরাবুনের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া যায়'– আমর (রাযি.) বললেন– 'ওখানে সবচেয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়ত সম্প্রদায় হলো এই কিবতিরা।'

'হতে পারে, ওরা বিদ্রোহের সাহসই রাখে না'– এক সালার বললেন– 'আমার মনে হয়, ভালো হবে যদি তাদের হাত করা যায়। আমরা তাদের এই বলে প্রস্তুত করব যে, যখন আমরা মিশর আক্রমণ করব, তারা আমাদের সঙ্গ দেবে আর যেসব কিবতি রোমান বাহিনীতে আছে, তারা আন্তরিকভাবে লড়াই করবে না এবং পালিয়ে যাবে।'

আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন, আমার এমন তিন-চারজন মুজাহিদ দরকার, যারা মিশর যাবে এবং কিবতিদের মাঝে মিশে গিয়ে তাদের হেরাকল-এর বিরুদ্ধে প্রস্তুত করবে।

আমর ইবনে আস (রাযি.)–এর গোয়েন্দা বিভাগ আছে। কিন্তু এ কাজের জন্য তাঁর বিশেষ ধরনের কয়েকজন লোকের প্রয়োজন। সালারগণ দুজন মুজাহিদ ঠিক করে দিলেন। সে-সময়ে উয়াইসের খ্যাতি সবার মুখে-মুখে। ফলে তাকেও এই অভিযানের জন্য নির্বাচন করা হলো এবং তিনজনকে আমার ইবনে আস (রাযি.)-এর হাতে তুলে দেওয়া হলো। আমর ইবনে আস তাদের নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং মিশনের জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন।

দিনকতক পরই তাদের মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা করা হলো। তারা বণিকের বেশে ওখানে পৌঁছে গেল। এক মাসের মধ্যে তারা দু-তিনজন খ্রিস্টানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে নিল। তারা তাদের নিজেদের কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

* * *

এখন সেই মিশনেরই ধারাবহিকতায় তারা কোথাও যাচ্ছিল আর উয়াইস রোজিকে এক বিপন্ন অবস্থায় দেখে ফেলল। রোজির জায়গায় অপর কোনো মেয়ে হলে উয়াইস ও তার সাথীরা তার পানে চোখ তুলেও তাকাত না। কিন্তু রোজিকে দেখে উয়াইস বলল, মেয়েটাকে আমি চিনি এবং এর সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সে বিস্মিত হলো, মেয়েটা এখানে এল কী করে!

উয়াইস প্রথমে উৎসুক জনতার কাছে জিজ্ঞেস করে ব্যাপাটা জেনে নিল। জনতা বলল, মেয়েটাকে নীলনদে বলি দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; কিন্তু ও যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় সকল তথ্য জেনে নিয়ে উয়াইস ও তার সঙ্গীরা কর্তব্য ঠিক করে নিল। তিনজনই অসাধারণ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তারা কিবতি খ্রিস্টানের বেশে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

তাদের প্রচেষ্টা সফল হলো। এখন দুজনকে হত্যা করে তারা মাঝনদীতে ফেলে দিল। নদীটা ওখানে বেশ চওড়া। এখন প্রয়োজন নৌকাটা কূলে ভিড়ানো এবং এই এলাকা থেকে পালানো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আরবদের মাঝে একটা দুর্বলতা ছিল

যে, তারা নৌকা চালাতে জানত না। দজলা ও ফোরাতে দাঁড়ওয়ালা নৌকা চালাতে জানত শুধু। কিন্তু পালতোলা নৌকা চালাবার দক্ষতা তাদের ছিল না।

উয়াইস ও তার সঙ্গীরা জানত, নৌকার মোড় ঘোরাতে তার পিছনে বড় একটা বৈঠা থাকে। তাদের একজন বৈঠাটা একদিকে মোড় দিল। ফলে নৌকাটা কূলের দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু সেই অনুপাতে পালের পজিশনও কিছুটা ডান-বাম করা প্রয়োজন ছিল। নৌকার গতি বদলে যাওয়ায় বাতাসেরও গতি বদলে গেল। তখন বাতাস খুব তীব্র হয়ে গিয়েছিল। তিনজনের একজনেরও জানা ছিল না, পাল কীভাবে নামাতে হয় বা কীভাবে গোটাতে হয়। বাতাস আর পাল দুয়ে মিলে নৌকাটা এক দিক থেকে উপরে তুলে দিল আর অপর দিকটা পানির মধ্যে চলে গেল।

'মেয়েটাকে সামলে নাও উয়াইস!' এক মুজাহিদ ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

'আমার চিন্তা করো না'– রোজি বলল– 'আমি সাঁতার কাটতে জানি। একবার নদী থেকে উঠে এসেছি।'

তারা আর কোনো কথা বলার বা শুনবার ফোরসত পেল না। বাতাসের অনুকূলে না থাকায় পাল নৌকাটাকে একদম উলটে দিল এবং চারজনই নদীতে পড়ে গেল। সবাই সাঁতার জানে। তারা কূলের দিকে সাঁতরাতে লাগল। উয়াইস রোজিকে ডাকছে। কিন্তু রোজি নির্ভয়ে কূলের দিকে সাঁতরে যাচ্ছে। একসময় চারজনই কূলে পৌঁছে গেল।

নীল তার বলিটা আরেকবার উগড়ে দিল। কিন্তু বলি না পাওয়াতে তার প্রবাহ থামল না। নীল বইতেই থাকল।

* * *

এখন প্রশ্ন হলো, রোজিকে লুকাবে কোথায় এবং তাকে শাম পর্যন্ত পৌঁছাবে কীভাবে। এটা তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু উয়াইস রোজিকে বাঁচানো এবং পিতামাতার কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। এরা তিনজন মূলত কিবতি খ্রিস্টানদের পুরোহিত বিনয়ামিনের কাছে যাচ্ছিল।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক বিনয়ামিনের নাম আবু মায়ামিন লিখেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণ সর্বসম্মতভাবে বিনয়ামিন নামটাই সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিনয়ামিন কোনো লোকালয়ে বাস করতেন না। কাওস নামক একটা পল্লী ছিল। সেখান থেকে অনেকখানি দূরে এমন একটা মরু অঞ্চলে বাস করতেন, যাকে টিলা-টিপি ও চড়াই-উতরাই একটা দুর্গম অঞ্চলে পরিণত করে রেখেছিল। মিশরের যেসব নাগরিক হেরাকল-এর সরকারি খ্রিস্টধর্মের অনুসরণ করত না, তারা

বিনয়ামিনকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা মানত। হেরাকল বিনয়ামিনকে হত্যা করার জন্য কায়রাসকে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। বিনয়ামিন যথাসময়ে তথ্যটা পেয়ে যান এবং লোকালয় থেকে ফেরার হয়ে যান।

আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর এই তিন গোয়েন্দার কৃতিত্ব ছিল যে, তারা বিনয়ামিনের অবস্থান বের করে ফেলেছে। তারা নিজেদের কট্টর কিবতি বলে দাবি করত, কিবতি খ্রিস্টানদের গির্জায় যেত এবং তাদের মতো উপাসনা করত।

উয়াইস তার আসল কর্তব্য ও মিশন পরিত্যাগ করে রোজিকে তার পিতামাতার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে শাম চলে যাবে এ তো হতেই পারে না। আবার মেয়েটাকে সঙ্গে রাখাও যাচ্ছিল না, একাও ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। সমস্যাটা নিয়ে তিনজন পরামর্শে বসল এবং মতবিনিময় করল।

'সব জল্পনা-কল্পনা বাদ দিয়ে চলো আমরা একে সঙ্গেই রাখি'– তিন গোয়েন্দাদলের কমান্ডার বলল– 'আমরা বলব, এও কিবতি। আর একে বিনয়ামিনের হাতে তুলে দিয়ে বলব, একে হালব পৌঁছিয়ে দিন।'

'তিনি যদি জেনে ফেলেন, একে নীলের বলি থেকে ফেরার করিয়ে আনা হয়েছে, তখন?' একজন এই পন্থায় সমস্যার কথাটা তুলে ধরল।

এই ভয়টা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও'– কমান্ডার বলল– 'আমার কাছে খবর আছে, বিনয়ামিন এই বলিকে পাপ মনে করেন। কিন্তু এখনও তিনি চুপচাপ রয়েছেন এজন্য যে, কিবতিদের বেশিরভাগ লোকই এই বলিপর্বকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে।'

তারা এখন কোথায় আছে, বিনয়ামিনের আস্তানা কোথায় এবং কতখানি দূরে সবই তাদের জানা ছিল। নদীর কূলে বেশিক্ষণ অবস্থান করা ঠিক নয়। তারা বিনয়ামিনের আস্তানা অভিমুখে এগুতে শুরু করল। সকাল পর্যন্ত তাদের অনেকখানি পথ অতিক্রম করে ফেলা দরকার।

* * *

বিনয়ামিনই এই মুসলমান গোয়েন্দাদের কাজের মানুষ ছিলেন। তারা বিনয়ামিন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে তার কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের আঁচলে সংরক্ষিত আছে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এলফার্ড বাটলার এর বিস্তারিত কাহিনী তার রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'মিশরে আরবদের বিজয়মালা'য় লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাহিনীর বিবরণটা সংক্ষেপে এরকম। সম্রাট হেরাকল খ্রিস্টবাদকে সরকারি ধর্মের রূপ দিয়ে তার আসল চেহারা-ই বিকৃত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে মানুষের উপর

চাপিয়ে দিতে শাহী ফরমান জারি করে দিলেন। খ্রিস্টবাদের আলেমগণ তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। এমনকি জনসাধারণ পর্যন্ত এই সরকারি ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করল। হেরাকল কায়রাসকে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে দিলেন যে, যেকোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ করে তুমি মানুষকে এই ধর্ম গ্রহণ করে নিতে বাধ্য করো।

কায়রাস এসকান্দারিয়ায় একটি ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন করল এবং তাতে তার সরকারি ধর্মের প্রচারণা চালাল। যে-প্রধান পাদরি বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেই সাফরিনুস এসকান্দারিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কায়রাসকে একান্তে বসিয়ে দলিল-প্রমাণ দ্বারা এবং অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, খ্রিস্টবাদকে আসমানি কিতাব ইনজীল-এর অনুরূপ টিকে থাকতে দাও। কিন্তু কায়রাসের অন্তরে খোদার নয়– হেরাকল-এর ভয় চেপে বসেছিল। তারপর হেরাকল তাকে মানুষের জীবন হরণের যে-ক্ষমতা প্রদান করলেন, তা তাকে ফেরাউনে পরিণত করে দিয়েছিল।

সাফরিনুস তো ইতিহাসের কোনো অন্ধকার কোণে হারিয়ে গেলেন। কিন্তু বিনয়ামিন হেরাকল ও কায়রাসের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়লেন। এলফার্ড বাটলার লিখেছেন, গণমানুষের অন্তরে বিনয়ামিনের ভালবাসাও ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মপণ্ডিত ছিলেন। ধর্মবিরোধী কোনো কথা বা কর্মকাণ্ড তিনি সহ্য করতেন না।

হেরাকল তার গ্রেফতারির আদেশ জারি করলেন। বিনয়ামিনের কাছে কোনো সামরিক শক্তি ছিল না। কিন্তু তারপরও এই লড়াইয়ে তিনি খ্রিস্টবাদের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আত্মগোপনে চলে গেলেন। এসকান্দিয়া থেকে খানিক দূরে একটা মরু অঞ্চল ছিল কাওস। বিনয়ামিন তার থেকে কিছু দূরে একটা দুর্গম মরু অঞ্চলে গিয়ে আস্তানা গড়লেন। ওখানে তিনি একটি গির্জা তৈরি করে নিলেন। কর্মীদের সঙ্গে তার গোপনে যোগাযোগ চলতে থাকল, যারা প্রকৃত খ্রিস্টবাদের প্রচার করে বেড়াত এবং মানুষের কাছে বিনয়ামিনের বার্তা পৌঁছাত। এভাবে বিনয়ামিন আত্মগোপনে থাকা সত্ত্বেও জনতার মাঝে বিদ্যমান রইলেন এবং কর্মতৎপর থাকলেন।

* * *

কায়রাস বিনয়ামিনকে খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হলো। ফলে সে বিনয়ামিনের বড় ভাইকে গ্রেফতার করে ফেলল। ইতিহাসে তার এই ভাইয়ের নাম পাওয়া যায় না। কায়রাসের জানা ছিল, বিনয়ামিনের মিশন তার এই ভাই-ই পরিচালনা করছে। তাকে বলা হলো, তুমি সম্রাট হেরাকল-এর খ্রিস্টবাদকে গ্রহণ করে নাও আর তোমার অনুসারীদের বলো, যেন তারাও এই ধর্মকে বরণ করে নেয়। কিন্তু তিনি

স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, আমি খোদা ছাড়া আর কারও আদেশ মান্য করতে প্রস্তুত নই। হেরাকল রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটমাত্র। আসল বাদশাহ হলেন খোদা। তিনি এই জগতেরও খোদা, পরজগতেরও খোদা।

কায়রাসের আদেশে বিনয়ামিনের বড় ভাইয়ের উপর যে-নিপীড়ন চালানো হলো, তার বিস্তারিত বিবরণ এলফার্ড বাটলার বর্ণনা করেছেন। তাকে উলঙ্গ করে মেঝেতে শুইয়ে দেওয়া হলো এবং চার দিক থেকে জ্বলন্ত আগুনের তাপ দেওয়া হলো। আগুন তার দেহটাকে ঝলসে দিয়েছিল।

'বলো রোমসম্রাট হেরাকল-এর ধর্ম সত্য'– তাকে বলা হলো– 'আর সমস্ত ধর্ম মিথ্যা।'

'খোদার গজব পড়ুক সেই ব্যক্তির উপর, যে বলে হেরাকল-এর ধর্ম সত্য– বিনয়ামিনের ভাই দীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'ইনজীলের ধর্মই সত্য ধর্ম।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তার দুই পার্শ্ব থেকে চর্বি গলে-গলে মেঝেতে প্রবাহিত হচ্ছিল। একপর্যায়ে মশালগুলো সরিয়ে তাকে বলা হলো, আচ্ছা তুমি শুধু এটুকু বলে দাও বিনয়ামিন কোথায়।

'আমার যদি জানা থাকত, তবেই-না বলব।' বিনয়ামিনের ভাই উত্তর দিলেন।

তার একটা দাঁত উপড়ে ফেলে বলা হলো, বলো বিনয়ামিন কোথায়। এবারও তিনি একই উত্তর দিলেন। এবার আরও একটা দাঁত উপড়ে ফেলে দেওয়া হলো। এভাবে একটা-একটা করে তার সবগুলো দাঁত উপড়ে ফেলা হলো। তার মুখ থেকে রক্তের ফোয়ারা বইতে লাগল।

তার বিশ্বাস ও চেতনার পরিপক্বতার অবস্থা এই ছিল যে, যতক্ষণ তার হুশ-জ্ঞান ঠিক ছিল, ততক্ষণে তাকে তিনবার বলা হলো, তুমি হেরাকল-এর ধর্ম মেনে নাও। কিন্তু প্রতিবারই তিনি প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে কায়রাসের আদেশে তাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হলো এবং তিনি পানিতে ডুবে জীবনের অবসান ঘটালেন।

* * *

এলফার্ড বাটলার আরেক পাদরি স্যামুয়েলে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এই পাদরিও বিনয়ামিনেরই অনুসারী ছিলেন এবং তিনিও মরুভূমিতে কোথাও গিয়ে গির্জা তৈরি করে আস্তানা গড়েছিলেন। তিনি কিবতি ছিলেন এবং হেরাকল-এর ধর্মের বিরুদ্ধে ময়দান তৈরি করে রেখেছিলেন। কায়রাস তার নামে একটি বার্তা লিখল, যাতে তাকে বলা হলো, তুমি হেরাকল-এর সরকারি ধর্ম মেনে নাও। বার্তাটা একজন

সেনা-অফিসার বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, যার সঙ্গে একশো সৈনিক ছিল। সে বার্তাটা স্যামুয়েলকে হস্তান্তর করল।

'আমাদের নেতা বিনয়ামিন ছাড়া কেউ হতে পারে না'– স্যামুয়েল বার্তাটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে-দিতে বললেন– 'খোদার গজব পড়ুক সেই লোকগুলোর উপর, যারা আমার কাছে এই বার্তা পাঠিয়েছে। খোদার অভিশাপ বর্ষিত হোক সেই সম্রাটের উপর যিনি আমাদের উপর একটা মিথ্যা ধর্ম ঠুকে দিয়েছেন।'

কায়রাস বার্তাবাহী সেনা-অফিসারকে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিল। অফিসার তাকে গ্রেফতার করে ফেলল। তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিল। অফিসার ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার ছিল আর স্যামুয়েল পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। অফিসার তাকে পুরোপুরি অপদস্থ করতে চাচ্ছিল। স্যামুয়েলকে এক নজর দেখার জন্য জনতা রাস্তার পাশে এসে ভিড় জমাল।

'লোকসকল!– স্যামুয়েল অত্যন্ত উঁচু ও প্রাণবন্ত আওয়াজে বললেন– 'আজ আমি খুবই আনন্দিত। আজ হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্যতার নামে আমার রক্ত ঝরানো হবে। ও হে লোকসকল! তোমরা সত্য ধর্মকে আকড়ে থাকো এবং কোনো রাজা-বাদশাকে ভয় করো না।'

স্যামুয়েল সম্রাট হেরাকলকে গালি দিতে শুরু করলেন।

সেনা-অফিসার তাকে পেটাতে-পেটাতে কায়রাসের কাছে এমন অবস্থায় নিয়ে হাজির করল যে, তার মাথা ও শরীরের কয়েক স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। কায়রাস সৈন্যদের আদেশ করল, ওকে আরও পেটাও। ইতিহাস সাক্ষী, তাকে এত পরিমাণ পেটানো হলো যে, তার পরিধানের কাপড়-চোপড় রক্তে লাল হয়ে গেল।

'ও হে বদবখত পাদরি!'– কায়রাস স্যামুয়েলকে উদ্দেশ করে বলল– কে তোকে গির্জার পাদরি বানাল? এই অধিকার তোকে কে দিল যে, তোর অধীন পাদরি আর অনুসারীরা আমার বিরুদ্ধে, আমার ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে?'

ও হে ধর্মহীন দাজ্জাল!'– স্যামুয়েল গম্ভীর কণ্ঠে উঁচু গলায় বললেন– 'পুণ্য একমাত্র খোদার উপাসনা আর বিনয়ামিনের অনুসরণেরই মাঝেই নিহিত। তুই তো ইবলিসের চেলা। তোর আর তোর ধর্মের আনুগত্য পাপ।'

কায়রাসের আদেশে তার উপর আরও নির্যাতন চালানো হলো। ঘুষি মেরে-মেরে তার মুখটা থেতলে দেওয়া হলো।

'এবার বল'– কায়রাস জিজ্ঞাসা করল– 'তুই মিশর সরকার ও ধর্মনেতার আদেশ অমান্য করছিস কেন? তুই কি জানিস না, তোর জীবন-মৃত্যু আমার হাতে?'

'তোর কি ইবলিসের কথা জানা নেই কায়রাস!'– স্যামুয়েল গুরুতর আহতাবস্থায়ও উচ্চকণ্ঠে বললেন– 'ইবলিস ফেরেশতাদের নেতা ছিল। কিন্তু অহংকার তাকে

খোদার আদেশ মান্য করতে বাধা দিল। খোদা তাকে অভিশপ্ত ঘোষণা করলেন। শোন কায়রাস! তুই ইবলিসের চেয়েও বড় মালাউন।'

কায়রাস আদেশ দিল, বাইরে নিয়ে ওর মাথাটা উড়িয়ে দাও।

আদেশ পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। স্যামুয়েলের মাথাটা দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেল বলে। এমন সময়ে উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা ওখানে এসে হাজির হলেন, ইতিহাসে যার নাম পাওয়া যায় না। তিনি স্যামুয়েলের এই মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে দিলেন। স্যামুয়েল অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেলেন। মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে কর্মকর্তা স্যামুয়েলকে দেশান্তরের আদেশ জারি কল। স্যামুয়েল দেশান্তারিত হয়ে গেলেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন, মিশরের খ্রিস্টানদের দ্বারা হেরাকল-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে হবে। জনতাকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। ওখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুকূলেই ছিল। মিশরের জনগণের অন্তরে হেরাকল-এর প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যা কিনা দিন-দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছিল এবং এই আগ্নেয়গিরি যেকোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারত। আমর ইবনে আস পরিবেশটা এ রকম তৈরি করতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি যখন মিশরে আক্রমণ চালাবেন, তখন ওখানকার খ্রিস্টানরা যেন তাঁর পক্ষ নেয়। অন্তত এতটুকু অবশ্যই হয়, যেন তারা নিরপেক্ষ থাকে।

* * *

ওদিকে জেলে ও মাঝিপাড়ার মোড়ল বাবা বলির অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে নৌকায় চড়ে রওনা হয়ে গেলেন। নদীপথে দূরত্বও কম আবার তখন বাতাসের গতিও ছিল অনুকূল। আধা পথ অতিক্রম করার পর তিনি দেখতে পেলেন, সামনের দিক থেকে একটা নৌকা উপুড় হয়ে ভাসতে-ভাসতে এদিকে আসছে। তার পালগুলোও তার সঙ্গে সাঁতার কাটছে। নৌকাটা বাবার নৌকার কোলঘেঁষে চলে গেল। অন্ধকারে শুধু এতটুকুই বোঝা গেল, ওটা একটা নৌকা। কিন্তু নৌকাটা কার বোঝা বা দেখা সম্ভব হলো না। তাকে বলবারও কেউ ছিল না, এটা তোমরাই লোকদের নৌকা আর তোমাদের বলি আরেকবারের মতো উধাও হয়ে গেছে।

বলির জায়গায় পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন, একজন পাদরি আর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার আগেই ওখানে উপস্থিত। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, কই; তোমার বলির মেয়ে কোথায়? তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন; আমি তো পাঁচজন লোকের সঙ্গে তাকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি! আসেনি?

হায়! হায়! সবার চোখে-মুখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। একটা শোকের পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। বাবা বললেন, আসার পথে আমি একটা পালতোলা নৌকা উপুড়

হয়ে ভেসে যেতে দেখেছি। কিন্তু তাদের দুজন তো দক্ষ নৌকাচালক ছিল। নৌকাটা যদি কোনো কারণে উলটে গিয়েও থাকে, তারপরও তো তাদের সাঁতরে কূলে পৌঁছে যাওয়ার কথা! মেয়েটাও তো সাঁতারু ছিল!

'নৌকায় তিনজন ছিল অপরিচিত'– বাবা বললেন– 'কিন্তু তারা না হলে মেয়েটাকে বলির জায়গায় আনা-ই সম্ভব হতো না।'

'নীলনদ এই মেয়েটার কুরবানি গ্রহণ করতে রাজী নয়'– পাদরি বললেন– 'নীলের রোষ থেকে বাঁচতে হলে সেই মেয়েটাকেই বলি দিতে হবে, যাকে আমরা প্রথমে নির্বাচন করেছিলাম। আমি হুররিশের কন্যার কথা বলছি। এখনই এনে ওকে নদীতে ফেলতে হবে।'

পাদরি বললেন, হুররিশকে এখনই ঘুম থেকে জাগিয়ে বলো, মেয়েটাকে নিয়ে এখানে চলে আসুক।

হুররিশ মেয়েকে নিয়ে চলে এল। সে বলল, মেয়েকে পরানোর মতো কোনো অলংকার আমার কাছে নেই। ওর অলংকারাদি যা-কিছু ছিল সবগুলোই আগের মেয়েটাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার আশা ছিল, এই অজুহাতে মেয়েটা রক্ষা পেয়ে যাবে। পাদরি তাকে হতাশ করে বললেন, অলংকারাদি অত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বলি একটা শরীরের দেওয়া হয় আর দেহটা হতে হয় একটা কুমারী মেয়ের। অলংকার না হলেও চলে।

পাদরির আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। মেয়েটাকে নীলনদে ফেলে দেওয়া হলো, যাকে বাঁচানোর জন্য তার পিতা রোজিকে ধোঁকা দিয়ে এনে পাদরির হাতে তুলে দিয়েছিল।

* * *

ততক্ষণে রোজি নীল থেকে বহু দূরে চলে গেছে। উয়াইস ও তার সাথীরা এমন কোনো পথিক নয়, যাদের হাতে না কোনো অর্থ-কড়ি আছে, না অন্যান্য উপকরণ। তারা গোয়েন্দা। তাদের কাছে অর্থও আছে, বুদ্ধিও আছে। একটা উট ভাড়া করে তারা কাওস পৌঁছে গেল।

যেসব খ্রিস্টান হেরাকল ও কায়রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত, কাওস তাদের কেন্দ্র। উয়াইস ও তার সাথীরা এখানেও নিজেদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিল। রোজিকে তারা এমনভাবে চাদরাবৃত করে নিল যে, তার মুখটাও পুরোপুরি দেখা যায় না।

উট অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের কাওস পৌঁছিয়ে দিল। অবশ্য ওখানে পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধ্যা নেমে গেল। রাতটা তাদের ওখানেই কাটাতে হবে। ওখানে

পান্থশালা ছিল। তারা পান্থশালায় চলে গেল। আহারাদি শেষ করে তারা আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

'এবার বলো রোজি!'– এক মুজাহিদ গোয়েন্দা রোজিকে জিজ্ঞেস করল– 'আমাদের সম্পর্কে তোমার মনে আর কোনো সন্দেহ অবশিষ্ট আছে কি?'

'না।' রোজি সোজা-সাপটা উত্তর দিল।

তার মনে কোনো প্রকার সংশয়-সন্দেহ থাকবার কথাও নয়। মেয়েটা বিগত রাত থেকে তাদের সঙ্গে আছে। লোকগুলো যদি খারাপ মানুষ হতো, তা হলে এতক্ষণে তার পরিচয় তারা দিয়ে ফেলত। বেশি আশঙ্কা উয়াইসের দিক থেকে ছিল। ইউকেলিসের ভালবাসা বরণ করে নিয়ে মেয়েটা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। উয়াইস ভাবতে পারত, আমার প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু রোজির সঙ্গে আচরণটা এমন দেখাল, যেন রোজি সুন্দরী যুবতী নয়– তার একজন মুজাহিদ সঙ্গীমাত্র।

'উয়াইস!'– রোজি বলল– 'তুমি বলেছ, মুসলমানরা তোমাকে নবজীবন দান করেছে। আরও বলেছ, তারা তোমার সঙ্গে যে-আচরণটা করেছে, তা তোমার প্রতি তাদের করুণা নয়– এটি ইসলামের শিক্ষা। আর তাতে মুগ্ধ হয়ে তুমি মুসলমান হয়ে গেছ। এবার তুমি আর তোমার সাথীরা আমাকে নতুন জীবন দান করেছ। আমি জেনে ফেলেছিলাম, এবার হাত-পা বেঁধে আমাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। তোমরা না এলে এতক্ষণে আমার মৃতদেহটা সামুদ্রিক প্রাণীদের খাবারে পরিণত হতো।

'আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছিল, তোমার জীবন রক্ষা পাবে'– উয়াইস বলল– 'উসিলা হিসেবে তিনি আমাকে সেই জায়গাটায় পাঠিয়ে দিলেন, যেখানে তোমার জীবন-মৃত্যুর ফয়সালা হচ্ছিল। আমরা তিনজন ওখানে আল্লাহর প্রেরিত উসিলা হিসেবে পৌঁছেছি। আমরা নই– ইসলাম তোমাকে নতুন জীবন দান করেছে।'

'তাহলে আমাকেও মুসলমান বানিয়ে নাও'– রোজি বলল। সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু গড়াতে শুরু করল। তারপর বলল– 'আমার এক বিন্দুও ধারণা ছিল না, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দেবে। আমি তোমার ও তোমার এই সঙ্গীদের প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। তোমাদের চরিত্র ও আচরণে আমি অভিভূত। বাকি জীবন আমি তোমাদেরই সঙ্গে কাটাতে চাই।'

'এখনই নয় রোজি'– গোয়েন্দাদলের কমান্ডার বলল– 'পিতামাতার কাছে চলে যাওয়ার পর হয়তো তোমার চিন্তাধারা পালটে যাবে। এই অনুভূতি হয়তো তখন থাকবে না। এখানে তুমি একটা আতঙ্কজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছ। বয়সও তোমার

কম। আমরা তোমাকে তোমার পিতামাতার কাছে পৌঁছিয়ে দেব। ওখানে গিয়ে তুমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ো।'

কিন্তু না; সিদ্ধান্ত রোজির অটল। এই মত তার কোনোদিনও পালটাবে না বলে দৃঢ় বিশ্বাস তার। বলল, না; এখনই তোমরা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করো। আমাকে এক্ষুনি মুসলমান বানিয়ে নাও। বলো আমাকে কী করতে হবে।

তিন মুজাহিদ বলল, ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নিতে হয়। আমরা মনে করি, এখানে তুমি স্বাধীন নও।

এবার রোজি কেঁদে ফেলল। বলল, পিতামাতার কাছে আমি যাবই না। উয়াইস তাকে বলেছিল, আমরা ব্যবসা করতে মিশর এসেছি। তাই রোজি জিদ ধরল, আমি তোমাদেরই সঙ্গে ফিরে যাব।

রোজিকে বলা সম্ভব নয়, এই তিন ব্যক্তির মিশন অন্যকিছু এবং তাকে তাদের সঙ্গে রাখার কোনোই সুযোগ নেই। কিন্তু রোজির হঠকারিতা আর আহাজারি তাদের অস্থির করে তুলল। শেষমেশ রোজি বলেই ফেলল, এখন আর আমি খ্রিস্টান নই– আমি এখন মুসলমান।

রোজি এই মুজাহিদের সামনে এমন একটি পয়েন্ট দাঁড় করিয়ে দিল যে, তাদের পক্ষে মেয়েটাকে উপেক্ষা করার আর কোনো সুযোগই থাকল না। রোজি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও সাহসিনী মেয়ে। অগত্যা দলনেতা সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রোজিকে নিজের হাতে মুসলমান বানিয়ে নিল এবং তার নাম রাখল রাবেয়া। একজন অমুসলিমকে কীভাবে ইসলামে দীক্ষিত করতে হয়, তা তার জানা ছিল।

এবার প্রশ্ন হলো, রাবেয়াকে তাদের আসল পরিচয় ও মিশন সম্পর্কে অবহিত করবে কিনা। ইসলামের শিক্ষা হলো, একজন নারীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা যায় না। তায় এখন আবার মেয়েটা মুসলমান। এমতাবস্থায় মেয়েটার সার্বিক দেখাশোনা ও নিরাপত্তাবিধান এই তিন মুসলিম গোয়েন্দার ঈমানি কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তারা সিদ্ধান্ত নিল, রাবেয়াকে তাদের আসল পরিচয় বলে দিবে এবং কোন মিশন নিয়ে এখানে এসেছে, তাও অবহিত করবে।

রাবেয়াকে পাশে বসিয়ে তারা তাদের আসল পরিচয় ও মিশন সম্পর্কে অবহিত করল। বলল, এ পর্যায়ে আমরা পাদরি বিনয়ামিনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কিন্তু তাকে বুঝতে দেওয়া যাবে না, আমরা মুসলমান। বলব, আমরা কিবতি খ্রিস্টান এবং শামের খ্রিস্টান নেতাদের বার্তা নিয়ে এসেছি।

'আমি সর্বোতভাবে তোমাদের সঙ্গে আছি'– রাবেয়া বলল– 'জীবন দিতে হলে তাও দেব। কিন্তু এভাবে নয় যে, হাত-পা বেঁধে তোমরা আমাকে নীলনদে ফেলে দেবে আর আমি ডুবে মরে যাব। একটা বিষয় চিন্তা করে দেখো; আমরা যার কাছে

যাচ্ছি, তিনি কিবতি খ্রিস্টান। তার কাছে আরও মানুষ যাওয়া-আসা করে। তাদের কেউ যদি আমাকে চিনে ফেলে, তাহলে তো আমরা একজনও তাদের হাত থেকে রেহাই পাব না।'

এটাও একটা সমস্যা। কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান মানুষের কাছে থাকে না। তারা বিষয়টাকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিল।

* * *

বিনয়ামিন আত্মগোপনে ছিলেন। তাই তার ঠিকানার খোঁজ পাওয়া সহজ ছিল না। এরা তিনজন গোয়েন্দা। গোপন তথ্য সংগ্রহ করা-ই গোয়েন্দাদের কাজ। ফলে নানা কৌশল অবলম্বন করে এরা বিনয়ামিনের আস্তানার সন্ধান বের করে ফেলল। জায়গাটা দূরে ছিল না বটে; কিন্তু ছিল অত্যন্ত দুর্গম। অনেকগুলো টিলা-ঢিপি অতিক্রম করে যেতে হবে ওখানে। জমিন কোথাও নিচু, কোথাওবা উঁচু।

দিনের শেষ প্রহরে তারা ওখানে পৌঁছে গেল। ক্ষুদ্র একটা খেজুরবীথি, যেন আগুনপোড়া নরকে ছোট্ট একটা স্বর্গ। একটা গির্জা ছিল। তার চারধারে ছোট-বড় অনেকগুলো তাঁবু। বিনয়ামিন পাথরনির্মিত গির্জার একটা কক্ষে থাকেন। তাকে সংবাদ জানানো হলো, তিনজন যুবক পুরুষ আর একটা মেয়ে এসেছে। বিনয়ামিন তখনই তাদের ডেকে পাঠালেন।

দলনেতা নিজেদের পরিচয় দিল, আমরা হালবের অধিবাসী। খ্রিস্টান ও কিবতি। রাবেয়ার পরিচয় বলল, এ উয়াইসের স্ত্রী। সম্প্রতি এদের বিয়ে হয়েছে। মহিলা মিশর দেখতে, বিশেষ করে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে ভীষণ উদগ্রীব ছিল।

তারা বিনয়ামিনকে নিজেদের খ্রিস্টান নাম বলল। সব কজন গলায় একটা করে ক্রুশ ঝুলিয়ে রেখেছিল।

'আপনারা কি আমার সঙ্গে শুধু দেখা করতে এসেছেন?'– বিনয়ামিন জিজ্ঞেস করলেন– 'নাকি আরও কোনো কথা আছে? আপনাদের দেশে খ্রিস্টানরা কেমন আছে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করা-ই আমাদের মূল উদ্দেশ্য'– দলনেতা বলল– 'তবে বিশেষ একটা কথাও আছে। শামে রোমানরা খ্রিস্টানরা বড় একটা ধোঁকা দিয়েছে। আমরা তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী হেরাকল-এর কাছে গিয়েছিলাম যে, রোমানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাব। কিন্তু হেরাকল ও তার পুত্র কুস্তুন্তিন আমাদের সঙ্গে অনেক খারাপ আচরণ করেছেন। আমাদের নেতারা বুঝে ফেললেন, আমরা মুসলমানদের শত্রুতা ক্রয় করে এলাম; কিন্তু রোমানরা আমাদের সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা পিছন থেকে পালাবার ধান্দা করছে!

'রোমানদের কথায়-প্ররোচনায় আমরা মুসলমান বিজেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম। কিন্তু তারপরও রোমানরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল না। আমরা মুসলমানদের মোকাবেলা করতে পারলাম না এবং অস্ত্রসমর্পণ করতে বাধ্য হলাম। তারা যদি আমাদের বোন-কন্যাদের দাসি আর আমাদের দাস বানিয়ে নিত, তাহলে তাদের ঠেকাবার কেউ ছিল না। কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে অমানবিক কোনো আচরণ করল না। তারা নিজেদের বিজেতা আর আমাদের পরাজিত মনেই করল না। আমাদের ধর্মে তারা কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করল না।'

'মুসলমানদের চরিত্র সম্পর্কে আমি অবগত আছি'– বিনয়ামিন বললেন– 'শামে রোমানদের পরাজয়ের কারণ হলো, ওরা দুশ্চরিত্র মানুষ। মিশরে তারা একটা নিজস্ব ধর্ম চালু করে রেখেছে। তোমরা তো নিশ্চয় জান, এখানে আমি আত্মগোপনে আছি। শামের খ্রিস্টানদের জন্য আমি কী করতে পারি বলো।'

'আমরা আপনার থেকে সাহায্য নিতে আসিনি'– দলনেতা বলল– 'আমরা মিশরের খ্রিস্টানদের সাহায্য করতে এসেছি।'

'তোমরা আমাদের কী সাহায্য করতে পারবে?' বিনয়ামিন জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের নেতাদের ও পাদরিদের মিশরের অবস্থা জানা আছে'– দলনেতা বলল– 'মিশরের কয়েকটা খ্রিস্টান পরিবার পালিয়ে শাম চলে গেছে। তারা এখানকার খ্রিস্টানদের উপর কীরূপ নিপীড়ন চালানো হচ্ছে, তার বিবরণ দিয়েছে। আমাদের নেতাদের পক্ষে তো এটা সম্ভব নয় যে, তারা মিশর আক্রমণ করবেন। মুসলমানদের একজন সেনাপতি আছেন আমর ইবনে আস। নেতারা তার কাছে একটা প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন। দলে দুজন প্রবীণ পাদরি ছিলেন। তারা মুসলিম সেনাপতিকে মিশরের খ্রিস্টানদের দুর্দশার বিবরণ দিয়ে আবেদন জানালেন, মুসলমানরা যদি মিশরি খ্রিস্টানদের সাহায্য করে, শামের খ্রিস্টানরা তাদের ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দেবেন।'

দলনেতা এখান থেকেই আসল কথা শুরু করলেন এবং বলতে থাকলেন। বিনয়ামিন মনোযোগসহকারে তার বক্তব্য শুনতে থাকলেন, যেন কথাগুলো তার খুবই ভালো লাগছে। দলনেতা দৃঢ়তার সাথে বললেন, মিশরের খ্রিস্টানরা যদি বিদ্রোহ করে, তাহলে মুসলমানরা মিশরের উপর আক্রমণ চালাবে। আর যদি বিদ্রোহ না করে, তাহলে আক্রমণ হলে যেন তারা মুসলমানদের সাহায্য করে।

আমর ইবনে আস (রাযি.) এই তিন মুজাহিদকে যে-মিশন ও নির্দেশনা দিয়েছিলেন, দলনেতা সেই অনুসারে কথা বললেন।

'আমি আরও একটা কথা বলব'– দলনেতা বলল– 'একটা বিষয় দেখে আক্ষেপে মরে যাই যে, খ্রিস্টানরা নানা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি

খ্রিস্টবাদ ও খ্রিস্টানদের ঐক্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। একটা প্রথা খ্রিস্টানদের অনেক ক্ষতি করছে যে, একজন কুমারী মেয়েকে নীলনদে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। এই কুসংস্কারটা কিবতি খ্রিস্টানদের গ্রাস করে ফেলেছে। আপনি কি এই নির্মম প্রথাটা বন্ধ করতে পারেন না?'

'এই প্রথাটাকে আমি সঠিক মনে করি না'– বিনয়ামিন বললেন– 'আমি ইয়াকুবি ফেরকার কিবতি। ইয়াকুবিরা এই প্রথাটাকে হত্যার মতো পাপ মনে করে। কিন্তু এখনও আমি বিষয়টা এড়িয়ে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে আমি এখনও মুখ খুলছি না। বলির সমর্থক কিবতিরাও আমাকে নেতা মানে আর হেরাকল-এর বিরুদ্ধে আমি ময়দান চালু করে রেখেছি, তাতে তারা আমার নির্দেশনা ও আদেশের অনুসরণ করে। এমতাবস্থায় যদি আমি ঘোষণা দেই, নারীবলি পাপ, তাহলে নির্বোধ ও কট্টর কিবতিরা তা মানবে না এবং বিভেদ তৈরি হয়ে যাবে। আমার আন্দোলনের জন্য তার ফলাফল শুভ হবে না। কাজেই এই আলোচনা আপাতত বাদ দিয়ে তোমরা যে-মিশন নিয়ে এসেছ, সেই বিষয়ে কথা বলো।'

'আমাদের যা বলবার ছিল বলে ফেলেছি'– দলনেতা বলল– 'এখন আমাদের আপনার উত্তর আর আদেশের প্রয়োজন, যা আমরা আমাদের নেতাদের কাছে বয়ে নিয়ে যাব।'

'তোমাদের নেতাদের কাছে নয়'– বিনয়ামিন মিটিমিটি হেসে বললেন– 'আমার বার্তাটি তোমরা তোমাদের সিপাহসালার আমর ইবনে আস-এর কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। তোমরা কথা এত বেশি বলেছ যে, যে-আবরণটা তোমাদের উপর ফেলে রেখেছিলে, এত অধিক পরিমাণ খসে গেছে যে, আমি তোমাদের আসল পরিচয় দেখে ফেলেছি। এই মেয়েটার পানে তাকিয়ে আমি ভাবছি, একে তোমরা সাথে নিয়ে ঘুরছ কেন। মুসলমান তো যুদ্ধের মাঠে নারীদের লড়ায় না। নারীকে তারা গোয়েন্দাকাজেও ব্যবহার করে না।

'আমি নতুন মুসলমান'– রাবেয়া বলল– 'গতকাল আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। শামের নগরী হালবে আমার বাড়ি।

রাবেয়ার জীবনের উপর দিয়ে যে-ঝড় আর দুর্যোগ বয়ে গেছে, সে তার বিস্তারিত বিবরণ শোনাল। একটা কথাও সে গোপন রাখল না। আবার বাড়িয়েও বলল না।

'এই মুসলমানরা নিজেদের কর্তব্য থেকে সরে এসে আমাকে নতুন জীবন দান করেছে'– শেষে রাবেয়া বলল– 'এদের চরিত্রে আমি এতখানি বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হয়েছি যে, অবশেষে এদের ধর্ম ইসলাম কবুল করে নিয়েছি। আমাকে এরা একটি পূত ও পবিত্র বস্তু মনে করে সঙ্গে রেখেছে।'

'আর আমিও নওমুসলিম'– উয়াইস বলল– 'নিজের জীবনটাকে আমি ইসলামের জন্য নিবেদিত করে দিয়েছি।

উয়াইস বিনয়ামিনকে নিজের ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত শোনাল।

ঐতিহাসিক এলফার্ড বাটলার ও আরব ঐতিহাসিকগণ বিনয়ামিনের ব্যক্তিত্বের যে-নকশা উপস্থাপন করেছেন, তা একই রকম। তারা লিখেছেন, বিনয়ামিন মিশরের কিবতি খ্রিস্টানদের প্রধান পাদির ছিলেন। মানুষ সর্বান্তকরণে তাকে শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন অসাধারণ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। তার চরিত্রের ভিত্তি ছিল সৎকর্ম ও মানবপ্রেম। খ্রিস্টবাদের সেসব ধর্মনেতা ও গোত্রাধপতিদের প্রাণের শত্রু ছিলেন, যারা সম্রাট হেরাকল-এর সরকারি ধর্মের অনুসারী ছিল। তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টি ভবিষ্যতের পর্দা বিদীর্ণ করতে সক্ষম ছিল।

'তোমাদের সিপাহসালারকে বলবে'– বিনয়ামিন বললেন– 'হেরাকল আমাদের অভিন্ন শত্রু। আপনি যদি মিশরের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, তাহলে এমনটা কখনওই হবে না যে, খ্রিস্টানরা হেরাকল-এর সঙ্গ দেবে। আমরা সেই সময়টার কথা ভুলব না, যখন ফোকাস রোমের সম্রাট ছিলেন। খ্রিস্টানরা তার শত্রু ছিল। হেরাকল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আমরা পার পক্ষ নিয়েছিলাম এবং ফোকাসের সিংহাসন উলটে দিয়ে হেরাকলকে রোমের রাজার আসনে বসিয়েছিলাম।

'হেরাকল নিজে খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টানদের সমর্থন, সহযোগিতা ও তার জন্য তাদের কুরবানিকে উপেক্ষা করে তিনি খ্রিস্টানদের জন্য নিপীড়নের পথ বেছে নিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি তাদের জীবনকে কোণঠাসা করে রাখলেন। খ্রিস্টানদের জন্য তিনি একজন কসাই ও হায়েনায় পরিণত হলেন। তার আদেশে গরিব খ্রিস্টানদের উৎপদিত শস্যাদি তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বাজিন্তিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হতো খ্রিস্টানদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তিনি তাদের উপর অস্বাভবিক করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

'খ্রিস্টানদের উপর হেরাকল-এর জুলুমের উপাখ্যান অনেক দীর্ঘ। শামের খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে হেরাকল ধোঁকা দিয়েছেন। মুসলমানদের সামনে তাদের তিনি ঢাল বানাতে চেয়েছিলেন। শামে যা কিছু ঘটেছে, সবই আমার জানা আছে। আমি জানি, মুসলমানরা বিজিত অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। প্রজাদের উপর জুলুম-অবিচারের তো প্রশ্নই ওঠে না। সামান্য জিযিয়া পরিশোধ করে যে-কেউ আপন ধর্মের উপর বহাল থাকতে পারে।

'আমার চোখ অনাগত সময়টিকে দেখতে পাচ্ছে। মুসলমানদের এই দৃষ্টিভঙ্গি, এই চরিত্র যদি বহাল থাকে, খ্রিস্টবাদ তার অনুসারীদের ইসলামে কোলে ছুড়ে ফেলতে শুরু করবে আর মিশর ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে। রোমানরা মিশরে দাঁড়াতে

পারবে না। মুসলমানরা যদি মিশরের উপর সেনা-অভিযান পরিচালনা করে, তাহলে এখানকার খ্রিস্টানরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে। আর বিস্ময়ের কোনোই কারণ থাকবে না যে, রোমানরা মিশরের সমধর্মীয় হওয়া সত্ত্বেও মিশরবাসী মুসলমানদের স্বাগত জানাবে।

'তোমরা ফিরে যাও। রোমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের ক্ষেপিয়ে তুলতে কিছু করতে হবে না। আমরা বিদ্রোহ করব না। রোমানদের মতো সামরিক শক্তি আমাদের কাছে নেই। আমরা রোমানদের ধোঁকায় ফেলে রাখব, আমরা তোমাদের অনুগত প্রজা।'

* * *

তিনি মুজাহিদ গোয়েন্দার মিশন সফল হয়েছে। মিশরের অপর কোনো অঞ্চলে গিয়ে খ্রিস্টানদের উত্তেজিত করার প্রয়োজন নেই। এরা তিনজন যে-কাজ নিয়ে এসেছিল, খ্রিস্টানদের প্রধান পাদরি-ই তা করে দিয়েছেন। উয়াইস তো প্রয়োজনের চেয়ে বাড়তি একটা সফলতাও অর্জন করে ফেলেছে। তারা বিনয়ামিন থেকে বিদায় নিয়ে এল এবং রাতটা কাওসের সরাইখানায় কাটাল। সকালে সূর্যোদয়ের অনেক আগেই ভাড়াকরা উটে চড়ে এসকান্দারিয়ার উদ্দেশে রওনা হলো। তাদের একটা আশঙ্কা ছিল, মানুষ তাদের চিনে ফেলবে এবং রাবেয়াকেও চিনে ফেলবে। তা-ই যদি হয়, তাহলে মেয়েটাকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নীলনদে ফেলে দিবে। কিন্তু প্রসন্ন যে, ঘাটে গিয়েই তারা একটা জাহাজ পেয়ে গেল। তারা জাহাজটাতে চড়ে বসল এবং জাহাজ রওনা হয়ে গেল।

ইতিহাস দ্বারা এই তথ্য জানা যাচ্ছে না যে, এই তিন মুজাহিদ কতকাল মিশরে ছিল এবং আমার ইবনে আস (রাযি.) যখন তাদের মিশরের উদ্দেশে রওনা করান, তখন তিনি কোথায় ছিলেন। তবে এই তথ্য জানা যাচ্ছে যে, তারা যখন ফিরে এল, তখন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে ছিলেন। তথ্যটা মুজাহিদরা পথেই কারও মাধ্যমে জেনে নিয়েছিল। তারা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলেন। খবরটা পাওয়ামাত্র আমর ইবনে আস (রাযি.) তৎক্ষণাৎ তাদের ডেকে পাঠালেন।

'কী করে এসেছ?' কোনো ভূমিকা ছাড়াই সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন।

দলনেতা সমস্ত কারগুজারি সবিস্তার শোনালেন এবং বিনয়ামিন যা-যা বলেছেন, অক্ষরে-অক্ষরে তার বর্ণনা দিলেন।

'এ তো হলো কিবতিদের প্রধান পাদরির কথা'– দলনেতা বললেন– 'আমরা ওখানে প্রতিজন খ্রিস্টানের অন্তর রোমানবিরোধী ঘৃণায় টইটুম্বুর দেখেছি। প্রতিটি আসরে, গির্জায়, পান্থশালায়, ভ্রমণপথে এই ঘৃণার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।'

'বিনয়ামিনের বক্তব্যকে আমি শেষ কথা মনে করছি।' আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন।

'আমার একটা পরামর্শ মেনে নিন'– অপর এক মুজাহিদ বললেন– 'মিশর আক্রমণ যদি করতেই হয়, তাহলে দেরি না করে এখনই করে ফেলুন। রোমান বাহিনীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এখনও ঠিক হয়নি। ওরা এখনও নিজেদের সামলে উঠতে পারেনি। খ্রিস্টানরা এই বাহিনীর শত্রু হয়ে গেছে।'

আমর ইবনে আস এই রিপোর্ট শুনে খুবই খুশি হলেন। তিনি বললেন, আগে আমি মদীনা যাব এবং আমীরুল মুমিনীন থেকে মিশর-আক্রমণের অনুমোদন নেব।

কাজের কথা হয়ে গেলে সিপাহসালারকে রাবেয়ার কথা শোনানো হলো। রাবেয়া বাইরে বসা ছিল। উয়াইস সিপাহসালারকে বললেন, রাবেয়ার সঙ্গে আমার বিবাহ পড়িয়ে দিন। আমর ইবনে আস রাবেয়াকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি উয়াইসের হাতে কীভাবে পড়েছ? রাবেয়া সেই কাহিনী-ই শোনাল, যা উয়াইস আগেই সিপাহসালারকে শুনিয়েছিল। তিনি মূলত সত্যায়ন করতে চাচ্ছিলেন, উয়াইস যে-বিবরণ দিয়েছে, তা সঠিক কিনা। তাঁর নিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, এই তরুণীর উপর কোনো প্রকার জবরদস্তি চলছে কিনা। রাবেয়া তাঁকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করে দিলেন, না; এখানে কোনো সমস্যা নেই। রাবেয়া নিজেও উয়াইসের জীবনসঙ্গিনী হওয়ার আগ্রহ দেখাল। সিপাহসালার উয়াইস-রাবেয়ার বিবাহ পড়িয়ে দিলেন।

* * *

আমর ইবনে আস (রাযি.) মদিনা যাওয়ার সুযোগ তৈরি করছিলেন। মনে তাঁর আশা জন্মে গেল, মিশর-অভিযানের অনুমোদন তিনি পেয়ে যাবেন। কিন্তু দিনচারেক পর আমীরুল মুমিনের বার্তা নিয়ে মদিনা থেকে একজন দূত এল। বার্তাটি পড়ে আমর ইবনে আস কেঁপে উঠলেন। এমন একজন দুঃসাহসী ও প্রত্যয়দীপ্ত সেনাপতির হাত কাঁপতে শুরু করল।

সংক্ষিপ্ত সেই বার্তাটি ছিল–

'আমর ইবনে আস-এর নামে। আসসালামু আলাইকুম। হাম্‌দ ও সালাতের পর। তুমি যদি আমাকে, আমার সাথীদের আর সেই লোকদের, আমি যাদের জিম্মাদার ধ্বংস হতে দেখ, তাহলে কি তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে বেঁচে থাকবে? মদদ! মদদ! মদদ!'

এই বার্তাটির ধরন ছিল, যাতে বর্তমান যুগে 'এসওএস' (জরুরি সাহায্য চেয়ে প্রেরিত বার্তা) বলা হয়।

'কী বিপদ দেখা দিল?' আমর ইবনে আস (রাযি.) মাথা তুলে দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'দুর্ভিক্ষ!'– দূত উত্তর দিল– 'আরবের দক্ষিণাঞ্চলীয় সামীন্ত থেকে শুরু করে উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ মানুষ ও গবাদিগুলোর জীবন অত্যন্ত নিমর্মভাবে হরণ করে চলছে। আমার ফিরতে-ফিরতে মদিনার কত মানুষ যে প্রাণ হারাবে ভাবতে পারছি না। খাবারের একটাও দানাও কোথায় চোখে পড়ছে না। মানুষ পানির জন্য হাহাকার করছে। দুগ্ধদায়িনী পশুগুলো শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে মরে যাচ্ছে। ওদের শরীরে আদ্রতা বলতে একটা ফোঁটাও নেই; তা দুধ দেবে কোথা থেকে!'

এই ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষ ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৮ হিজরিতে দেখা দিয়েছিল।

দূত মদিনার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার রোমহর্ষক বিবরণ দিল আর তা শুনে শ্রোতা প্রকম্পিত হয়ে উঠলেন।

আমর ইবনে আস আমীরুল মুমিনীনের নামে পয়গাম লেখালেন। ইতিহাসের ভাষ্যমতে বার্তাটি ছিল শুধু এটুকু–

'আমীরুল মুমিনীনের নামে। আসসালামু আলাইকুম। হাম্‌দ ও সালাতে পর। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি খাদ্যদ্রব্যের একটা বহর পাঠাচ্ছি, যার একটা মাথা থাকবে আপনার কাছে আর অপর মাথা থাকবে আমার কাছে।'

আমীরুল মুমিনীন একই বার্তা মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান ও আবু উবায়দা (রাযি.)-এর নামে শামে পাঠালেন, যারা ওখানরা গভর্নর ও সিপাহসালার ছিলেন। তারপর একই ধরনের বার্তা ইরাকের গভর্নর ও সেনাপতি সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.)কে পাঠালেন। তাঁরা প্রত্যেকে আমীরুল মুমিনীনকে সেই উত্তরই দিলেন, যেমনটি হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) দিয়েছিলেন।

ইতিহাসে যে-পরিসংখ্যান এসেছে, তার বিবরণ এ-রকম–

আমর ইবনে আস ফিলিস্তিন থেকে আটা ও ঘি বোঝাই এক হাজার উট সড়কপথে এবং একই সামগ্রীবোঝাই বিশটি নৌজাহাজ আয়লার বন্দর থেকে রওনা করান। খাদ্যদ্রব্য ছাড়া তিনি পাঁচ হাজার কম্বলও পাঠালেন।

শাম থেকে মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ান আটাবোঝাই তিন হাজার উট পাঠালেন। তিনি খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত তিন হাজার চোগাও প্রেরণ করলেন।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ইরাক থেকে এক হাজার উট পাঠালেন, যেগুলো খাদ্যদ্রব্যে বোঝাই করা ছিল।

শামের অপর এক অঞ্চল থেকে গভর্নর ও সিপাহসালার আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাযি.) চার হাজার উটের পিঠে খাদ্যদ্রব্য, পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী বোঝাই করলেন এবং নিজে কাফেলার সঙ্গে রওনা হলেন।

এসব ত্রাণসামগ্রী মদিনা পৌছলে আমীরুল মুমিনীন হযরত গুমর (রাযি.) দুর্ভিক্ষকবলিত নাগরিকদের মাঝে এগুলো বন্টনের ভার আবু উবায়দা (রাযি.)-এরই উপর ন্যস্ত করলেন। সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছে, আমীরুল মুমিনীন এর জন্য হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)কে চার হাজার দেরহাম পারিশ্রমিক দিতে আদেশ জারি করেছিলেন।

'আমীরুল মুমিনীন!– আবু উবায়দা (রাযি.) বললেন– 'এই বিনিময়ের আমার প্রয়োজন নেই। আমি যে-সহযোগিতা করেছি, তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি। আমি আমাকে জাগতিক স্বার্থের দিকে টানাবেন না।'

'এই বিনিময় তুমি দাবি করনি'– আমীরুল মুমিনীন বললেন– 'তাই এগুলো গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমার এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল। আজ তুমি আমাকে যে-উত্তরটি দিয়েছ, সেদিন আমিও আল্লাহর রাসূলকে একই জবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার যুক্তি রদ করে অর্থগুলো গ্রহণ করতে তিনি আমাকে বাধ্য করেছিলেন।'

হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) দেরহামগুলো নিয়ে নিলেন এবং শামের সেই অঞ্চলটির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন, যেখানকার তিনি গভর্নর ছিলেন।

* * *

এই কাহিনী ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ-না এই দুর্ভিক্ষে আমীরুল মুমিনীন ও তাঁর অধীন অফিসারদের কর্তব্যসচেতনতা ও মানবপ্রেমের বিবরণ তুলে ধরব।

দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল, আকাশ বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছিল। অনাবৃষ্টির ফলে সূর্য মদিনার ভূমিকে পোড়াতে শুরু করেছিল। ক্ষেতের মাটিগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। কোথাও একটা সবুজ ঘাসেরও অস্তিত্ব অবশিষ্ট রইল না। ক্ষেতের ফসলগুলো জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। কোনো প্রকার উৎপাদন বাকি রইল না– খরায় সব শেষ হয়ে গেছে।

খেজুরের বাগানগুলো শুকিয়ে গেছে। কোথাও সবুজের নাম-চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। বাতাস প্রবাহিত হলে কেবলই ধুলা উড়ছিল। কোনো একটা গাছে একটা সবুজ পাতা চোখে পড়ছিল না। গাছগুলো শুকিয়ে শুকনা লাকড়িতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ভেড়া-বকরির পাল, ঘোড়া-গাধা ও অন্যান্য পশুগুলো এত দ্রুততার সাথে মরে যাচ্ছিল, যেন মৃত্যু তাদের ঝাড় দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যাদের হাতে অর্থ-কড়ি ছিল, তারাও অনাহারে মরে যেতে শুরু করেছিল। খাদ্যের একটা কণাও কোথাও অবিশষ্ট ছিল না।

দুর্ভিক্ষের এই বছরটি 'আমুর রামাদা' বা 'ছাইয়ের বছর' নামে অভিহিত হয়েছিল।

দেখার বিষয় হলো, সে-সসময়কার শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান ও তার অধীনরা কী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর নীতি-আদর্শ এমনিতেই ছিল অনেক উন্নত। তদুপরি তা ছিল ইসলামের ছাঁচে তৈরি করা। তিনি জনসভার আয়োজন করে ভাষণ প্রদান করেননি যে, একজন মানুষখেও আমি না খেয়ে মরতে দেব না। মজুদদারদের বিরুদ্ধে আমি কঠোর ব্যবস্থা নেব। এর জন্য আমি কমিটি তৈরি করে দেব। প্রতিটি মুহূর্তে আমি আপনাদের পাশে থাকব। এমনি জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে রাতে প্রাসাদে গিয়ে পেট পুরে কোরমা-পোলাও খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন শাসক হযরত ওমর ছিলেন না।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) ইরাক, শাম ও ফিলিস্তিন থেকে আগত খাদ্যবহরগুলোকে আদেশ দিলেন, তোমরা পীড়িত অঞ্চলগুলোতে চলে যাও এবং ত্রাণের সম্পদগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দাও। দ্বিতীয় আদেশ জারি করলেন, কাফেলার উটগুলো ফিরিয়ে আনবে না– এগুলোও জবাই করে লোকদের মাঝে বাটোয়ারা করে দেবে। দুর্ভিক্ষকবলিত অঞ্চলগুলোতে একটা উটও জীবিত ছিল না। দু-চারটা থাকলেও তা ছিল হাড়ের কঙ্কালমাত্র। গায়ে গোশতের চিহ্নও ছিল না। ফলনশীল এলাকা থেকে আসা উটগুলো ছিল সুস্বাস্থ্যবান ও নাদুশনুদুশ। কম হলেও দশ হাজার উট জবাই করে ক্ষুধাপীড়িত নাগরিকদের খাওয়ানো হলো।

মদিনা খেলাফতের রাজধানীও ছিল আবার সর্বদিক থেকে আরবের কেন্দ্রীয় শহরও ছিল। ওখানে স্বচ্ছল লোকদের বসবাস ছিল। তাদের ঘরে খাদ্যদ্রব্যের বিপুল ভাণ্ডার ছিল। এখন মদিনার অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, দুর্ভিক্ষপলায়িত হাজার-হাজার মানুষ, এক-একটি পরিবার-গোত্র মদিনা এসে আশ্রয় নিয়েছে। শরণার্থীদের সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলছে। এরা সবাই ক্ষুধার্ত। এদের শিশুসন্তানরা না-খাওয়া। মহিলারা ক্ষুধায় কাতর। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা ট্যা-ট্যা করছে। তাদের মায়েদের স্তন শুকিয়ে গেছে।

হযরত ওমর মদিনার নাগরিদের আদেশ জারি করলেন, তোমরা ঘরে দ্বিগুণ খাবার রান্না করো এবং এই শরণার্থীদের বণ্টন করে ঘরে-ঘরে নিয়ে যাও। সাথে-সাথে আদেশ তামিল হয়ে গেল। শরণার্থীদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছিল। হযরত ওমর ঘুরে-ঘুরে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। মদিনা সামর্থ্যবান নাগরিকরা তাঁকে পুরোপুরি সহযোগিতা করছিল। কিন্তু তারপরও কিছু মানুষ ক্ষুধার্ত রয়ে যেত।

আমীরুল মুমিনীন তারও সমাধান বের করে নিলেন। তিনি আদেশ জারি করলেন, কারও ঘরে খাবার রান্না হবে না। সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এক জায়গায় জমা করে একসঙ্গে রান্না করা হবে এবং সবাই এক দস্তরখানে বসে খাবে। এর সূচনা আমীরুল মুমিনীন নিজের ঘর থেকে করলেন। খাবার একস্থানে রান্না হতে শুরু করল। আমীরুল

মুমিনীন নিজের পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে ওই গণদস্তরখানে খেতে শুরু করলেন।

মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, এই দস্তরখানে প্রতিদিন যারা আহার করতেন, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। রুগ্ন, বৃদ্ধ, পঙ্গু, নারী ও শিশু যারা এই দস্তরখানে আসতে পারত না, তাদের জন্য সেখানে খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো, যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর চরিত্র এবং উম্মতে রাসূলের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আত্মবিলোপতা একটিমাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে। ঐতিহাসিকগণ এমন অনেকগুলো ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্থান দিয়েছেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর সবার সঙ্গে দস্তরখানে বসে আহার করতেন। যথারীতি একদিন খেতে বসলেন। সেদিনকার খাবার ছিল ঘিমাখা রুটি। তিনি এক বেদুইনকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে নিলেন। দুজনে এক পাত্র থেকে খাবার খেতে শুরু করলেন।

বেদুইন অভদ্রের মতো খাচ্ছিল। পাত্রের যেখানেই ঘি দেখছে, ওখানেই হাত দিয়ে বড়-বড় লোকমা তুলে মুখে পুরছে। আমীরুল মুমিনীন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনও ঘি-রুটি খাওনি?

'আমীরুল মুমিনীন!'– বেদুইন অনুনয়ের সাথে বলল– 'দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে না ঘি দেখেছি, না রুটি। না অপর কাউকে ঘি-রুটি খেতে দেখেছি।'

আমীরুল মুমিনীন তখনও কসম খেলেন, যতদিন-না দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটবে, ততদিন ঘিমাখা রুটি খাব না। সবাই দেখল, তিনি ঘিয়ের সাথে গোশত খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। তার দৌড়ঝাঁপ ও তৎপরতার অবস্থা ছিল, এই মদিনায় খাবারের আয়োজন পর্যবেক্ষণ করছেন তো এই দূরবর্তী কোনো অঞ্চলের পরিস্থিতি পরিদর্শনে ছুটে যাচ্ছেন যে, ওখানকার মানুষ ঠিকমতো খাবার পাচ্ছে কিনা।

এক তো বিরামহীন পরিশ্রম, ছোটাছুটি ও দুশ্চিন্তার ক্রিয়া। তার সঙ্গে যোগ হলো প্রতিবেলা স্বল্পাহারের কুপ্রভাব। লাল-শাদা মানুষটির রং কালো হয়ে গেল এবং শরীরটা দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে গেল। পেটে কিছু একটা ব্যথাও তিনি অনুভব করতে শুরু করলেন। তাঁর সহকর্মীরা চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন, আমীরুল মুমিনীন যদি পুরোপুরি খাবার গ্রহণ না করেন, তা হলে তো এই পরিস্থিতি তাঁর জীবনের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াবে!

তাঁর সহকর্মীদের মাঝে প্রবীণ সাহাবাগণও ছিলেন। তাঁরা বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি বিশ্রাম করুন আর না করুন কমপক্ষে রোজকার খাবারটা পুরোপুরি খান। তিনি যে-উত্তরটি দিয়েছিলেন, ইতিহাসের আঁচালে তা সংরক্ষিত আছে। তিনি

বললেন, 'মানুষের কষ্টের অনুভূতি আমার এভাবে হতে পারে যে, তাদের উপর দিয়ে যা বয়ে যাচ্ছে, আমার উপর দিয়েও তা বয়ে যাবে।'

আজ আমাদের শাসকরা যদি হযরত ওমর (রাযি.)-এর এই শব্দগুলোকে নিজেদের জীবনের মূলনীতি বরং ঈমানের অংশ বানিয়ে নেন, তাহলে আমাদের বিরান গুলবাগিচা পুনরায় সবুজ-সতেজ হয়ে উঠবে।

হযরত ওমর আল্লাহর সমীপে অশ্রু ঝরিয়ে আহাজারি করতেন– 'হে আল্লাহ! এই দুর্ভিক্ষ যদি আমার কোনো পাপ কিংবা কর্তব্যে অবহেলার শাস্তি হয়ে থাকে, আমাকে তুমি মাফ করে দাও। আমার পাপের দরুন আমার জাতিকে তুমি শাস্তি দিয়ো না।'

দু'আ কবুল হচ্ছিল না। আসমান জ্বলছিল। জমিন পুড়ছিল।

দুই

আকাশ আরব ভূমির শত্রু হয়ে গিয়েছিল। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর ব্যবস্থাপনা ও দৌড়ঝাঁপ জনগণকে দুর্ভিক্ষ থেকে নয়– অনাহার থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম ছিল, যা তিনি দিয়েছেন। কিন্তু সাহাবা কিরাম ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর দ্রুত অবনতিশীল স্বাস্থ্যের ব্যাপারে চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। আমীরুল মুমিনীনের শরীরটা ক্রমশ ভেঙে যেতে লাগল। পুষ্টিকর খাদ্য-খাবার তিনি একদম ছেড়েই দিয়েছেন। বলছেন, এ-খাবার আমি সেদিন খাব, যেদিন আমার জাতির প্রতিজন সদস্য এ-খাবার খেতে পাবে।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ 'তাবাকাত'-এ লিখেছেন, মুরুব্বীদের ইঙ্গিতে কতিপয় তরুণ আহারের সময় হযরত ওমর (রাযি.)কে কোনো এক অজুহাতে সাধারণ দস্তরখান থেকে সরিয়ে আলাদা বসিয়ে গোশতের সঙ্গে ঘিয়ে তৈরিকরা রুটি তাঁর সামনে রাখল এবং তাঁকে কথায় জুড়িয়ে রাখার চেষ্টা করল। তারা প্রতিজ্ঞা করল, আমীরুল মুমিনীনকে আজ গোশত-রুটি না খাইয়ে ছাড়ব না। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন খাবারগুলো একধারে সরিয়ে দিলেন।

'দস্তরখানে ঘুরে-ফিরে দেখো'– আমীরুল মুমিনীন বললেন– 'অনাহারের ফলে যারা একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেছে, এই খাবার তাদের খাইয়ে দাও। আমার জন্য সাধারণ রুটি আর সবার জন্য রান্নাকরা সালনই বেশি সঙ্গত।'

ইবনে সা'দ তিনজন ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, হযরত ওমর সেদিন সন্ধ্যায় আদেশ জারি করেছিলেন, সাধারণ দস্তরখানে যারা আহার করছে, তাদের গণনা করো। গণনা করা হলো। সাত হাজারেরও বেশি। বৃদ্ধ, শিশু ও রুগ্ন যাদের এই দস্তরখানে আসা সম্ভব ছিল না, তারা যে যেখানে ছিল, তাদের কাছে খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো। তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজেররও বেশি।

আমীরুল মুমিনীন সে-রাতেও সেই খাবারই খেলেন, যা অন্য সবাই খেয়েছিল। তিনি পানি চাইলেন। তাঁকে মধুমেশানো পানি দেওয়া হলো। এক ঢোক পান করেই তিনি পাত্রটা রেখে দিলেন। আর পান করলেন না।

'আল্লাহর কসম!'– হযরত ওমর বললেন– 'আমি এমন কাজ করব না, যার জন্য কিয়ামতের দিন আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

একদিন আমীরুল মুমিনীন তাঁর এক শিশুপুত্রকে তরমুজের একটা টুকরা খেতে দেখলেন। দেখেই তিনি বললেন, 'বাহ আমীরুল মুমিনীনের ছেলে তো ফল খাচ্ছে আর আল্লাহর রাসূলের উম্মত না খেয়ে মারা যাচ্ছে!

ছেলে তার মহান পিতার মেজাজ সম্পর্কে অবগত ছিল। ছেলেটি কেঁদে ফেলল। কিন্তু পুত্রের কান্না তাঁকে প্রভাবিত করতে পারল না। পাশের থেকে একজন বলল, আপনার ছেলে তরমুজের এই টুকরাটা কয়েকটা খেজুরের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছে। এবার তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং ছেলেকে কাছে ডেকে সান্ত্বনা দিলেন।

* * *

দুর্ভিক্ষ চলছেই। অবসানের কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইরাক ও শাম থেকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য রসদপাতি আসছে, যেগুলো সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মদিনার দূর-দূরান্ত অঞ্চলগুলোতে পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমীরুল মুমিনীন নিজে গিয়ে বণ্টনের ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করছেন। ইতিমধ্যে ছ-সাতটা মাস কেটে গেছে।

একদিন হযরত ওমর (রাযি.) মদিনার অদূরে এক লোকালয়ে গেলেন। ওখানে দুটা ঘরে বিলাপের শব্দ শুনতে পেলেন। এক মহিলার যুবক পুত্র, অপর একজনের স্বামী মারা গেছে। হযরত ওমর সবার আগে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা অনাহারে মারা যায়নি তো আবার? উত্তর শুনে তিনি আশ্বস্ত হলেন, না একজনও খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারায়নি। অজ্ঞাত কোনো এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তারা মৃত্যুবরণ করেছে।

হযরত ওমর (রাযি.) আদেশ জারি করলেন, এদের কাফন বাইতুল মাল থেকে দেওয়া হবে। কাফন এসে পড়ল। দুজনের নামাযে জানাযা হযরত ওমর নিজে পড়ালেন।

রহস্যময় এই ব্যাধিটা বাড়তে লাগল। এমন একটা রোগ ছিল যে, আক্রমণ করার পর আর কোনো সুযোগই দিত না। রোগটা মহামারির আকার ধারণ করতে লাগল। একজন ঐতিহাসিকও লিখেননি রোগটার লক্ষণ কী ছিল। আমীরুল মুমিনীন সামান্য যা একটু বিশ্রাম নিতেন, তাও ছেড়ে দিলেন এবং এই ব্যাধির প্রতিরোধে এলাকায়-এলাকায় ছুটতে শুরু করলেন। ডাক্তারগণও দিশা হারিয়ে ফেললেন। তাদের ঔষধ-চিকিৎসা এতটুকু কাজ করছিল যে, মৃত্যুকে দিনকতকের জন্য ঠেকিয়ে দিত মাত্র। আক্রান্ত ব্যক্তি অবশেষে মৃত্যুর মুখে চলে যেতই।

চিকিৎসকগণ এতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, দুর্ভিক্ষ আর অনাবৃষ্টির সঙ্গে এই রোগটার যোগসূত্র আছে। হযরত ওমর (রাযি.) আদেশ জারি করলেন, যত মানুষ এই রোগে মারা যাবে এবং দুর্ভিক্ষ অবসিত হওয়া অবধি যেকোনা রোগে যারা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের কাফন বাইতুল মাল থেকে সরবরাহ করা হবে। তিনি যেখানেই উপস্থিত হতে সক্ষম হতেন, নিজেই নামাযে জানাযার ইমামত করতেন।

আমীরুল মুমিনীনের কাছে যখনই কোনো রোকাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ আসত, সঙ্গে-সঙ্গে একটা কথা তাঁর কানে এসে গুঞ্জরিত হতো যে, 'আমীরুল মুমিনীন! আপনি ক্ষুধা থেকে তো আমাকে রক্ষা করেছেন; কিন্তু মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারলেন না!' অথবা 'আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে রুটি দিতে পারেন বটে; কিন্তু জীবন দিতে পারবেন না!'

এই রহস্যময় ও নির্দয় ব্যাধিটা সমগ্র আরবের উপর আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। ইতিহাস বলছে, হযরত ওমর প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি লাভের দু'আ করতেন। ঘাতক এই ব্যাধিটা জোরদার আক্রমণ শুরু করলে তিনি রাত জেগে নফল পড়তে এবং দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি চোখের পানি ঝরিয়ে এই ব্যাধি থেকেও মুক্তি লাভের দু'আ করতে শুরু করলেন। মুনাজাতে কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর হেঁচকি বন্ধ হয়ে যেত।

'হে আল্লাহ! হে গাফুর! হে রাহীম!'– দু'আয় হযরত ওমর এই শব্দগুলো অবশ্যই বলতেন– 'আমার পাপের শাস্তি তুমি তোমার রাসূলের উম্মতকে দিয়ো না। তোমার বান্দাদের আমার হাতে খুন করিয়ো না হে আমার রব!'

মনে হচ্ছিল, আরব ভূমি থেকে আল্লাহ চোখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কোনো দু'আ-ই কবুল হচ্ছিল না।

অবশেষে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর অবস্থা এমন দাঁড়াল, যেন তিনি পুরোপুরি পরাজিত হয়ে হাত-পা ছেড়ে বসে পড়েছেন। সব দিকে বার্তা দিয়ে দূত পাঠিয়ে দিলেন, যাও; সবাইকে নিজ-নিজ এলাকায় সমবেত হয়ে এসতেসকার নামায পড়তে এবং আল্লাহর কাছে সানুনয় প্রার্থনা করতে বলো, যেন তিনি এই দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দান করেন। বার্তায় একথাও বলা হলো, যারা রাতারাতি পৌঁছতে সক্ষম হতে, তারা যেন মদিনা পৌঁছে যায়।

দূতরা সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। যারা দূরের কোনো অঞ্চলে যাবে, তারা রাতেও পথচলা অব্যাহত রাখল। মদিনায় নামাযে এসতেসকার সময় পরদিন দুপুরবেলা ঠিক করা হলো। যেখানে-যেখানে বার্তা পৌঁছে গেল, সেখানকার লোকেরা নামাযের সময় নির্ধারণ করে ঘোষণা করে দিল।

পরদিন দুপুরবেলা। সূর্যের তেজ এতই তীব্র, যেন আসমান-জমিন পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে। এমনি সময়ে মদিনার ও বাইরে থেকে আসা পঞ্চাশ-ষাট হাজার শরণার্থী এসতেসকার নামায আদায় করার জন্য বেরিয়ে এল এবং মাঠে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। মাটি জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো গরম, যার উপর খালিপায়ে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু মানুষগুলো এই উত্তপ্ত মাটির উপর খালিপায়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কোনোই সমস্যা নেই। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইমামতের জন্য এগিয়ে এলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় চাদরখানা তিনি গায়ে জড়িয়ে এসেছেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মদিনার মানুষ যখন এই নামায আদায় করছিল, তখন তাদের ফোঁপানি ও হেঁচকি শোনা যাচ্ছিল। একই অবস্থা আমীরুল মুমিনীনের উপরও বিরাজমান ছিল।

নামাযের পর আমীরুল মুমিনীন দু'আর জন্য হাত তুললেন। তাঁর একটি শব্দও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। কারণ, তিনি শিশুর মতো রয়ে-রয়ে কাঁদছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত ওমরের চোখের পানি দাড়ি বেয়ে টপটপ করে এমনভাবে ঝরছিল, যেন তিনি নিজের মুখে পানির ছিটা মারছেন। হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর সামনে বসা ছিলেন। দু'আর সময় হযরত ওমর তাঁর বাহু ধরে তুলে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর উভয় হাত ধরে দু'আর মতো করে আকাশের দিকে তুলে ধরলেন।

'হে আল্লাহ!'– হযরত ওমর আকাশপানে তাকিয়ে বললেন– 'আমি তোমার রাসূলের চাচাকে সুপারিশের জন্য তোমার দরবারে হাজির করেছি। আমার নয়– তুমি এর দু'আ কবুল করো।'

'হে আমার রব!'– হযরত আব্বাস (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর স্বর থেকেও উঁচু স্বরে বললেন– 'তোমার রাসূলের উসিলায় তোমার রহমতের কটি ফোঁটা...।

হযরত আব্বাসের গলায় আর স্বর ফুটল না। কণ্ঠটা তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেল। এমনভাবে ফুঁপিয়ে-ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন, যেন তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন।

মদিনা থেকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যেখানেই আমীরুল মুমিনীনের বার্তা পৌঁছেছে, সেসময় সব জায়গায়ই এসতেসকার নামায পড়া হচ্ছিল। প্রতিটি চোখ থেকেই অশ্রু ঝরছিল আর মানুষ অবনত মস্তকে সকাতর ভাষায় আল্লাহর সমীপে এই আযাব থেকে নিষ্কৃতির প্রার্থনা করছিল।

আকাশ-পোড়ানো, মাটি-পোড়ানো আগুনঝরা সেদিনকার সূর্যটাও একই মূর্তি নিয়ে অস্ত গেল। আরও একটা রাত এল। আবহাওয়া পরিবর্তনের কোনোই লক্ষণ চোখে

পড়ল না। কিন্তু সেই রাতের উদর থেকে যে-ভোরটা জন্ম নিল, তাকে দেখে কারও চোখই বিশ্বাস করতে পারছিল না। আকাশে কোনো সূর্য নেই। আকাশটা পানিতে থলথলে হয়ে সুরমা ও কালো রঙের মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে। অল্পক্ষণ পর যখন এই মেঘ ফেটে পড়ল, দেখতে-না-দেখতে চারদিক বৃষ্টির পানিতে থৈ-থৈ হয়ে গেল। এমন মুষলধারায় বৃষ্টি নামল যে, এখন আর এক হাত দূরের বস্তুটিও দেখা যাচ্ছে না।

ন-মাসের পিপাসাকাতর মাটি আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি তৃষ্ণা মিটিয়ে পান করল।

আরবের এ ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষ নমাস স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

দু-তিন দিন পর বৃষ্টির তীব্রতা হ্রাস পেলে হযরত ওমর মদিনার ভিতরের ও বাইরের সেই পঞ্চাশ হাজার শরণার্থীর মাঝে ছুটতে শুরু করলেন, যারা নমাস যাবত আশ্রয়শিবিরে পড়ে ছিল। তাদের তিনি বলছিলেন, এবার তোমরা আপন-আপন বাড়ি-ঘরে ফিরে যাও। এ ক্ষেত্রে আমীরুল মুমিনীন খুবই জোর দিচ্ছিলেন। পরে তিনি সহকর্মীদের বলেছিলেন, এই শরণার্থীদের আমি মদিনা থেকে এজন্য তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম, যেন তাদের অনায়াসে প্রাপ্ত রুটি-খাবারের লোভে না পেয়ে বসে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ফিরে গিয়ে মানুষ চাষাবাদে লেগে পড়ুক।

* * *

এবার আমি কাহিনীটা পিছনে সেই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে রোজি দ্বিতীয়বারের মতো বলির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। পাদরি ও তার সতীর্থরা তার অপেক্ষায় নীলের কিনারায় সেই জায়গাটায় পৌছে গিয়েছিলেন, যেখানে রোজিকে নীলনদে ফেলে দেওয়ার কথা। জেলেপাড়ার মোড়ল বাবাও সেখানে পৌছে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ যাত্রায়ও রোজি বেঁচে গেল এবং প্রথমে যে-মেয়েটাকে বলি দেওয়ার কথা ছিল, তাকেই ডেকে এনে নীলনদে নিক্ষেপ করতে হলো। হুররিশ শেষ পর্যন্ত মেয়েকে রক্ষা করতে পারল না।

কিন্তু মেয়ের করুণ পরিণতি ও তার বিরহব্যথা হুররিশকে অস্থির ও পাগলপারা করে তুলল। মেয়েটা ছিল তার একমাত্র সন্তান। হুররিশ নিজের ধর্মের কথা ভুলে গেল এবং তার স্থলে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। কন্যার বিরহব্যথার পাশাপাশি এই আঘাতটাও কম ছিল না যে, তার অনেকগুলো মূল্যবান অলংকার হাতছাড়া হয়েছে, যেগুলো সে মেয়েকে বাঁচাতে বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অলংকারও গেল, কন্যাও গেল।

সম্রাট হেরাকল খুব ভালো করেই জেনে ফেলেছেন, জনগণ আর তার পক্ষে থাকছে না। তিনি যে-সরকারি ধর্মের প্রচলন ঘটিয়েছেন, জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তা ছাড়া কিবতি খ্রিস্টানরা যে-মেয়েবলিকে তাদের ধর্মের অনুসঙ্গ মনে করে, হেরাকল-

এর দৃষ্টিতে তা আত্মহত্যার অন্তর্ভুক্ত। সব কিছু মিলিয়ে সম্রাট হেরাকল স্পষ্টতই বুঝে নিয়েছেন, শক্তি প্রয়োগ ছাড়া তার আর কোনো পথ নেই। তাই জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং প্রয়োজনের সময় এ্যাকশন নিতে তিনি স্থানে-স্থানে সেনাচৌকি বসিয়ে নিয়েছেন।

রোমান ফৌজের এমনি একটা চৌকি ছিল হুররিশের বসতি থেকে মাইলতিনেক দূরে। চৌকির সৈনিকরা এলাকায় টহল দিয়ে ফিরত এবং জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে বেড়াত। এ চৌকির সৈনিকরাও প্রায়ই হুররিশদের বসতিতে টহল দিতে আসত।

চৌকিটার কথা হুররিশের মনে পড়ে গেল। প্রতিশোধের যে-আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল, এবার তা লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিল, সুযোগটা আমার কাজে লাগাতেই হবে। হুররিশ চৌকিতে গিয়ে কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করল। বলল, আমাদের পাদরি আমার মেয়েকে তার অমতে জোরপূর্বক ঘর থেকে তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছেন। এর আমি বিচার চাই।

শুনে অফিসার আগুনের মতো জ্বলে উঠল এবং পাদরি ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু হুররিশ তাকে শান্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলল, একাজে আপনাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। অভিযানটা এমনভাবে চালাতে হবে, যেন কেউ বুঝতে না পারে, আমি আপনাকে সংবাদ দিয়েছি। অন্যথায় এলাকার লোকেরা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলবে। হুররিশ বলল, আমি বাড়িতে চলে যাই; আপনারা পরে অভিযান চালাবেন এবং আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলবেন, যেন আমিও কন্যাকে হত্যার দায়ে অপরাধী।

রোমান অফিসার বিষয়টা বুঝে ফেলল এবং হুররিশকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। হুররিশ ব্যাপারটা তার স্ত্রীকেও বুঝতে দিল না।

* * *

দিনের অর্ধেকেরও বেশি সময় কেটে গেছে। হুররিশের এলাকার লোকেরা কতগুলো ধাবমান ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল, যা কিনা সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। বসতিটা তেমন বড় ছিল না। গোটা পঞ্চাশেক ঘরের ক্ষুদ্র একটা আবাদি। মানুষ যার-যার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। তারা ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারদের চিনে ফেলল। এরা তাদেরই বাহিনীর সৈনিক, যারা প্রায়ই টহল দিতে এদিকে আসে এবং এলাকার লোকদের সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করে।

আগন্তুকদের মাঝে একজন অফিসার, একজন যুবক কমান্ডার আর জনাবিশেক সৈনিক। কাছে এসেই তারা লোকালয়টা ঘিরে ফেলল। অফিসার ঘোষণা দিল, একজনও পুরুষ কিংবা নারী পালাবার চেষ্টা করবে না; সবাই বাইরে বেরিয়ে এস।

বস্তির লোকদের উপর ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। তারা সবাই কিবতি খ্রিস্টান এবং সম্রাট হেরাকল-এর সরকারি ধর্মের ঘোর বিরোধী। আবার বছরে একটা মেয়েবলিরও প্রবক্তা, রাষ্ট্রের আইনে যা হত্যার সমান অপরাধ। কাজেই ভয় তাদের পাওয়ারই কথা।

'হুররিশ কে?'– রোমান অফিসার গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করল– 'যে-ই হও সামনে চলে আসো।'

হুররিশ সামনে এগিয়ে গেল। অফিসার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এল এবং সৈনিকদের বলল, তোমরাও নেমে আসো আর ঘোড়াগুলোকে একজায়গায় দাঁড় করিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ো।

'গত রাতে কি তুমি তোমার মেয়েকে বলির জন্য নদীতে নিক্ষেপ করেছ?' রোমান অফিসার জিজ্ঞেস করল।

হুররিশের অস্বীকারই করার কথা ছিল। কারণ, রোমান সেনা-অফিসারের সঙ্গে কথা বলে আগেই কৌশল ঠিক করা হয়েছে, কাউকে বুঝতে দেওয়া যাবে না, বলির সংবাদটা রেমান সেনাক্যাম্পে পৌছানোর গোয়েন্দাগিরিটা হুররিশই করেছে। তাই রোমান অফিসারও পন্থাটা এই অবলম্বন করেছে যে, সে নিজের থেকে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। হুররিশ বলল, না; আমি আমার মেয়েকে বলি দেইনি।

'অফিসার বলল, ঠিক আছে; তাহলে তোমার মেয়েটা এখানে এনে হাজির করো। আমি জানি, তোমার একটা-ই কন্যা। একটা ছাড়া তোমার আর কোনো কন্যা নেই। আমি নিছক সন্দেহের উপর ভিত্তি করে আসিনি। সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ নিয়েই আমি এসেছি। অস্বীকার করে পার পাওয়ার কোনোই সুযোগ তোমার নেই।'

মিনিটকতক পর ষোলো-সতেরো বছর বয়সে একটা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দৌড়ে এসে অফিসারের সামনে দাঁড়াল। বলল, আমি-ই তার কন্যা। আমি ঘরে ছিলাম না। এখানে কী হচ্ছে দেখতে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আরেক ঘরের ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একব্যক্তি ছুটে দিয়ে বলল, তোমার পিতার উপর অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে, তিনি নাকি আমাকে নীলনদে বলি দিয়েছেন। আমি ঘরে ছিলাম না বলে আব্বাজান বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

রোমান অফিসার মিটিমিটি হাসল। তার হাসিতে শ্লেষ ছিল, যেন সে জেনে ফেলেছে, তাকে বোকা ঠাওরানো হচ্ছে। একদিকে তাকিয়ে সে একব্যক্তিকে ডাক দিল, এই! এদিকে আসো। লোকটা এগিয়ে এলে জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েটাকে চেনা? এর কার কন্যা?

'হুররিশের।' লোকটা নির্ভীক গলায় উত্তর দিল।

অফিসার আরেক ব্যক্তিকে ডেকে তাকেও একই কথা জিজ্ঞেস করল।

'আমার অবাক লাগছে, এসব আপনি কী জিজ্ঞেস করছেন!'– লোকটা উত্তর দিল– 'আপনি কি মনে করছেন, আমরা এটুকুও জানি না, এই মেয়েটা কার, অমুক শিশুটা বাবা কে? সবাই জানে, এ হুররিশের কন্যা এবং এর নাম আইনি ।'

এবার রোমান অফিসার বসতির সবগুলো মানুষকে উদ্দেশ করে জানতে চাইল, তোমরা বলো তো এই মেয়েটা কার? সবতির সমস্ত মানুষ এক বাক্যে সমস্বরে উত্তর দিল, এ হুররিশের মেয়ে স্যার ।

রোমান অফিসারের জানা ছিল না, ওরা চোখাচুখি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল, সবাই এই একই উত্তর দেবে, এ হুররিশের মেয়ে । কারণ, তারা বুঝে ফেলেছিল, কোনো এক গাদ্দার হুররিশের কন্যাবলির সংবাদ রোমান বাহিনীর কানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে । এখন যদি অফিসার প্রমাণিত করতে পারে, সংবাদটা সঠিক, তাহলে অসম্ভব নয়, সে সমগ্র লোকালয়টা জ্বালিয়ে দেবে ।

রোমান অফিসার একটা চক্কর লাগালেন । তার মনে সংশয় জেগে গেল হুররিশ ব্যক্তিগত কোনো কারণে তাকে এখানকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে কিনা । সে ক্ষোভের সাথে হুররিশের বাহুতে ধরে একধারে নিয়ে গেল ।

'মনে যদি কোনো বদমায়েশি থাকে তো এক্ষুনি বলে দাও'– অফিসার বলল– অন্যথায় এখানেই সবার সামনে তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেব ।'

'যদি সত্য বলি, তাহলে ওরা আমার মস্তক উড়িয়ে দেবে'– হুররিশ অফিসারের কানে-কানে উত্তর দিল– 'আমি আপনাকে সত্যই বলব । তবে ওদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার ।'

'তুমি সত্যই বলো ।' অফিসার বলল ।

হুররিশ বলল, ও আমার কন্যা নয় । ও অমুকের কন্যা । হুররিশ অফিসারকে মেয়েটার মায়ের নামও বলে দিল ।

আবাদিটার অবস্থান নীলনদের তীরবর্তী এলাকায় । ওখানকার নদীর পাড়টা বেশ খাড়া ও পাথুরে । ওখান থেকে নদীটা বাঁক নিয়েছে এবং প্রস্তটা বেশ সরু । ফলে ওখানে নদীটা খুবই গভীর ও খরস্রোতা । বলির মেয়েদের এখান থেকেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় । যে-মেয়েদের বলি দেওয় হয়, তাদের নীলবধূ বলা হয় এবং তাদের একটি পূত আসমানি সৃষ্টি জ্ঞান করে স্মরণ করা হয় ।

রোমান অফিসার মেয়েটার পিতামাতাকে ডেকে আনালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এই মেয়েটা কার? দুজনই উত্তর দিল, এ হুররিশের কন্যা ।

লোকগুলোর ধর্মীয় চেতনার অবস্থাটা ছিল, মেয়েটার মা নিজের দাবির স্বপক্ষে কথা বলতে গিয়ে অফিসারকে দু-চারটা কড়া কথাও শুনিয়ে দিল । বলল, তোমরা আমাদের অপমান করতে এসেছ বোধহয় ।

রোমান অফিসার বিষয়টা একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার হিসেবে ধরে নিল। ভাবল, ঘটনাটা বেশ মজারই বটে। সে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের চ্যালেঞ্জ বরণ করে নিল। মনে-মনে চিন্তা করে একটা অভিনব পন্থা ঠিক করে নিল সে। মেয়েটাকে বাহুতে ধরে নদীর কূলে নিয়ে দাঁড় করাল। দুজন সৈনিককে আদেশ করল, তোমরা এর ডানে-বাঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। তারপর নিজে জনতার প্রতি মুখ করে দাঁড়াল।

'এই মেয়েটাকে আমি নদীতে নিক্ষেপ করছি'– অফিসার বলল– 'তবে এর মা যদি একে রক্ষা করতে চাও, তাহলে এগিয়ে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পার। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এর পিতামাতার বিরুদ্ধে আমি কোনো ব্যবস্থা নেব না। আমি তোমাদের চিন্তা করার জন্য কয়েক মিনিট সময় দিলাম। কেউ না এলে আমি একে এই খরস্রোতা নদীতে ফেলে দেব। ভেবে দেখো কী করবে।'

মেয়েটা নদীর কূলে দাঁড়িয়ে আছে। দুজন রোমান সৈনিক তার ডাকে ও বাঁয়ে সতর্ক দণ্ডায়মান। অফিসার বসতির লোকদের ও মেয়েটার মধ্যখানে অত্যন্ত আরামের সাথে পায়চারি করছে। বুদ্ধিটা সে ঠিক করেছে ভালোই। কোনো জননীরই পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, তার কলিজার টুকরা কন্যাকে তারই চোখের সামনে স্রোতস্বিনী নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। হুররিশ ও তার স্ত্রী মেয়েটার প্রকৃত পিতামাতা নয়। আশা ছিল, এর আসল মা-বাবা মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ছুটে আসবে। কিন্তু ওখানে ঘটনাটা যা ঘটল, তার ছিল যে-কারুর কামনা ও কল্পনার অতীত।

বস্তির একদিক থেকে একটা ঘোড়া দ্রুতগতিতে ছুটে এল। কে আসছে দেখার জন্য সবাই ওদিকে তাকাল। ঘোড়ার আরোহী রোমান বাহিনীর এই ইউনিটটিরই কমান্ডার। তার অভিমুখ মেয়েটার দিকে। ব্যবধানটা এখন নিতান্তই অল্প।

'আইনি সাবধান!' অশ্বারোহী জোরালো কণ্ঠে হাঁক দিল।

মেয়েটা ওদিকে ফিরে তাকাল। অশ্বারোহী উল্কার মতো ছুটে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকেই মেয়েটার দিকে ঝুঁকে গেল এবং নিজের ডান বাহুটা তার দিকে ছড়িয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটাও তার উভয় বাহু মেলে ধরল। ঘটনাটা কী ঘটতে যাচ্ছে কেউই কিছু বুঝতে পারল না। যে-দুজন সৈনিক মেয়েটার পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল, তারা সমস্যা কিছু একটা আছে বলে সন্দেহ করল। ফলে তারা ঘোড়াটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ততক্ষণে ঘোড়া তাদের কাছে পৌঁছে গেল এবং দুজনকে এমনভাবে ধাক্কা মারল যে, তারা ছিটকে নদীতে গিয়ে পড়ল।

ঘোড়ার গতি আরও বেড়ে গেল। যখন ঘোড়াটা সামনে এগিয়ে গেল, তখন মেয়েটা নদীর কূলে দাঁড়িয়ে নয়– অশ্বারোহীর পিছনে উপবিষ্ট। সে উভয় বাহু দ্বারা অশ্বারোহীর কোমরটা শক্তভাবে ধরে রেখেছে। সৈনিকদের ঘোড়াগুলো একধারে দণ্ডায়মান ছিল। অফিসার অশ্বারোহীকে ধাওয়া করার আদেশ দিল। কিন্তু ধাওয়া করা ছিল অর্থহীন। এতসব ঘটনা ঘটে গেল কয়েক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে মাত্র।

সৈন্যরা তাদের ঘোড়ার দিকে ছুটে গেল এবং লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটতে শুরু করল। কমান্ডারের ঘোড়াও সামরিক ঘোড়া। এতক্ষণে সে অনেক দূর চলে গেছে। সামনে এলাকাটা কিছুটা পাহাড়ি, কিছুটা বুনো। কমান্ডার পিছনে কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। তার ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, যা কিনা তারই গতির সঙ্গে দূরে সরে যাচ্ছিল। ধাওয়াকারী সৈনিকরা কিছু দূর গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

* * *

রোমান বাহিনীর এই কমান্ডারের নাম ইবনে সামের। টগবগে যুবক ও অত্যন্ত সুদর্শন। যখনই টহলে বের হতো, এই লোকালয়ে অবশ্যই আসত। একবার আইনি ও সে মুখোমুখি হয়ে গেল। জায়গাটা ছিল নির্জন– আশেপাশে কোনো মানুষ ছিল না। ইবনে সামের আইনির পথ আগলে দাঁড়াল। আইনি মুখে মুচকি হাসির রেখা ফুটিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল এবং তার নিষ্পাপ ও সরল মুখের উপর ভীতির ছাপ ফুটে উঠল।

'তুমি সৈনিক না?'– আইনি বলল– 'মনে করছ, যা চাইবে তা-ই করতে পারবে। আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের এই অভিযোগই যথেষ্ট যে, আমরা কিবতি এবং বাদশার সরকারি ধর্মের বিরোধী। আমাকে তুমি জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাবে...।'

ইবনে সামেরর উপর রোমানি মুড বিরাজমান ছিল। আইনির এ কথাও তারও মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। আইনির পথ ছেড়ে সে একধারে সরে গেল। কিন্তু আইনি বোধকরি ইবনে সামেরের মুখের পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত হয়ে গেল। ইবনে সামের তাকে পথ দিয়ে দিয়েছিল। ফলে তার পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মেয়েটা ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

'আমি তোমার নাম জানি আইনি!'– ইবনে সামের বলল– 'অনেক দিন যাবতই তোমাকে আমি দূর-দূর থেকে দেখছি। আমার মতলব খারাপ হলে তোমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো কঠিন কাজ ছিল না। আদেশ দিয়েই আমি তোমার পিতামাতাকে চৌকিতে ডেকে নিতে পারি। তুমিও ছুটে আসতে।'

ইবনে সামেরের আবেগ উথলে উঠতে লাগল আর আইনির উপর যেন জাদুর ক্রিয়া ছেয়ে গেল। মেয়েটা ইবনে সামেরের চুম্বকীয় ব্যক্তিত্বে একাকার হয়ে যেতে লাগল।

এই প্রথম সাক্ষাতের পর আইনি ইবনে সামেরের সঙ্গে আরও কয়েকবার দেখা করল। ইবনে সামের কাজে-কর্মে আইনিকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল, সে তার সম্ভ্রমের ভক্ষক নয়– রক্ষক।

'তোমাকে আমি একটা গোপন কথা বলতে চাই আইনি!'– এক সাক্ষাতে ইবনে সামের আইনিকে বলল– 'তোমার উপর আমার এতটুকু বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে গেছে, আমার গোপন কথাটিকে তুমি একটি স্পর্শকাতর ভেদ মনে করবে। আমি

কিবতি খ্রিস্টান। কিন্তু দাবি করছি, আমি সম্রাট হেরাকল ও কায়রাসের খ্রিস্টবাদের অনুসারী। কিন্তু কোনো মেয়েকে নীলনদের বধূ বানানোকে পাপ মনে করি। কায়রাসকে আমি প্রধান পাদরি মানি না। আমার প্রধান পাদরি হলেন বিনয়ামিন। তিনি নারীবলির ঘোর বিরোধী।'

ইবনে সামের ও আইনি দুজনই খ্রিস্টান। যখন খুশি তারা বিবাহ করতে পারে। কিন্তু আইনির পিতামাতার সাথে কথা না বলে তাদের সম্মতি না নিয়ে ইবনে সামের বিবাহ করতে রাজী নয়। একে সে নৈতিক কর্তব্য জ্ঞান করে। একদিন সে আইনির পিতামাতার সঙ্গে কথা বলল। স্বামী-স্ত্রী দুজন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল; কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। অবশেষে পিতা বলল, আমাদের সিদ্ধান্তের কথা আমরা আইনিকে জানিয়ে দেব আর তুমি তার কাছ থেকে জেনে নিয়ো।

পরদিনই ইবনে সামের টহলের অজুহাতে এল এবং আইনি বাইরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল।

'না ইবনে সামের!'– আইনি ইবনে সামেরকে তার পিতার উত্তর শোনাল– 'না আমার বাবা রাজী, না মা। দুজনই অমত। তারা বলছেন, সৈনিকদের বিশ্বাস করা যায় না। তারা আরেকটা কারণ দেখিয়েছেন, সৈনিকরা হেরাকল-এর সরকারি ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে।'

'তুমি কি তাদের কিছু বলনি?' ইবনে সামের হতাশমনে জানতে চাইল।

'বলেছি'– আইনি বলল– 'আমি বলেছি, ইবনে সামের কিবতি খ্রিস্টান এবং বিনয়ামিনকে প্রধান পুরোহিত মানে। আব্বা বললেন, সে তোমাকে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। কোনো সৈনিকই অন্যকোনো খ্রিস্টবাদের অনুসারী হতে পারে না। শেষে আব্বা একথাও বললেন, এখন থেকে তুমি তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দাও।'

'তা তোমার নিজের সিদ্ধান্ত কী?' ইবনে সামের আইনিকে জিজ্ঞেস করল।

'আমার অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেই'– আইনি উত্তর দিল– 'আমি আমার অন্তরকে ধর্মের আর ধর্মকে গোষ্ঠীর অনুগামী বানাইনি। আমি আব্বা-আম্মার সিদ্ধান্ত পালটাতে চেষ্টা করব। না হলে আমি তোমার কাছে চলে আসব।'

* * *

তখনও পর্যন্ত আইনি পিতামাতাকে বোঝাতে সচেষ্ট; কিন্তু তারা মানছে না। এমনি সময়ে এ ঘটনাটা ঘটে গেল। ইবনে সামের দেখল, আইনিকে হুররিশের কন্যা বানিয়ে তার অফিসারের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু তার তো জানা ছিল, আইনি কার কন্যা। তবে এখানে ইবনে সামের নীরব রইল। তারপর অফিসার

মেয়েটাকে নদীর খাড়া পাড়ে দাঁড় করিয়ে ঘোষণা দিল, এর পিতামাতা যারা-ই হও, এসে একে নিয়ে যাও; অন্যথায় আমি একে নদীতে ফেলে দেব। ইবনে ধরে নিল, আইনিকে বাঁচাতে তার পিতামাতা এগিয়ে আসবে না আর হুররিশও সত্য বলবে না। ফলে রোমান অফিসার তাকে নদীতে ফেলেই দিবে আর তার প্রেমাস্পদের সলিল সমাধি ঘটবে। কিন্তু চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটতে দেওয়া যায় না। আমি যদি এখানে উপস্থিত না থাকতাম বা বিষয়টা চোখে না দেখতাম, তা হলে ভিন্ন কথা ছিল। কিন্তু এখন আইনিকে আমার বাঁচাতেই হবে।

ইবনে দ্রুত সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে লোকালয়ে চলে গেল। তার ঘোড়াটা লেকালয়ের বাইরে অদূরে বাঁধা ছিল। সে ঘোড়ার কাছে গেল এবং ঝটপট ঘোড়ার পিঠে চড়ে এদিকে ছুটে এল এবং কাউকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে ঈগলের মতো ছো মেরে আইনিকে নিয়ে উড়ে গেল।

অফিসার ক্ষোভে আগুন হয়ে গেল। সে হুররিশ ও তার স্ত্রীর মুখপানে তাকাল। তাদের চেহারায় বেদনা বা আক্ষেপের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা আসলে কার জানা অফিসারের জন্য কঠিনই ছিল। কিন্তু যারা তার পিতামাতা, তাদের কী করে সহ্য করা সম্ভব যে, একজন সেনাকর্মকর্তা তাদের মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে!

আইনির পিতা অফিসারের কাছে এল এবং জিজ্ঞাসা করল, ওই অশ্বারোহীটা কে ছিল, যে আমার মেয়েটাকে নিয়ে গেল?

এবার আসল ঘটনা উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। রোমান অফিসার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। আদেশ দিলেন, বস্তিটাতে আগুন লাগিয়ে দাও; সব পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও।

বস্তির অধিবাসীরা সবাই কেঁপে উঠল। সবাই হাউমাউ করে উঠল। অফিসার তাদের চুপ করালেন এবং বললেন, একজন কথা বলো। সবাই একসঙ্গে বললে আমি বুঝি কী করে?

মানুষ বলছিল, আমরা অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ মানুষ। ধর্মের ব্যাপার-স্যাপার আমরা নিজেদের জ্ঞানে কিছুই বুঝি না। পাদরি যখন যা বলেন, তা-ই আমরা মেনে নিই। কোনো পিতামাতা, কোনো জনক-জননী আপন যুবতী ও কুমারী কন্যাকে নদীতে নিক্ষেপ করা সহ্য করতে পারে না। এটা ধর্মীয় নেতাদের বিশ্বাস। তারা মানুষকে বলেন, কিছু দিন পর-পর যদি নীলনদকে একটা করে কুমারী মেয়ে না দাও, তাহলে এই নীল তোমাদের জন্য আপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

'আমিও তোমাদেরই মতো খ্রিস্টান'– অফিসার বলল– 'আবার আমি কিবতিও। কিন্তু মেয়েবলিকে আমি অবিচার ও মারাত্মক অপরাধ মনে করি। আমাদের বিশ্বাস

হলো, হযরত ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করেছেন। সেখানে আমি কী করে মেনে নিই, একটা মেয়েরে জীবন হরণ করা খ্রিস্টধর্মে বৈধ? তোমরা কি জান না, আমাদের খোদা কে? আমাদের খোদা তো তিনি, হযরত ঈসা আমাদের সামনে যাঁর পরিচয় তুলে ধরেছেন। এই নদী-সাগর আমাদের খোদা হতে পারে না। এটা খোদার গুণ হতে পারে না যে, তিনি একটা নিষ্পাপ মানুষের জীবন হরণ করে খুশি হবেন।'

তাহলে আপনিই বলুন'– একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল– 'তাহলে কি আমরা সেই খ্রিস্টাবাদকে বরণ করে নেব, যেটি সম্রাট হেরাকল চালু করেছেন?'

রোমান অফিসারের কাছে এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। কারণ, সে হেরাকল-এর সেনাবাহিনীর একজন অফিসার এবং সম্রাট হেরাকল-এর অনুগত কর্মকর্তা। যদি বলে দেয়, না; হেরাকল-এর ধর্ম সঠিক নয়, এ তার গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হবে, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম নয়। তাই উত্তরে অফিসার শুধু বলল, মেয়েবলি হত্যার সমান অপরাধ এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

অফিসার হুররিশকে জিজ্ঞেস করল, তুমি মিথ্যা বললে কেন?

'আমার এই একটি-ই কন্যা ছিল'– হুররিশ উত্তর দিল– 'এরা বড় পাদরির আদেশে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করেছে। স্বীকার করলে এরা আমাকে মেরে ফেলত। কিন্তু এখন আপনি লোকালয়টা জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ জারি করেছেন। আমি বস্তিটা রক্ষা করতে চাই। এখন আমি আপনার সমীপে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলব না। এর শাস্তিস্বরূপ যদি এরা আমাকে মেরে ফেলে, তাহলে আমি এই শাস্তি মাথা পেতে বরণ করে নেব।'

'এই ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও'– রোমান অফিসার বলল– 'আমি থাকতে কেউ তোমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। তোমার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করার সাহস পাবে না। আমি তোমাদের সদকলের প্রশংসা করছি যে, তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করছ, সবাই এক সুরে কথা বলছ। তোমাদের এই ঐক্য আমি অটুট রাখতে চাই। আমি আমার আদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি; তোমাদের বস্তি আমি জ্বালাব না। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি এই বস্তির কোনো নারীকে বলি দেওয়া হয়, তা হলে আমি তা-ই করব, যার আদেশ সম্রাট হেরাকল আমাদের দিয়ে রেখেছেন।'

'কিন্তু আমরা তো আমাদের বড় পাদরির আদেশের বাইরে যেতে পারি না; আমরা তার বাধ্যগত।' একব্যক্তি বলল।

রোমান অফিসার বড় পাদরির আস্তানা ও দোসরদের নাম জেনে নিল। জনতা তাকে সমস্ত তথ্য দিয়ে দিল। হুররিশ জেলে ও মাঝিপাড়ার মোড়লের নামও বলে দিল।

রোমান অফিসার সেখান থেকেই বাহিনী নিয়ে বড় পাদরির আস্তানা অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। গিয়ে সেখানে পাদরিকেও পেল এবং তার কয়েকটা চেলা-চামুন্ডাও পেয়ে গেল। অফিসার তাদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করে নিল।

সে রাতেই অফিসার জেলেপাড়ায় অভিযান চালিয়ে মোড়ল বাবাকেও গ্রেফতার করল।

পরদিন রোমান অফিসার কয়েকজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে আবারও সেই লোকালয়টিকে গেল, যেখানকার একটা মেয়েকে বলি দেওয়া হয়েছিল। এবার তার সঙ্গে বাহিনীর উচ্চপদস্থ একজন অফিসারও ছিল। সঙ্গে আছে কিবতিদের প্রধান পাদরি, পাদরির জনাচারেক সহযোগী ও জেলেপাড়ার মোড়ল বাবা। সবার হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি। বস্তির সমস্ত অধিবাসীকে বাইরে বের করে দেওয়া হলো। ডান্ডা-বেড়িপরা আসামীদের নদীর উঁচু পাড়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো।

'এই লোকগুলোকে ভালো করে দেখে নাও'– নতুন অফিসার জনতাকে উদ্দেশ করে বলল এবং জিজ্ঞেস করল– 'বলো, এরাই কি তারা, যারা আগে একটা মেয়েকে নদীতে ফেলেছিল, পরে হুররিশের কন্যাকে বলি দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ; এরা-ই।' এটা হুররিশের কণ্ঠ।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ; এরাই তারা।' আরও দু-তিনটা কণ্ঠ ভেসে উঠল।

'সবাই বলো।' অফিসার বলল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ; এরাই।' সমগ্র লোকালয় একসঙ্গে বলে উঠল।

অফিসার মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করল। সৈনিকরা আসামীদের দিকে ছুটে গেল। তাদের হাত-পা থেকে ডান্ডা-বেড়ি খুলে ফেলল এবং তাদের নদীর খাঁড়া উঁচু পাড়ে নিয়ে দাঁড় করাল। অপর কয়েকজন সৈনিকের কাছে তির-ধনুক ছিল। অফিসারের ইঙ্গিতে তারা ধনুকে তির সংযোজন করল। পরক্ষণেই তিরগুলো আসামীদের গায়ে গিয়ে বিদ্ধ হলো। তাদের কয়েকজন তির খেয়ে সরাসরি ঝুপ করে নদীতে পড়ে গেল। যারা নদীতে না পড়ে ডাঙ্গাতেই লুটিয়ে পড়ল, সৈনিকরা পা দ্বারা ঠেলে তাদেরও পানিতে ফেলে দিল।

* * *

'আব্বা-আম্মার জন্য আমার কেবলই চিন্তা লাগছে'– আইনি বলছিল– 'রোমান অফিসার তাদের মেরে ফেলবেন!'

কিছু ত্যাগ তো দিতেই হবে আইনি!'– ইবনে সামের বলল– 'আমারও তো পিতামাতা আছেন। আর দেখো না, আমি নিজেকে কীভাবে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিলাম! আমি একজন সৈনিক। যখন ধরা পড়ব, তখন আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এক তো আমি সামরিক আইন লঙ্ঘন করেছি এবং দুজন সৈনিককে হত্যা করে এসেছি। যেদুজন সৈনিক আমার ঘোড়ার সামনে এসে পড়েছিল, ওরা মারা গিয়ে থাকবে নিশ্চয়। এখন আর পিছনের দিকে তাকিয়ো না– সামনের দিকে দেখো। আমি তোমাকে কিবতিদের প্রধান পাদরি বিনয়ামিন-এর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি পথ একটা আমাদের দেখিয়ে দেবেন।'

আত্মগোপনে থাকা বিনয়ামিন-এর ঠিকানা ইবনে সামেরের জানা ছিল। বিনয়ামিন-এরই মিশনের একজন কর্মী ইবনে সামের।

আরও একটা রাত পথে কাটাতে হলো ইবনে সামের ও আইনির। পরদিন তারা বিনয়ামিন-এর আস্তানায় পৌঁছে গেল।

'কী করে এসেছ ইবনে সামের!'– বিনয়ামিন জিজ্ঞেস করলেন– 'এই মেয়েটা কে?'

'ধর্মবিশ্বাস ও নীতি-আদর্শের জন্য কিছু করে আসিনি'– ইবনে সামের উত্তর দিল– 'নিজের ব্যক্তিসত্তা ও আবেগ-জযবার খাতিরে বিরাট এক ঝুঁকি বরণ করে এসেছি।'

ইবনে সামের বিনয়ামিনকে তার ঘটনা বৃত্তান্ত শোনাল।

'মন্দা কিছু করনি তুমি'– বিনয়মিন বললেন– 'নিজের প্রেম ও এই মেয়েটার জীবন রক্ষার্থে তুমি অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করেছ। আপাতত কটা দিন তোমাকে চুপচাপ থাকতে হবে; কোনো কথা বলা যাবে না।'

'আমি কোনো কথা বলব না; চুপচাপই' থাকব– ইবনে সামের বলল– 'কিন্তু আমি বেকার বসে থাকব না। সরকারি খ্রিস্টবাদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করতে চাই। আপনি বলে দিন আমি কী করব।'

বিনয়ামিন পণ্ডিতসুলভ কথাবার্তা শুরু করলেন।

'মহামান্য পাদরি সাহেব!'– ইবনে বলল– 'আমার অতটা জ্ঞান নেই যে, আপনার এসব কথা আমি বুঝব। আপনি শুধু আমাকে এটুকু বলুন, মানুষের মাঝে সঠিক বোধ-বিশ্বাস চড়ানোর স্বার্থে কাকে হত্যা করতে হবে আর আপনার এমন শত্রুদের নাম বলুন, যে আপনার জন্য হুমকি তৈরি করেছে; আমি গিয়ে তাদের হত্যা করব।'

'আপাতত তুমি নিজে খুন হওয়া থেকে নিরাপদ থাকো'– বিনয়ামিন বললেন– 'সামরিক আইনে তুমি যে-অপরাধ করেছ, তার শাস্তি কী হতে পারে তা তোমার জানা আছে। কয়েকটা দিন যাক; তারপর আমি তোমাকে ছদ্মবেশ ধরিয়ে দিয়ে আসল কাজে ব্যবহার করব।'

'একটা বিষয় আমি বুঝতে পারছি'– ইবনে সামের বলল– 'খ্রিস্টবাদের অবমাননা করে হেরাকল যে-শাস্তি পেয়েছেন, তা থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেননি। এমন বিশাল একটা রাজ্য শাম তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে গেল এবং তাঁর অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য মুসলমানদের হাতে প্রাণ হারাল! বর্তমানে যে-ফৌজ তাঁর হাতে আছে, তার উপর আরবের মুসলমানদের এমন ভীতি বিরাজমান যে, আজ কেউ যদি ঠাট্টার ছলেও বলে দেয়, মুসলমানরা মিশরের উপর আক্রমণ চালাবে, তাহলে তাদের মুখের রং ফিকে হয়ে যায়।'

'ধর্মের অবমাননা যে-ই করেছে, তাকেই এরূপ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে'– বিনয়ামিন বললেন– 'ইসলামের মতো খ্রিস্টবাদও এমনই একটি ধর্ম, যার উপর খোদ কিতাব নাযিল করেছেন। সম্রাট হেরাকল রাজত্বের নেশায় মাতাল হয়ে এই পবিত্র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আমি চোখ মেললেই দেখতে পাচ্ছি, মিশরও হেরাকল-এর হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। ধর্মকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে দেওয়া গুরুতর অপরাধ।'

'মুসলামনরা মিশরের উপর আক্রমণ চালাবে নাকি?' ইবনে সামের জিজ্ঞেস করল।

'এতদিনে করেও ফেলত'– বিনয়ামিন বললেন– 'কিন্তু মুসলমানদের উপর দুর্ভিক্ষের এমন এক আপদ নাযিল হয়েছে যে, সমগ্র আরবে মানুষ না খেয়ে মরছে। ওখানকার খবরাখবর আমি যথাসময়েই পেয়ে যাচ্ছি। দুর্ভিক্ষের অবসান না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা অভিযান পরিচালনার চিন্তাও করতে পারবে না।'

'মাননীয় প্রধান পাদরি!'– ইবনে সামের বলল– 'একটা বিষয় আমার মনে উদয় হয়েছে। মুসলমারা যখনই মিশরের আক্রমণ করবে, আমাদেরকে তাদের মোকাবেলায় লড়াই করতে হবে। কিন্তু আমি ভাবছি, মুসলমান যেমন হেরাকলকে শত্রু জ্ঞান করে, তেমনি তারা আমাদেরও দুশমন। তাহলে আমাদের সম্রাট হেরাকল-এর আনুগত্য করা উচিত নয় কি?'

'এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়'– বিনয়ামিন বললেন– 'শাম থেকে তিনজন মুসলমান গোয়েন্দা আমার কাছে এসেছিল। তারা নিজেদের খ্রিস্টান বলে দাবি করেছিল। কিন্তু তাদের আসল পরিচয় আমার কাছে ধরা পড়েছিল এবং বিষয়টি আমি তাদের বলেও দিয়েছি। তারা বলছিল, মুসলিম বাহিনী যদি মিশরের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে মিশরের খ্রিস্টানরা যেন হেরাকল-এর বিরুদ্ধে আক্রমণের আগে বা আক্রমণ চলা অবস্থায় বিদ্রোহ করে বসে। তাদের খলীফা ও সালারদের উদ্দেশ্য হলো, আগে

হেরাকলকে মিশর থেকে বের করবে, তারপর মুসলমান ও খ্রিস্টানরা আপসে একটা সমঝোতা করে নেবে। তোমার প্রশ্নের উত্তর হলো, মুসলমান যখন আক্রমণ চালাবে, তখন কিবতি খ্রিস্টানরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু একথাটিও শুনে রাখো যে, এটি আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। তবে এটা ঠিক যে, কিবতি খ্রিস্টানরা হেরাকল-এর পক্ষাবলম্বন করবে না।'

এ তো ছিল পরের কথা। ইবনে সামেরকে দিনকতক আত্মগোপনে থাকা দরকার ছিল। একটা মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের সমাজে কোনো অপরাধই নয়। আসল অপরাধটা হলো, ইবনে সামের সামরিক আইন লঙ্ঘন করেছে এবং দুজন সৈনিককে হত্যা করেছে।

* * *

সালার আমর ইবনে আস উয়াইস ও রাবেয়ার বিবাহ সম্পন্ন করে দিলেন। মিশর অভিযানের অনুমতি নিতে তিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে মদিনা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু এমনি সময়ে সংবাদ এল, অনাবৃষ্টির ফলে আরবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ অনাহারে প্রাণ হারাচ্ছে।

তারপর তো কারুরই হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রইল না। সবাই দুর্ভিক্ষের মোকাবেলায় উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। সবার অন্তর থেকে দুর্ভিক্ষকবলিত লোকদের পেটে রুটি জোগানোর ধান্দা ছাড়া আর সব ভাবনা-চিন্তা উবে গেল। সর্বগ্রাসী এই দুর্ভিক্ষ একটানা নটা মাস পূর্ণ দাপটের সঙ্গে বহাল থাকল। আমর ইবনে আস-এর হৃদয়পট থেকে মিশর হারিয়েই গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল তো শুধু আরব; কিন্তু কবলিত মানুষগুলোর খাবার জোগানো ইরাক ও শামের গভর্নরদের দায়িত্ব ছিল। অবশেষে তাঁদের কাছে সংবাদ গেল, মহান আল্লাহ আরবে রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেছেন। এবার আমর ইবনে আস-এর মনে পড়ে গেল, আরে! আমি তো মিশর আক্রমণের কথা ভেবেছিলাম!

উয়াইস রাবেয়াকে নিয়ে এখনও বাইতুল মুকাদ্দাসেই অবস্থান করছে। তার অপর দুই গোয়েন্দা সাথীও এ যাবত তার সঙ্গেই আছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের ডাক এসেছিল। কারণ, তারা অত্যন্ত সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। এতদিনে তাদের আপন-আপন বাহিনীতে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আরবে দুর্ভিক্ষ সমস্ত প্লান-পরিকল্পনা তছনছ করে দিয়েছে। ফলে এই গোয়েন্দা আজ অবধি বাইতুল মুকাদ্দাসেই পড়ে রয়েছে।

দুর্ভিক্ষ অবসানের পর যখন শাসনব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল, তখন সিপাহসালার আবু উবায়দা (রাযি.) আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে বার্তা পাঠালেন, তিনি গোয়েন্দা মুজাহিদকে তাদের আসল জায়গায় ফেরত পাঠিয়ে দিন। উয়াইস হালব

থেকে এসেছিল। অধিবাসীও সে ওখানকারই। তাই সে হালব ফিরে যাওয়ার আদেশ পেল। রাবেয়া– যে কিনা ইসলাম গ্রহণের আগে রোজি ছিল– মিশর থেকে ফিরে আসা অবধি উয়াইস-এর কাছে ধরণা দিয়ে বসল, আমি হালবে পিতামাতার সঙ্গে দেখা করতে যাব। উয়াইস তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এর জন্য তুমি এতখানি উদগ্রীব হয়ো না। কারণ, তারা ও তোমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তোমাকে দেখে খুশি হবে না এবং তোমার ইসলাম গ্রহণ করাকে ভালো চোখে দেখবে না।

উয়াইসও নওমুসলিম ছিল। তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ যে-ই শুনত, সে-ই বিস্মিত হতো, আক্ষেপ করত। কারণ, ছেলেটা ছিল অত্যন্ত বিচক্ষণ, দুঃসাহসী ও বুদ্ধিমান। আপনজনরা ভাবল, আহা রে! এমন একটা মূল্যবান ছেলে আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল!

এই অভিজ্ঞতা থেকেই উয়াইস ধরে নিয়েছে, রোজির ব্যাপারেও এর অন্যথা হবে না। রাবেয়াকে উয়াইস ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করল।

'আমি যাবই'– রাবেয়া জিদ ধরল– 'বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা না করতে আমার মনে স্বস্তি ও শান্তি আসবে না। তাছাড়া আমি তাদেরও ইসলামের দাওয়াত দেব; তাদের মুসলমান বানাবার চেষ্টা করব।'

উয়াইস হালবে যেতে বাধ্য। কারণ, ওটা তার কর্মস্থল। ওখান থেকেই তার ডাক এসেছে। অন্যথায় জন্মস্থান হিসেবে হালবকে সে মনে থেকে ঝেড়ে ফেলেই দিয়েছিল। রাবেয়ার পীড়াপীড়িতে অবশেষে তাকেও নিতে সম্মত হয়ে গেল।

* * *

হালব পৌঁছে উয়াইস রাবেয়াকে আপন ঠিকানায় নিয়ে গেল। আগে সে অবিবাহিত মুজাহিদদের মতো বাহিনীর সঙ্গে থাকত। কিন্তু এখন স্ত্রী সঙ্গে থাকাতে বাহিনীর পক্ষ থেকে তাকে ছোট্ট একটা ঘর দেওয়া হলো। কোনো একজন আত্মীয়র সঙ্গে দেখা করার এক বিন্দু সাধ উয়াইসের ছিল না। কিন্তু রাবেয়া চিন্তা ভিন্ন। প্রবল পীড়াপীড়ির মাধ্যমে সে উয়াইসের সম্মতি আদায় করে নিল, তাকে নিয়ে সে তাদের বাড়িতে যাবে। রাবেয়ার মনের দিকে তাকিয়ে উয়াইস রাজি হয়ে গেল। তবে শর্ত আরোপ করল, গিয়ে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব আর তুমি ভেতরে গিয়ে সবার সঙ্গে দেখা করবে। যদি তোমার পিতামাতা ভালো মনে করে, তাহলেই কেবল আমি ভেতরে যাব; অন্যথায় নয়।

দুজন গেল। ঘরের দরজায় পৌঁছে উয়াইস বাইরে দাঁড়িয়ে রইল আর রাবেয়া খুকীটির মতো নাচতে-নাচতে ভিতরে চলে গেল। তাকে দেখে ঘরের সবাই বিস্মিত হলো পরে। তার আগে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, এ কি তাদের রোজি, নাকি তার

আত্মা কিংবা প্রেতাত্মা! তারা নিশ্চিত হয়ে বসে আছে, আমাদের রোজি এখন আর জীবিত নেই। ও তো পাগলের মতো হয়ে নগরী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এতদিনে যখন ফিরে আসেনি, তাহলে নির্ঘাত কোথাও মরে গেছে। এর মধ্যে সময় পার হয়ে গেছে এক বছরের পরেও কয়েক মাস। তার ফিরে আসবার আশা সবাই ছেড়েই দিয়েছিল। আর এখন কিনা তারই বয়সী, তারই চেহারার একটা মেয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে! সবাই হা করে তার পানে তাকিয়ে আছে; কারও মুখে কোনো কথা নেই, যেন সবাই পাথর হয়ে গেছে।

'কী হয়েছে তোমাদের?'– রাবেয়া তার পিতামাতা ও ঘরের অন্যান্যদের উদ্দেশ করে জিজ্ঞেস করল– 'তোমরা কেউ কথা বলছ না কেন? আমি বেঁচে আছি; বরং আগের চেয়ে বেশি জীবিত আছি।'

'তুমি কি সত্যিই বেঁচে আছ রোজি?' রাবেয়ার মা নিজের বাহুদুটা প্রসারিত করে এগুতে-এগুতে জিজ্ঞেস করল।

'না মা!'– রাবেয়া বলল– 'রোজি মরে গেছে। আমি এখন রাবেয়া। আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমার স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আমি ভেতরে নিয়ে আসি।'

রাবেয়ার মায়ের ছড়ানো বাহুদুটা নিথর হয়ে নিচে নেমে গেল। রোজির ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তার কাছে খুবই খারাপ ঠেকল। রাবেয়া অল্প বয়সের মেয়ে। মুখের চেহারা দেখে কারও মনের ভাব আন্দাজ করার মতো অভিজ্ঞতা এখনও তার অর্জিত হয়নি। এসেছে সে আবেগের আতিশয্য নিয়ে এবং ছিল বেশ উৎফুল্ল। মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন না করেই সে দৌড়ে বাইরে চলে গেল এবং উয়াইসকে বাহুতে ধরে ভিতরে নিয়ে এল। উয়াইস মনে করল, ওর পিতামাতা ওকে অনুমতি দিয়েছে নিশ্চয়।

উয়াইস ভিতরে ঢুকে রাবেয়ার পিতার সামনে পড়ল। তার সঙ্গে করমর্দন করতে উয়াইস হাতদুটা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু রাবেয়ার পিতা নিজের ডান হাতটা এগিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে পিছনে সরিয়ে নিল। রাবেয়ার মা উয়াইসের প্রতি তাচ্ছিল্যের চোখে তাকাল এবং মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। রাবেয়ার বড় এক ভাই-ভাবীও ঘরে ছিল। তারাও উয়াইসের সঙ্গে অবজ্ঞাসুলভ আচরণ দেখাল।

'দেখেছ তো রাবেয়া!'– উয়াইস বলল– 'আমি যা বলেছি, তা-ই তো ঘটল। এদের বলো, আমি তোমাকে কোথায় পেয়েছিলাম এবং কীভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে বের করে এনেছি। এদের মাঝে এতটুকু নৈতিকতাবোধও নেই যে, জামাতার সঙ্গে জামাতাসুলভ আচরণ করবে।

'আমরা তোমাকে আমাদের জামাতা বানাইনি'– রাবেয়ার পিতা বলল– 'তুমি নিজেও পথভ্রষ্ট হয়েছ, আমাদের মেয়েটাকেও পথভ্রষ্ট বানিয়েছ। এই ঘরে আমরা তোমাকে সদাচারের অধিকার দিতে পারি না।'

রাবেয়ার মুখটা রাগে-অনুশোচনায় লাল হয়ে গেল। উয়াইস তাকে বলল, তুমি বলো, মানুষ তোমাকে ধোঁকায় ফেলে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল আর আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে তোমাকে কীভাবে রক্ষা করেছি।

রাবেয়া ক্ষোভকম্পিত কণ্ঠে পরিবারের লোকদের বলল, আপনারা বসুন এবং শুনুন আমার উপর দিয়ে কীরূপ ঝড় বয়ে গিয়েছিল আর আল্লাহ আকাশ থেকে আমার সাহায্যে কীভাবে তিনজন ফেরেশতা নামিয়ে দিয়েছিলেন।

সবাই বসে পড়ল। রাবেয়া উয়াইসকে নিজের পাশে বসিয়ে নিল এবং কাহিনী শোনাতে শুরু করল। ঘটনার বিবরণ শুনে-শুনে ধীরে-ধীরে তাদের অবস্থা স্বাভাবিক হতে লাগল। শেষে রাবেয়া বলল, আমি এতই অসহায় ও অপারগ ছিলাম যে, উয়াইস ও তার সাথীরা আমার সঙ্গে যেমন খুশি আচরণ করতে পারত। কিন্তু আমার সঙ্গে তারা ফেরেশতার মতো আচরণ করল।

'আমি তাদের এই চরিত্র ও আচরণে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়েছি'– রাবেয়া বলল– 'অন্যথায় তোমার মনে আছে মা! উয়াইস যখন রবিন ছিল তখন তাকে আমি মনে-প্রাণে কামনা করতাম। কিন্তু যখনই এ মুসলমান হয়ে গেল, আমি তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলাম। আমি বলছি, যতখানি ভালো চরিত্র মুসলমানদের, ততটা আর কারও হতে পারে না। মিশর গিয়ে দেখে আসো; খ্রিস্টান রাজা হেরাকল খ্রিস্টানদের রক্ত ঝরাচ্ছেন। ওখানে একটা সমস্যার কোনোই সমাধান মিলছে না যে, সত্য ও সঠিক খ্রিস্টবাদ কোনটি; সম্রাট হেরাকল-এরটি, নাকি তার প্রজাদেরটি।'

রাবেয়া অনর্গল বলেই চলল। উয়াইস নীরব বসে আছে। পরিবারের সদস্যরা চুপচাপ শুনতে থাকল।

'আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসিনি'– রাবেয়া বলল– 'আমি বলছি কী; আপনারা সবাই ইসলাম কবুল করে নিন।'

'তুমি কোন মুসলমানদের কথা বলছ?'– রাবেয়ার পিতা বলল– 'সেই মুসলমান অপর কেউ ছিল, যাদের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করত। ইসলাম মদপান তেমন হারাম করেছে, যেমন হারাম শূকর। আমি জানি, মুসলমান মদের ঘ্রাণ থেকেও দূরে পালিয়ে যায়। কিন্তু এখানকার কিছু মুসলমান মদপান শুরু করে দিয়েছে এবং তারা মদপানকে হালাল মনে করছে।'

'আমি মানি না'– এবার উয়াইস মুখ খুলল– 'আপনি বোধহয় বলতে চাচ্ছেন, আমি আর আপনার কন্যা ইসলাম গ্রহণ করে ভালো করিনি। মুসলমানদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ থেকে আপনি বিরত থাকুন।'

'এটা অপবাদ নয়'– রাবেয়ার পিতা বলল– 'এমন মুসলমান আমি তোমাকে দেখাতে পারব এবং দেখাবও।'

'এ তাদের ব্যক্তিগত কর্ম'– উয়াইস বলল– 'ইসলাম কিংবা খলীফা অথবা জাতিগতভাবে মুসলমান তাদের মদপানের অনুমতি দেয়নি। না ইসলাম মদপানকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে।'

'কটা দিন গেলেই তুমি এসব বুঝতে পারবে'– রাবেয়ার পিতা বলল– 'সেই মদ্যপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাদের দেখাদেখি অন্য মুসলমানরাও মদপান শুরু করবে। মদের নেশা বিবেকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তারপর মানুষ অন্যান্য পাপের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। এই জাতিটা যদি মদপানে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তাদের সেই সদাচার, সেই মহৎ চরিত্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অমুসলিমরা ইসলাম কবুল করছে।'

উয়াইসের সঙ্গে রাবেয়াও বিরক্ত হতে শুরু করেছে যে, তার পিতা ইসলামের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করছে এবং মুসলমানদের বদনাম করছে। রাবেয়া তার পিতার ব্যাপারে জানত, লোকটা নিজের ধর্মের ব্যাপারে খুবই কট্টর। বরং খ্রিস্টবাদ তার মন-মস্তিষ্কের উপর উন্মাদনার মতো ঝেঁকে বসেছিল। তাই সে ভালো মনে করল, পিতার ইসলামের দুর্নাম রটানোর ধারা এখানেই থামিয়ে দেবে। তাই পিতাকে বলল, আমি ভবিষ্যতেও উয়াইসকে সঙ্গে করে আসতে চাই; তাতে আপনার অনুমতি আছে কি?

'না'– রাবেয়ার পিতা সঙ্গে-সঙ্গে সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল– 'তোমাদের দুজনের জন্যই আমার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে যদি দুজনে খ্রিস্টধর্মে ফিরে আস, তাহলে তোমাদের জন্য আমি শুধু ঘরের দরজা-ই নয়– হৃদয়-আত্মার দ্বারও উন্মুক্ত করে দেব।'

'এখন আর আমরা ভুল দরজায় প্রবেশ করব না'– উয়াইস বলল এবং বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। রাবেয়াকেও দাঁড় করাল। বলল, চলো রাবেয়া! আমি নিজের অপমান-অবমাননা সহ্য করতে পারব; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের সামান্য দুর্নামও আমি বরদাশত করতে পারব না। এখানকার আরও কয়েকজন খ্রিস্টানকে আমি মুসলমান বানাব।'

'বোধহয় তুমি তা পারবে না'– রাবেয়ার বড় ভাই যে কিনা এতক্ষণ নীরব ছিল বলল– 'ওকে ইসলাম প্রচার থেকে ফিরিয়ে রেখো রোজি! অন্যথায়...।'

'আমি রোজি নই ভাইয়া!'– রাবেয়া বলল– 'নিজের ধর্মের জন্য যা ভালো মনে হবে, ইনি করবেন। আমি একে ঠেকাতে যাব না।'

উয়াইস ও রাবেয়া ওখান থেকে বেরিয়ে এল। দরজা দিয়ে বের হওয়া অবধি রাবেয়ার ভাই দুজনের পানে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে তাকল।

* * *

উয়াইস অনেক বড় বীর মুজাহিদ। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী গোয়েন্দা। কিন্তু সে রাবেয়ার ভাইয়ের মুখের কথা ও চোখের দৃষ্টির অর্থ বুঝতে সক্ষম হলো না। ছেলেটা উয়াইসকে গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল, 'বোধহয় তুমি তা পারবে না'। কিন্তু তার এই গাম্ভির্যের মাঝে একটা ঝড় লুকায়িত ছিল, যাকে উয়াইস দেখতে পায়নি, অনুভবও করতে পারেনি। ঘর থেকে বের হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে রাবেয়াকে বলল, ভবিষ্যতে কখনও যেন আমাকে এখানে না আন।

'আনব না উয়াইস!'– রাবেয়া বলল– 'ভাবিনি, আমার পিতামাতা আমাকে এভাবে তাড়িয়ে দেবেন। একটা কথা মনে রেখো উয়াইস! আমার পিতা ধার্মিক মানুষ; কিন্তু ভাইটা ভালো মানুষ নয়।'

'ও আমার কী ক্ষতি করতে পারবে!'– উয়াইস বলল– 'ওর সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই। রাখার দরকারও নেই।'

রাবেয়া বলেছিল, ভাইটা আমার ভালো নয়। কিন্তু সে কতখানি খারাপ মানুষ, তার মাঝে কী-কী দোষ আছে, তা অনুমান করা উয়াইসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ছেলেটা মুসলমানদের জানি দুশমন। রোমান বাহিনীতে অস্থায়ীরূপে যোগদান করে এক-দুবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। কিন্তু রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে মুসলমানদের পরাজিত করা যাবে না বুঝে সে বাহিনী থেকে সরে এল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্ডারগ্রাউন্ড ও নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। সমমনা তিন-চারজন বন্ধুকেও সে দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ করতে পারেনি। ইসলামবিরোধী প্রচারাভিযানও সে শুরু করেছিল; কিন্তু সফল হতে পারেনি।

আরও তথ্য হলো, ইসলামবিদ্বেষ ছাড়া নিজের ধর্মের সঙ্গে তার তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। বিয়ের অনেক আগে তরুণ বয়সে একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভালভাসা ছিল এবং মেয়েটার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাবেয়া ও শারিনা যেভাবে কোনো একজন মুসলমানের চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেছে, তেমনি এই মেয়েটাও একজন আরব মুজাহিদ দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হলো যে, ইসলাম গ্রহণ করে রাবেয়ার ভাইকে প্রত্যাখ্যান করে উক্ত মুজাহিদের জীবনসঙ্গিনী হয়ে গেল।

এখন তারই এক সহোদরা ইসলাম গ্রহণ করে একজন নওমুসলিমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে তার নিজের সেই প্রেমকাহিনী মনে পড়ে গেল এবং সেইসঙ্গে অত্যন্ত ভয়ানক একটা চিন্তা ও পরিকল্পনা তার অন্তরে উদিত হলো। উয়াইস ও রাবেয়ার চলে যাওয়ার পর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং দু-তিনজন বন্ধুকে ডেকে সমবেত করল। তাদেরকে উয়াইস ও রাবেয়ার কাহিনী শোনাল এবং বলল, উয়াইস বলছে, ও নাকি আমাদের এই মহল্লায় ইসলামের তাবলীগ করবে।

'আমরা তাকে কীভাবে ঠেকাতে পারি?' একবন্ধু জিজ্ঞেস করল।

'হত্যা'– রাবেয়ার ভাই ঝটপট উত্তর দিল– 'আজ অবধি আমরা এমন কোনো কাজ করতে পরিনি, যার দ্বারা ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করা যায়। এ-যাবত আমরা কথা-ই বললাম শুধু– কাজের কাজ কিছুই করলাম না। এবার কাজ একটা করতে চাই এবং করবই।

বন্ধুরা উয়াইস-হত্যার চিন্তার সঙ্গে একমত হয়ে গেল। তারপর মিশন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ঠিক করতে মতবিনিময় করল। অনেক ভেবে-চিন্তে পন্থা একটা ঠিক করল। সিদ্ধান্ত নিল, একজন টোপ দিয়ে উয়াইসকে স্পটে নিয়ে আসবে। কাজটা কে করবে, তাও তারা ঠিক করে নিল।

চার-পাঁচদিন কেটে গেল। উয়াইসকে ফাঁদে আনা গেল না। কারণ, সে নিজের কাজকর্ম নিয়ে বেজায় ব্যস্ত। কিন্তু রাবেয়ার ভাই হাল ছাড়তে রাজি নয়। উয়াইসকে হত্যা করেই তবে ক্ষান্ত হবে সে।

* * *

উয়াইসকে টোপ দিয়ে স্পটে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, অবশেষে একদিন সে উয়াইসকে পেয়ে গেল। হত্যার পরিকল্পনাটা তারা ঠিক করেছিল চমৎকার। উয়াইস বলেছিল, আমি ইসলামের তাবলীগ করব। রাবেয়ার ভাই একেই কৌশল হিসেবে বরণ করে নিল। লোকটা উয়াইসকে বলল, দু-তিনজন খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু আগে তারা ইসলাম সম্পর্কে জানা ও বোঝা জরুরি মনে করছে। সে বলল, আমি সেই দলের একজন। আমিও মুসলমান হয়ে যাব।

সন্ধ্যার পরে উয়াইস সেই লোকটার সঙ্গে সেই জায়গাটায় যেতে রওনা হলো, যেখানে তাকে হত্যা করে লাশ গুম করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের এমন ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে যে, সে ভাববারই প্রয়োজন মনে করল না, এটা প্রতারণাও হতে পারে।

লোকটার সঙ্গে উয়াইস নগরীর বাইরে চলে এল। তাকে বলা হয়েছিল, ওরা নগরীর বাইরে একস্থানে অপেক্ষা করবে। ওখানে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে হবে।

ঘাতকদলের পরিকল্পনাটা হলো, এই লোকটা উয়াইসকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাবে। রাবেয়ার ভাই তার অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে ওখানে আগে থেকেই উপস্থিত থাকবে এবং কোনো কথাবার্তা ছাড়াই ঝটপট কাজটা সমাধা করে ফেলা হবে।

উয়াইস সেখানে গিয়ে পৌছল, যেখানে তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওখানে কোনো মানুষ নেই। লোকটা বলল, একটু অপেক্ষা করুন; ওরা এখনই এসে পড়বে। দুজন বসে পড়ল এবং অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু অনেক সময় চলে গেল; কিন্তু কেউ এল না। লোকটা অস্থিরচিত্তে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল। অবশেষে উয়াইস বলল, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। যদি প্রয়োজন মনে কর, তাহলে কাল আমার ওখানে চলে এসো। প্রয়োজনে আমি আমার চেয়েও বিজ্ঞ কোনো মুসলমান দ্বারা কথা বলিয়ে দেব।

ঘাতকদলের এই লোকটা একা তো আর কিছু করতে পারে না। তাকে বলাও হয়নি, যদি আমরা কেউ না আসি, তাহলে নিজেই কাজ সেরে ফেলো। সে উয়াইসকে কথায় জুড়িয়ে রাখল। কিন্তু তারপরও কারও কোনো দেখা নেই। এবার সে নিজেই অনুভব করল, আর অপেক্ষা করা বৃথা।

দুজন ওখান থেকে ফিরে এল এবং উয়াইস আপন ঠিকানায় চলে এল।

'ভাইজান গুরুতর অসুখে পড়ে গেছেন'– রাবেয়া উয়াইসকে বলল– 'খানিক আগে তার এক প্রতিবেশী মহিলা এদিক দিয়ে গেল। আমি তোমার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। মহিলা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, তোমার ভাই তো মারাত্মক অসুখে পড়েছে। কোনো ডাক্তারই তার রোগটা ধরতে পারছে না। দু-তিন দিনেই তার অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌছে গেছে। হতে পারে, আজ রাতই তার জীবনের শেষ রাত হবে...। আমি বুঝতে পারছি না, তাকে দেখতে যাব কি যাব না।'

'যদি যেতে চাও, আমি তোমাকে বারণ করব না'– 'আমাকে যদি সঙ্গে নিতে চাও, তাহলে আমিও যাব।'

রাবেয়াকে পিতামাতার ঘর থেকে তাড়িয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যা কিছুই ঘটুক ভাই-বোনের সম্পর্ক বলে কথা।

ভাইয়ের অসুখের খবর শুনে বোন স্থির থাকতে পারল না। রাবেয়া তখনই উয়াইসকে সঙ্গে করে ভাইকে দেখতে রওনা হয়ে গেল। তাদের ঘরে ঢুকতে কেউ বাধা দিল না। সম্ভবত এ কারণে যে, তার ভাইয়ের তখন একেবারে শেষ অবস্থা। ভাইয়ের স্ত্রী তার পিতামাতা বসে-বসে কাঁদছে।

রাবেয়ার ভাই চোখ তুলে রাবেয়ার আগে উয়াইসের পানে তাকাল আবার চোখদুটো বন্ধ করে ফেলল। পরক্ষণে আবারও সে চোখ মেলল এবং একটি হেঁচকি তুলল। তারপর তার মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল।

রাবেয়ার মরে গেল।

উয়াইসের জানা ছিল না, এই লোকটা তাকে হত্যা করার জন্য ফাঁদ পেতেছিল এবং সেই ফাঁদে সে চলেও গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর লীলা বোঝার সাধ্য আল্লাহর কোনো বান্দার নেই। রাবেয়ার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। পিতামাতা তার প্রতি চোখ তুলে তাকালও না। তাদের বিবাহিত যুবক পুত্র মৃত্যুবরণ করেছে।

উয়াইস রাবেয়াকে নিয়ে ফিরে এল।

পরদিনই খবর পাওয়া গেল, রাবেয়ার ভাইয়ের এক বন্ধু, যে উয়াইস-হত্যায় তার সহযোগী ছিল একই রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং পরদিন তারও মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই তার সেই বন্ধুটাও একই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল, যে উয়াইসকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করতে স্পটে নিয়ে গিয়েছিল।

* * *

মহান আল্লাহ উয়াইসকে স্পষ্টতই খুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। কিন্তু উয়াইস ঘুণাক্ষরেও জানল না, যারা মারা গেল, তারা তাকে মারার ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। কিন্তু এই রোগ শুধু এই তিন বন্ধুর জন্যই আসেনি; বরং ব্যাধিটা গোটা হালব নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। ঘর-ঘর থেকে জানাযা বেরুতে লাগল। ডাক্তারগণ জানালেন, এটা একটা মহামারি। এই দুরারোগ্য ব্যাধিটা যার উপর আক্রমণ চালাত, সে দুদিনের মধ্যেই মারা যেত। ডাক্তারগণ অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু রোগটা বিস্তৃত হয়েই চলল এবং গোটা শাম রাজ্যকে গ্রাস করে ফেলল।

ইতিহাসে এই ব্যাধিটার ব্যাপারে যে-বিবরণ এসেছে, তার দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, এর সূচনা হয়েছিল ফিলিস্তিনের আমওয়াস নাম এক অঞ্চল থেকে। এ জাতীয় রোগ-ব্যাধিতে কীরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, সেযুগের মানুষের সেই অভিজ্ঞতা ছিল না। একটা রোগ যে দাবানলের মতো গোটা দেশে ছড়িয়ে যেতে পারে, তাও তাদের অজানা ছিল। এই অজ্ঞতারই ফলে আমওয়াস থেকে যাত্রা করা এই ব্যাধিটা দেখতে-না-দেখতে শাম পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং মৃত্যু প্রতিটি ঘরের কড়া নাড়তে শুরু করল।

রোগটা মহামারি ছিল। কিন্তু সেযুগের মানুষ তাকে 'আমওয়াস' নাম দিয়েছিল। কোনো-কোনো ঐতিহাসিকও রোগটার এ নামই দিয়েছেন।

দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া এখনও পুরোপুরি দূর হয়নি; এরই মধ্যে এই মহামারি দুর্ভিক্ষের ধ্বংসকারিতাকেও হার মানিয়ে দিল। এই মহামারিও ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৮ হিজরিতে দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ পড়েছিল আরবে আর মহামারির বিস্তার ঘটেছিল শামে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া আরব পর্যন্ত পৌঁছে গেল। খেলাফতের মসনদ কেঁপে উঠল। মহামারি শুধু সাধারণ নাগরিকদের মাঝেই নয়– মুসলিম সৈনিকদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

শামের এই দুর্যোগের খবর হেরাকল-এর কানে পৌঁছে গেল। শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং উপদেষ্টাদের বললেন, মুসলমানদের পরাজিত করার এটিই মোক্ষম সুযোগ। চাটুকার উপদেষ্টারা তাতে সায় দিল। বিষয়টা হেরাকল-এর দরবারি প্রধান পাদরির কানে গেলে সে সম্রাটের কাছে ছুটে গেল।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)ও শঙ্কা অনুভব করেছিলেন, এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রোমান বাহিনী যদি আক্রমণ করে বসে, তাহলে এই হামলা বোধ করা যাবে না। বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য এই মহামারিতে প্রাণ হারিয়েছেন। কয়েকজন সেনাপতিও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন।

'শাহেনশাহে রোম!'– কায়রাস বলল– 'জানতে পেরেছি, আপনি শামে সেনা-অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছেন এবং উপদেষ্টাগণও আমার এই পরিকল্পনায় সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছেন, মুসলমানদের শাম থেকে বিতাড়িত করার এর চেয়ে ভালো সময় পরে আর পাওয়া যাবে না।'

'হ্যাঁ প্রধান বিশপ!'– সম্রাট হেরাকল প্রত্যয়দীপ্ত কণ্ঠে বললেন– 'শুধু শামই নয়– গোটা আরবকে আমি আমার সাম্রাজ্যে শামিল করে নেব। দেখছ না, দুর্ভিক্ষ থেকে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই এই দুর্যোগ এসে তাদের উপর আক্রমণ করে বসেছে! আমার জন্য এ একটি সুসংবাদই বটে।'

'আমি যদি আপনার ক্ষতির আশঙ্কা না করতাম, তাহলে আমিও আপনাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতাম'– কায়রাস্ বলল– 'কিন্তু আপনি আমার রাজা ও হিতৈষী এবং রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক বিরাজমান। আপনাকে আমি সেই পথে হাঁটতে বারণ করব, যার গন্তব্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। একটি বাস্তবতা আপনাকে ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য আরবদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। অবশিষ্ট যারা জীবন রক্ষা করে মিশর এসেছে, তাদের উপর আরব মুসলমানদের ভীতি ছেয়ে আছে। এই বাহিনীটাকে যদি আপনি মহামারি দ্বারা খুন করতে চান, তাহলে শামের উপর আক্রমণ চালান। এতটুকু ব্যাপারও কি আপনি বুঝতে পারছেন না, মুসলিম সৈন্যরা পর্যন্ত যে মহামারির কবলে এসে পড়েছে, সেই ব্যাধি আমাদের বাহিনীকেও ক্ষমা করবে না? গতকাল পর্যন্ত আমি

যেসব খবরাখবর পেয়েছি, তাতে জানতে পেরেছি, মুসলমানদের কয়েকজন সালারও এই রোগে মারা গেছেন।'

সম্রাট হেরাকল বিষয়টা ঝুঝে ফেললেন। তিনি শাম আক্রমণের চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিলেন।

* * *

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) মহামারির সংবাদ পাওয়ার আগেই শাম সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এরই মধ্যে তাঁর কাছে মহামারির খবরাখবর আসতে লাগল। কিন্তু তিনি তেমন বিচলিত হলেন না। বরং যাওয়াই ভালো মনে করলেন, যাতে ওখানকার পরিস্থিতি নিজচোখে দেখে মহামারির প্রতিরোধে যতখানি সম্ভব ব্যবস্থা নিতে পারেন। ফলে তিনি অনতিবিলম্বে রওনা হওয়ার আদেশ জারি করলেন এবং কাফেলা শাম অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাফেলা তাবুক পৌঁছে গেল। সেখানে তিনি যাত্রাবিরতি দিলেন। শামের বিভিন্ন অঞ্চলের সালারদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমীরুল মুমিনীন শাম সফরে আসছেন। কিন্তু প্রত্যেক সালারই চিন্তা করলেন, এই পরিস্থিতিতে আমীরুল মুমিনীনের শামের মাটিতে পা রাখা ঠিক হবে না। ফলে সিপাহাসাল আবু উবায়দা (রাযি.), সালার ইয়াযিদ ইবনে আবী সুফিয়ান ও সালার শুরাহবিল ইবনে হাসানা তাবুক চলে এলেন। তাঁরা হযরত ওমর (রাযি.)কে সানুনয় নিবেদন জানালেন, আপনি এর আগে আর যাবেন না। কারণ, শামের মাটি ও বাতাসে মহামারির জীবাণু আর মৃত্যু ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তাঁরা আমীরুল মুমিনীনকে মহামারির তীব্রতা ও ধ্বংসকারিতার বিস্তারিত বিবরণ শোনালেন।

'এখানে থেমে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়'– হযরত ওমর বললেন– 'আমি যদি এখান থেকে মদিনা ফিরে যাই, তাহলে সেই লোকগুলোর আত্মার সামনে আমাকে লজ্জিত হতে হবে, এই ব্যাধি যাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আমার জাতিকে এমন ভয়ানক পরিস্থিতিতে ফেলে রেখে আমি কীভাবে ফিরে যেতে পারি।'

সালারগণ তাঁকে মানাতে চেষ্টা করলেন, আপনি আর সামনে যাবেন না। তাঁর যুক্তি দেখালেন, এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যদি আমীরুল মুমিনীনের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে আরেকটি সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত ওমর তারপরও মানলেন না এবং সবার থেকে পরামর্শ চাইলেন। তাঁদের মধ্যে সালারদের ব্যতীত কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবাও ছিলেন। তাঁদের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল।

আমীরুল মুমিনীন!'– একদল পরামর্শ দিলেন– 'আপনি যেহেতু মানবতার কল্যাণে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যাচ্ছেন, সেহেতু আপনার ভাবা উচিত নয়, সামনে কী-কী বিপদ আছে।'

'না আমীরুল মুমিনীন!'– আরেকদল অভিমত ব্যক্ত করলেন– 'যেখানে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই, সেখানে অন্তত আমীরুল মুমিনীনের যাওয়া উচিত নয়। আল্লাহপাক বিবেক তো এজন্যই দিয়েছেন যে, তোমরা বুঝে-শুনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করো।'

শেষে হযরত ওমর কুরাইশের সেসব সাহাবাকে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠালেন, যাঁরা সেসময়ে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন এবং যাঁরা মক্কাজয়ের অভিযানেও শরিক ছিলেন। বিষয়টি তিনি তাঁদের সামনে উপস্থাপন করলেন। তাঁদের মাঝে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.)ও ছিলেন। তাঁরা একমত হলেন যে, আমীরুল মুমিনীন তাবুক অতিক্রম করে আর সম্মুখে অগ্রসর হবেন না এবং তিনি কাফেলার সব কজন সদস্যকে নিয়ে মদিনা ফিরে যাবেন।

হযরত ওমর (রাযি.) তখনই আদেশ জারি করলেন, কাল সকালে আমরা মদিনার উদ্দেশে রওনা হব।

প্রায় সকল ঐতিহাসিক আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ও হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)-এর একটি সংলাপ উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসে এসেছে, হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) আমীরুল মুমিনীনের তাবুক অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু আমীরুল মুমিনীন যখন মদিনা ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, তখন কেন যেন হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)-এর অভিমত দোদুল্যমান হয়ে গেল।

'ইবনে খাত্তাব!'– হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)কে যারপরনাই অকৃত্রিম ভাষায় বললেন– 'আপনি আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে পলায়ন করছেন-না?'

প্রশ্ন শুনে হযরত ওমর (রায.)-এর মুখের রং বদলে গেল এবং পরম বিস্ময়ের মাঝে বেশ কিছু সময় হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)-এর পানে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

'ইবনুল জাররাহ!'– হযরত ওমর (রাযি.) উত্তর দিলেন– 'আহ! কথাটা যদি অন্য কেউ বলত!' হ্যাঁ; আমি আল্লাহর এক সিদ্ধান্ত থেকে আরেক সিদ্ধান্তে দিকে পলায়ন করছি।'

হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) আর কোনো কথা বললেন না। ঠিক ওই সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযি.) ওখানে এসে হাজির হলেন। তিনি প্রবীণ সাহাবি ছিলেন। এখানকার সমস্যার কথা শুনে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন।

বললেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোমরা বাইরে থেকে মহামারি উপদ্রুত অঞ্চলে যেয়ো না আর কবলিত অঞ্চল থেকেও পলায়ন করো না। কারণ, তখন এই মহামারি তোমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এবং অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বাণী শুনে এবার হযরত ওমর পুরোপুরি আশ্বস্ত হলেন এবং তাবুক থেকে মদিনা ফিরে গেলেন।

কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের স্বস্তিতে বসে থাকার সুযোগ নেই। শামের মানুষদের ভাবনা প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করল, কীভাবে লোকগুলোকে মহামারির কবল থেকে উদ্ধার করা যায়। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, তাঁর সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)-এর জন্য। কারণ, তিনি অনেক দামি সিপাহসালার ছিলেন। হযরত ওমর তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছিলেন। এক বর্ণনায় একথাও আছে যে, হযরত ওমর (রাযি.) আবু উবায়দা (রাযি.)কে বলেছিলেন, আপনি আমার সাথে মদিনা চলুন। কিন্তু এই মহান সেনাপতি উত্তর দিলেন, সাথীদেরকে মৃত্যুর ছায়ায় রেখে আমি যাব না। তারপর তিনিও সেই কথাটিই বললেন, যেটি হযরত ওমর বলেছিলেন– 'আমি আল্লাহর সিদ্ধান্ত থেকে পলায়ন করব না।'

মদিনা ফিরে এসে হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)কে মহামারি থেকে বাঁচাতে একটি বুদ্ধি ঠিক করলেন। তিনি একটি বার্তা লিখে একজন দ্রুতগামী দূত তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'জরুরি এক কাজে আপনার সঙ্গে আমার মুখোমুখি আলোচনা প্রয়োজন। কাজেই পত্রখানা পাওয়ামাত্র চলে আসুন।'

উত্তরে হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) লিখলেন, 'যে-বিষয়ে আমার সঙ্গে আপনার আলাপের প্রয়োজন, সেটি মুলতবি হতে পারে; কিন্তু এখানকার ইসলামি বাহিনীর সিপাহসালার ও সৈনিকদের এত বড় দুর্যোগের মধ্যে ফেলে রেখে আমি যেতে পারি না। আমি আমার সাথীদের ফেলে যাব না এবং আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করব।'

বার্তার জবাব হাতে এলে হযরত ওমর আবেগে এতটা-ই আপ্লুত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। সে-সময়ে ওখানে যাঁরা উপবিষ্ট ছিলেন, তাদের একজন ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মুমিনীন! আবু উবায়দা মারা যাননি তো আবার? হযরত ওমর (রাযি.) কান্নাজড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'না; তবে মনে হচ্ছে, তিনি মরেই যাবেন!'

আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)-এর পত্রখানা উপস্থিত সবাইকে পড়তে দিলেন। তারপর ভেবে-চিন্তে তাঁর নামে আরেকখানা বার্তা লেখালেন। তাতে লেখালেন, 'আবু উবায়দা! আপনি নিচু এলাকা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু ও স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে যান এবং বাহিনীকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান।'

হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর এই আদেশ বা পরামর্শ বাস্তবায়নের চিন্তা মাথায় নিলেন। এমনি সময়ে মহামারি তাঁকেও গ্রাস করে নিল এবং তৃতীয় দিন মৃত্যু বরণ করলেন। আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.)কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে দিলেন। ওখানে মৃত্যুর অবস্থা ছিল, মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.)-এর দুই পুত্র ইতিমধ্যেই মহামারির বলিতে পরিণত হয়ে গেছে। দিনকতক পর তিনি নিজেও মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে তিনি হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.)কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যান।

আমর ইবনে আস (রাযি.) মুসলিম বাহিনীর সৈন্যদের এবং সাধারণ নাগরিকদেরও আদেশ জারি করলেন, তোমরা খোলা মাঠ ছেড়ে পাহাড়ে চলে যাও। তার পর থেকে মহামারির প্রকোপ কমতে শুরু করল এবং কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল।

এই মহামারি বেশ কিছু দিন যাবত মানুষের জীনন নিয়ে খেলা করতে থাকল এবং পঁচিশ হাজার মুসলমানের প্রাণ হরণ করেই তবে ক্ষান্ত হলো। যেকজন সালার মারা গেলেন, তাদের মাঝে হযরত আবু উবায়দা, মু'আয ইবনে জাবাল, ইয়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ান, হারিছ ইবনে হিশাম, সুহাইল ইবনে আমার ও উতবা ইবনে সুহাইল (রাযি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হারিছ ইবনে হিশামের বংশের ৭০ ব্যক্তি এবং হযরত খালিদ ইবনে অলীদের বংশের ৪০ ব্যক্তি এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

* * *

বর্তমান কালের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকেল মিশরি কয়েকজন ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, এই মহামারি এমনিতেই আসেনি। বরং মহান আল্লাহ মুসলমানদের সতর্ক করতেই তাদের উপর এই বিপদ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। জনাব হাইকেল একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, ওই অঞ্চলগুলোতে অনেক দীর্ঘ লড়াই সংঘটিত হয়েছিল, যা কিনা ছিল খুবই রক্তক্ষয়ী। রোমান বাহিনীর অগুণতি লাশ সমগ্র অঞ্চলে পড়েছিল এবং সেগুলো পচে গলে যাচ্ছিল। এই পচা-গলা মরদেহগুলো বাতাসে ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তারই ফলে এই মহামারির উদ্ভব ঘটেছিল।

কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ এই বিশ্লেষণ মানতে রাজি নন। তারা বলছেন, শাম থেকে নয়– ফিলিস্তিনের এক নগরী আমওয়াস থেকে এই মহামারির সূত্রপাত হয়েছিল এবং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একটা গজব ছিল।

এই উপাখ্যানে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, রাবেয়ার পিতা উয়াইস ও রাবেয়াকে বলেছিল, শামে কিছু মুসলমান নিজেদের জন্য মদ হালাল করে নিয়েছে এবং তারা প্রকাশ্যে মদপান করছে। রাবেয়া বলেছিল, এই অভিযোগ সত্য নয় এবং আব্বাজান একথা বলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছেন এবং এটা ইসলামের প্রতি তার ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, রাবেয়ার পিতা কোনো অবাস্তব বা অসত্য কথা বলে মুসলমানদের দুর্নাম করেনি; বরং সে যা বলেছিল,সবই সত্য ও বাস্তব।

তারা লিখেছেন, শাম যখন ইসলামি সালতানাতে যুক্ত হয়ে গেল, তখন আরবের কয়েকটি বংশ শামের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বসতি গড়েছিল। ওখানকার খ্রিস্টান নাগরিকরা মুসলমানদের অনুগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা মন থেকে মুসলমানদের বরণ করে নেয়নি। কতিপয় বিচক্ষণ খ্রিস্টান মুসলমানদের নৈতকতা ধ্বংস করার মিশন নিয়ে মাঠে নামে। তারা কিছু মুসলমানকে মদপানে অভ্যস্ত করে তোলে। আর নিশ্চিত করেই বলা যায়, এই অপকর্মটা তারা তাদের সুন্দরী ও যুবতী মেয়েদের দ্বারা করিয়ে থাকবে।

অপরাপর মুসলমানরা এই মুসলমানদের সতর্ক করল এবং মদপান করতে বারণ করল। কিন্তু মদপায়ী মুসলমানরা কুরআন দ্বারা দলিল উপস্থানের চেষ্টা করল যে, কুরআন বলেছে, 'তোমরা কি এসব থেকে বিরত হবে না?' তারা এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিল, এখানে আল্লাহপাক বিষয়টি বান্দার উপর ছেড়ে দিয়েছেন যে, মদকে হারাম বা হালাল মনে করা এ তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার।

তারা আরও যুক্তি দেখাল, আল্লাহর রাসূল ও প্রথম খলীফার আমলে মদ্যপদের কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি।

মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকেল, আরও কয়েকটি সূত্রে লিখেছেন, সিপাহসালার আবু উবায়দা (রাযি.)-এর কাছে যখন রিপোর্ট এল, কিছু মুসলমান মদ পান করতে শুরু করেছে, তখন তিনি বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাই করলেন। তদন্তে প্রমাণিত হলো, অভিযোগ পুরোপুরি সত্য। মদ্যপ মুসলমানরা তাঁর সামনেও প্রমাণ উপস্থাপন করল যে, কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি। হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) পুরো বিষয়টি লিখে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং সিদ্ধান্ত চাইলেন।

হযরত ওমর (রাযি.) ইসলামের রীতি অনুসারে পরামর্শের জন্য কয়েকজন সাহাবাকে তলব করলেন এবং বিষয়টি তাঁদের সম্মুখে উপস্থাপন করলেন। হযরত আলী (রাযি.) বললেন, যেব্যক্তি মদ পান করে, সে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খুইয়ে ফেলে। আর বুদ্ধি-বিবেক খুইয়ে একজন মদ্যপ আবোল-তাবোল বকতে শুরু

করে। আর এমন ব্যক্তি তখন যাকে-তাকে মন্দ সাব্যস্ত করে– আল্লাহকেও, আল্লাহর রাসূলকেও, কুরআনকেও।

অন্যান্য সাহাবাদের পরামর্শ শোনার পর হযরত ওমর (রাযি.) যখন হযরত আলী (রাযি.)-এর মতামত শুনলেন, তখন আর চিন্তার প্রয়োজন মনে করলেন না। অবলীলায় বলে উঠলেন, 'মদপানের শাস্তি ৮০ দোররা।'

হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)কে লিখলেন, 'মদ্যপ মুসলমানদের সামনে হাজির করুন। যদি তারা মদপানকে হালাল বলে, তাহলে মৃত্যুদণ্ড দিন। আর যদি হারাম স্বীকার করে, তাহলে ৮০টা করে বেত্রাঘাত করুন।

এই সিদ্ধান্ত হাতে পৌঁছলে হযরত আবু আবু উবায়দা (রাযি.) সব কজন মদ্যপ মুসলমানকে খুঁজে বের করালেন এবং সবাইকে সামনে হাজির করালেন। ভাবগতিকে মনে হলো, ব্যাপারটা তারা আঁচ করতে সক্ষম হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, মদ সম্পর্কে তোমাদের মতামত কী?

'মদ হারাম।' সবাই এক বাক্যে উত্তর দিল।

'ও হে মুসলমানগণ!'– হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) বললেন– 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোনো-না কোনো বিপদ নাযিল হবে। আমি তোমাদের সবাইকে ৮০ দোররা করে শাস্তি দিচ্ছি।'

তাদের সবাইকে শাস্তি দেওয়া হলো। তারপর কোনো মুসলমান মদ শুকে দেখারও সাহস করেনি।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক এই ঘটনার সূত্র ধরে ইতিহাসের পাতায় ভুল বর্ণনা সন্নিবেশিত করেছেন যে, হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) বদদু'আ দিয়েছিলেন, আল্লাহ যেন এই মুসলমানদের উপর গজব নাযিল করেন। তাদের মূল্যায়ন হলো, মহামারির আপদ হযরত আবু উবায়দা (রাযি.)-এর বদদ'আর ফল ছিল।

কিন্তু এই বর্ণনা ও মূল্যায়ন দু-ই ভুল ও বিভ্রান্তিকর। হযরত আবু উবায়দা (রাযি.) কাউকে বদদ'আ দেওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না। সর্বোপরি এমন বদদু'আ দেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, যার ফলে হাজারো নিরপরাধ মানুষের উপর গজব নেমে আসবে। শুধু এটুকু মেনে নেওয়া যায় যে, কিছু মুসলমান মদপানকে হালাল সাব্যস্ত করেছিল আর আল্লাহ তার এই মহামারির আদলে একটা তীব্র একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন যে, তোমরা সাবধান হয়ে যাও।

তিন

ইবনে সামের এখনও বিনয়ামিনের ওখানে নিষ্কর্ম বসা। ইতিমধ্যে কেটে গেছে কয়েকটা মাস। বিনয়ামিন আইনির সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন করে দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে সামের কিছু একটা করতে চাচ্ছে। কাজ-কর্ম ছাড়া এভাবে বসে থাকা তার ধাঁতে সয় না। কারণ, একে তো সে সৈনিক। দ্বিতীয়ত সে কিবতি খ্রিস্টান। খ্রিস্টবাদ তার উপর একটা উন্মাদনায় পরিণত হয়ে বিরাজ করছিল। বিনয়ামিনের গোপন সংগঠনের একজন সদস্য সে। অথচ বিনয়ামিন তাকে কোনো কাজ দিচ্ছেন না! বিনয়ামিন তাকে যুক্তি দেখাচ্ছিলেন, তুমি পলাতক সৈনিক এবং দুজন সৈনিককে হত্যা করে এসেছ আর একটা মেয়েকে অপহরণ করে এনেছ। ধরা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে।

কিন্তু মাসের-পর-পর কাজ ছাড়া সময় কাটিয়ে ইবনে সামের এখন হাঁপিয়ে উঠেছে।

বিনয়ামিন হেরাকল-এর প্রাসাদ পর্যন্ত গোয়েন্দা ছড়িয়ে রেখেছিলেন। ইবনে সামেরও মূলত তার একজন গোয়েন্দা। এখানে বলে রাখা দরকার, সম্রাট হেরাকল সেসময় মিশর ছিলেন না। ছিলেন তিনি বাজিন্তিয়ায়। মিশরে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছিলেন মুকাওকিস। মুকাওকিস ছিল মূলত হেরাকল-এর কর আদায়কারী। কার্যত মিশরের রাজা ছিলেন হেরাকল। আর সামরিক বিষয়াদি ন্যস্ত ছিল তার এক বিখ্যাত সেনাপতি আতরাবুনের হাতে। সময়টা মূলত সেনাশাসনেরই যুগ ছিল। শাম হেরাকল-এর হাতে খসে পড়েছিল এবং তিনি সচেষ্ট ছিলেন, কীভাবে রাজ্যটাকে পুনরায় কব্জায় আনা যায়। তার বেশিরভাগ মনোযোগ সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মেটানো এবং অন্যান্য সামরিক বিষয়াদিতেই নিবদ্ধ থাকত।

একদিন বিনয়ামিনের কাছে দুজন লোক এল, যারা তার গোয়েন্দা ছিল। তারা মিশরের রাজধানী এসকান্দিয়ায় বাস করত এবং দিনকতক বাজিন্তিয়ায় কাটিয়ে এসেছে।

বিনয়ামিন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ নিয়ে এসেছ?

গোয়েন্দারা উত্তর দিল, হেরাকল-এর মাথায় শাম সওয়ার হয়ে আছে এবং অনতিবিলম্বে তিনি শাম আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করছেন। আরব যখন দুর্ভিক্ষকবলিত ছিল, তখন তিনি তার উপরও আক্রমণের সংকল্প নিয়েছিলেন। কিন্তু তার উপদেষ্টারা তাকে বিরত রেখেছিল। তারা যুক্তি দেখিয়েছিল, দুর্ভিক্ষ শুধু আরবে– শামে নয়। আর মুসলমানদের বাহিনী অবস্থান করছে শামে। এমতাবস্থায় রোমানরা যদি আরবে ঢুকে পড়ে, তাহলে শাম থেকে মুসলমান সৈনিকরা রোমান বাহিনীকে ঘিরে ফেলবে এবং তার পরিণতি খুবই ভয়াবহ হবে।

গোয়েন্দারা আরও জানাল, যখন শামে মহামারি ছড়িয়ে পড়ল এবং সেখানে মৃত্যুর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখনও হেরাকল শাম আক্রমণ করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। এখানে তার উপদেষ্টারা চাটুকারিতার আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাকে শাম আক্রমণে উৎসাহ জুগিয়েছিল। তার প্রধান জাযক কায়রাস যদি তাকে বিরত না করতেন, তাহলে তিনি এতদিনে শাম আক্রমণ করেই ফেলতেন। কায়রাস তাকে পরামর্শ দিল, এই ভুল আপনি করবেন না। তিনি যুক্তি দেখালেন, আপনার বাহিনী যখন শাম প্রবেশ করবে, তখন তারাও মহামারির আওতাও চয়ে আসবে। শামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া এই রোগে আপনার বাহিনীর সৈনিকরাও প্রাণ হারাবে। শামের মহামারি তাদের রেহাই দেবে না। তখন পেছনে সরে আসা কিংবা মুসলমানদের হাতে জীবনপাত করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না। ক্ষতি ছাড়া এই অভিযান থেকে আপনি কিছুই অর্জন করতে পারবেন না। জাযক কায়রাস আরও একটা আশঙ্কা দেখালেন, আপনার বাহিনী যখন মিশর থেকে শাম চলে যাবে, তখন মিশরে কিবতি খ্রিস্টান ও অন্যান্য গোষ্ঠীর যেসব খ্রিস্টান আপনার সরকারি ধর্মের বিরোধী, তারা বিদ্রোহ করে বসবে। বাহিনীর সামান্য যেকজন সৈনিক মিশরে থাকবে, এই বিদ্রোহ দমন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সেই বিদ্রোহের পরিণতি এমন হতে পারে যে, শামও হাতে আসবে না, মিশরও হাতে থেকে বেরিয়ে যাবে।

বিনয়ামিনের গোয়েন্দারা আরও তথ্য দিল, মুকাওকিস হেরাকল ও আতরাবুনকে মতে আনতে চেষ্টা করছে, শামে খ্রিস্টানদের দ্বারা বিদ্রোহ করান এবং ওখানে নাককতাকর্মী পাঠান। মুকাওকিসের এই প্রস্তাবটা হেরাকল ও আতরাবুন আমলে নিয়েছেন এবং এর ফলাফল খতিয়ে দেখছেন। মুকাওকিসের এই পরামর্শটি তারা খুবই পছন্দ করেছেন। অবশ্য এখনও এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

সেকালে শামের বেশিরভাগ নাগরিক খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিল এবং তাদের সবগুলো গোত্র যুদ্ধবাজ ছিল। বিগত দিনে তাদের একটা গোত্র বিদ্রোহ করেছিলও। কিন্তু মুসলমানরা সেই বিদ্রোহ দমন করে ফেলেছিল।

মোটকথা, শামে খ্রিস্টানরা বিদ্রোহের পজিশনে ছিল।

কায়রাস পরিষ্কারভাবেই দেখতে পাচ্ছিল, মিশরে কিবতি খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ করছে বলে। কারণ, তাদের উপর সে কী পরিমাণ নিপীড়ন চালিয়েছিল, তা তার মনে আছে। তার একথাও জানা আছে যে, সুযোগ পেলেই খ্রিস্টানরা তার ও হেরাকল-এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে।

ইতিহাস বলছে, হেরাকল আক্রমণের চিন্তা মাথায় আনতেন বটে; কিন্তু দ্বিধায় থাকতেন। এক পা এগুলে দু-পা পিছাতেন। মহামারি যখন মুসলমানদের কুরে-কুরে খাচ্ছিল, তখন যদি হেরাকল শামের উপর চড়াও হয়ে যেতেন, তাহলে মুসলমানরা অবশ্যই বেকায়দায় পড়ে যেত। মুসলিম সৈনিকরা মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছিল এবং বাছাবাছা সেনাপতিগণও মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিলেন। কিন্তু তার বিশপ কায়রাস তাকে সাবধান করেছিল, আমাদের বাহিনী যদি শামে প্রবেশ করে, তাহলে মহামারি তাদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়বে।

* * *

সেই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সবচেয়ে দুর্বলতা ছিল, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) ও তাঁর উপদেষ্টাবর্গ প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগছিলেন। এমন একটা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর এমন একটা ধ্বংসাত্মক মহামারি! পরপর এমন দুটা বিপদের ছোবল বড়-বড় প্রতাপশালী রাজা-বাদশার হাঁটুও কাঁপিয়ে তুলতে সক্ষম ছিল। খেলাফতের নীতিনির্ধাকরা এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের ঝুঁকি বরণ করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তার অর্থ এই ছিল না যে, রোমানরা যদি চড়াও হয়ে বসে, তাহলে মুসলমানরা বসে-বসে আঙুল চুষবে। মুসলমানদের সামনে ইতিপূর্বেকার এমনি একটি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান ছিল। বেশি দিন আগের ঘটনা ছিল না। এই তো বছরকয়েক আগে যখন আল্লাহর রাসূল ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন, তার পরের ঘটনা। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাযি.) বাহিনী প্রেরণ করে একটি রণাঙ্গন খুলে বসলেন। হযরত ওমর (রাযি.) ও অপরাপর সাহাবাগণ তাতে ভিন্নমত পোষণ করলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন, উম্মত আজ শোকের সাগরে নিমজ্জিত। এই পরিস্থিতিতে নতুন রণাঙ্গন খোলা বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। হযরত আবুবকর (রাযি.) বললেন, আমরা যদি শোকের মাঝে ডুবে থাকি, তাহলে কাফেররা ধরে নেবে, মুসলমানদের কোমর ভেঙে গেছে; এখন আর তারা উঠে দাঁড়াতে পারবে না। তার পরক্ষণেই ঘটল তেমনই একটা ঘটনা। ইসলামত্যাগের এমন একটা ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, যে কিনা একটা ভয়াবহ ও দীর্ঘকালীন যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে দিল। জনাকতক নবীর আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু ইসলামের সৈনিকরা দীনের এই শত্রুদের তাদেরই রক্তের মাঝে চুবিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, আল্লাহর এই দীন আজীবন বেঁচে থাকতে এসেছে এবং মুসলমানরা

প্রয়োজন হলেই যেকোনো পরিস্থিতিতে তার জন্য নিজেদের জীবনগুলোকে কুরবান করতে থাকবে।

ঈমান যদি মজবুত হয়, অন্তরে যদি আল্লাহর দীনের ভালবাসা, ও আল্লাহর সন্তুষ্টির তামান্না থাকে, তাহলে আল্লাহ এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখান যে, বান্দা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

কাহিনীর এ পর্যায়ে এসে ইরানের কেসরার বিরুদ্ধে মুসলমানদের একটি যুদ্ধের কথা মনে পড়ছে। ইরানসম্রাটের মহাশক্তিধর সৈনিকরা তাদের এলাকাগুলোকে একের-পর-এর মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে-দিয়ে পিছপা হচ্ছিল। সেসময় ইরানের সম্রাট ছিলেন ইয়াযদাগরদ। তার বাহিনীটি খুজিস্তানে পা বসানোর চেষ্টা করছিল এবং কেসরার বড়-বড় নামকরা সেনাপতিরা ইসলামের সৈনিকদের প্লাবন প্রতিহত করতে জীবনের বাজি লাগিয়েছিল। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) ইতিহাসনির্মাতা সেনাপতি হযরত আবু মুসা আশ'আরি (রাযি.)কে উক্ত রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিলেন।

কেসরার খুবই অভিজ্ঞ ও জাঁদরেল একজন সেনাপতি ছিল হরমুজান। ইরানের রাজপরিবারের সন্তান। শক্তি ও ক্ষমতার প্রাণপুরুষ মনে করা হতো তাকে। সে ইরানের কেসরা হরমুজানের কাছে প্রস্তাব পেশ করল, খুজিস্তানের কেন্দ্রীয় শহর আহওয়াজ এবং পারস্যের একটা অংশ আমার শাসনাধীনে দিয়ে দিন। বিনিময়ে আমি মুসলমানদের এই স্রোত ঠেকিয়ে দেব তো বটেই; এখান থেকে তাদের বহু দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে দেব। হরমুজান প্রস্তাবটা সাথে-সাথে মেনে নিলেন এবং ফরমান জারি করে দিলেন, এই দুটি অঞ্চল হরমুজানকে দান করা হলো।

হরমুজান কেসরার কাছে যেসংখ্যক সৈনিক দাবি করল, তা-ই তাকে দেওয়া হলো। সংখ্যার দিক থেকে এবং অস্ত্রের দিক থেকেও এই বাহিনী সেকালের একটা ক্ষমতাধর বাহিনী ছিল। হরমুজান কাল ক্ষেপন না করে সঙ্গে-সঙ্গে এই বাহিনীটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল এবং ইরানের বৃহৎ নগরী তসতরে গিয়ে উপনীত হলেন। এটি ইরানি বাহিনীর অনেক বড় একটা ছাউনি ছিল এবং ওখানে একাধিক রাজমহলও ছিল।

হরমুজান নগরীর প্রাচীর ও দুর্গ অধিকতর মজবুত করার লক্ষ্যে মেরামত করাল এবং দুর্গ-প্রাচীরের পরিধিও বাড়িয়ে নিল। নগরীর চার পাশে পরিখাও খনন করাল। রাত-দিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে এই কাজগুলো সে অতি দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলল। তারপর নগরীর বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় লোকদের মিটিং ডাকল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করল। বলল, মুসলমানরা যে-অঞ্চলটি-ই পদানত করছে, সবার আগে সেখানকার মেয়েদের কব্জা করে নিচ্ছে।

এভাবে সে তাদের রক্ত গরম করে দিয়ে বলল, আপনারা জনতাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত করুন এবং তাদেরকে নগরীতে নিয়ে আসুন।

আল্লামা শিবলি নু'মানি ও মুহাম্মাদ হাসনাইন হাইকেল বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, দিনকতকের মধ্যেই বিরাট একদল লোক নগরীতে এসে হাজির হলো। হরমুজান তাদের উদ্দেশে জ্বালাময়ী ভাষণ দিল যে প্রতিজন লোক আগুনের মতো জ্বলে উঠল।

হরমুজানের এই আয়োজন-প্রস্তুতির খবর মুসলমানদের কাছে গোপন রইল না। সিপাহসালার আবু উবায়দা (রাযি.) সংবাদটা পেয়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জরুরি বার্তা দিয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমরের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন। বার্তায় তিনি পূর্ণ পরিস্থিতির বিবরণ উল্লেখ করে লিখলেন, এই মুহূর্তে আমার জরুরি সাহায্যের প্রয়োজন এবং খুবই তাড়াতাড়ি প্রয়োজন। হযরত ওমর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)কে– সেসময় যিনি কুফায় ছিলেন– বার্তা পাঠালেন, আপনার অর্ধেক ফৌজ নিয়ে আবু মুসার কাছে চলে যান। আরেকটি বার্তা জারীর বাজাল্লিকে লিখলেন, আপনি আপনার অর্ধেক ফৌজ নিয়ে আবু মুসার সাহায্যে চলে যান।

এই দুটি বাহিনী পৌঁছা পর্যন্ত তত দিনে হরমুজান তার দুর্গ ও নগরীর প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করে ফেলল। সহযোগী বাহিনীগুলো যথাসময়ে আবু মুসা আশ'আরির কাছে পৌঁছে গেল।

* * *

এখন হরমুজানের আছে বিশাল এক সেনাবাহিনী। বুকটা তার সাহসে টইটুম্বুর। চিন্তা করল, নগরীকে অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করার আমার দরকার কী। ফলে সে বাইরে বের হয়ে আক্রমণ করে বসল।

আবু মুসা আশ'আরি (রাযি.) ডান পার্শ্বে বারার ইবনে মালিককে রাখলেন। বাম পার্শ্বে রাখলেন বারা ইবনে আযিব (রাযি.)কে। এই দুই সেনাপতি বীরত্ব ও সাহসিকতায় বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। উভয় পক্ষ ঘোরতর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। মুসলিম সৈনিকদের সংখ্যা শত্রুবাহিনীর অর্ধেক ছিল। কিন্তু তারা হরমুজানের আক্রমণ প্রতিহত করে তার বাহিনীকে পিছনের দিকে সরিয়ে দিল।

অবশেষে হরমুজানের বাহিনীর কিছু সৈন্য তো প্রাণ হারাল; অবশিষ্টরা নগরীর খোলা ফটকে ঢুকে পড়তে শুরু করল। মুসলমানরা তাদের পিছু ছাড়ল না। হরমুজানের বীরত্বের অবস্থা ছিল, সেনানায়ক হওয়া সত্ত্বেও সে একজন সাধারণ সৈনিকের মতো

লড়াই করছিল। সবার আগে তারই দুর্গে ঢুকে পড়ার কথা ছিল। কিন্তু তা না করে সে দুর্গের ফটকে দাঁড়িয়ে রইল।

সেনাপতি বারার ইবনে মালিক ফটকের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং হরমুজানের মুখোমুখি হয়ে গেলেন। দুজনে তরবারির প্রতিযোগিতা হলো। অবশেষে হরমুজান বারারকে শহীদ করে ফেলল।

তারপর আরেক সালার মিখরাত ইবনে ছাওর এগিয়ে এলেন। হরমুজান তার পথ আটকে ফেলল। এই সালার একজন খ্যাতিমান ঘোড়সওয়ার ও অসিবিদ ছিলেন। তিনি দেখলেন, হরমুজান বারারকে হত্যা করে ফেলেছে। তার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। তিনি বীরত্বের সঙ্গে এগিয়ে গেলেন এবং হরমুজানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু হরমুজান এমনভাবে তরবারি চালনা করল যে, মিখরাত হতভম্ব হয়ে গেল। হরমুজান ইসলামের এই বীর সেনানিকেও শহীদ করে ফেলল।

হরমুজান তার অবশিষ্ট সৈনিকদের দুর্গের ভিতরে নিয়ে যেতে সফল হলো এবং নগরীর প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে গেল। ইতিহাসের ভাষ্যমতে তখন নগরীর বাইরে এক হাজারেরও অধিক লাশ পড়ে ছিল এবং মুসলমানদের হাতে ছ-হাজার ইরানি সৈন্য গ্রেফতার হয়েছিল।

তারপর হরমুজান আর বাইরে এসে লড়াই করল না। সে দুর্গবদ্ধ হয়েই লড়তে থাকল। দিনের-পর-দিন কেটে যেতে লাগল। তারপর মাসও যেতে লাগল। হরমুজান নগরীর প্রতিরক্ষাকে অজেয় বানিয়ে নিয়েছিল।

একদিন মুজাহিদরা অবরুদ্ধ নগরীর এক ইরানি নাগরিককে ধরে নিয়ে এল। লোকটা বারবার বলছিল, আমাকে মুজাহিদ বাহিনীর সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দাও; আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব। অবশেষে তাকে হযরত আবু মুসা আশ'আরি (রাযি.)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

লোকটা বলল, আমি এমন এক পথে বেরিয়ে এসেছি, যার খবর সাধারণ নাগরিকদের জানা নেই। আমি আপনাকে নগরীতে প্রবেশের পথ দেখিয়ে দিতে পারি। তার বিনিময় শুধু আমাকে এটুকু দেবেন যে, আমার বংশের একশো ব্যক্তির জীবন ক্ষমা করে দেবেন এবং আমার বংশের কোনো নারীকে আপনারা কব্জা করবেন না।

সেনাপতি আবু মুসা আশ'আরি (রাযি.) বললেন, মুসলমানদের চরিত্রই হলো, তারা কোনো নারীকে কব্জা করে না। যেসব নারী মুসলমানদের হাতে চলে আসে, তাদের সঙ্গে মুসলমানরা যে-আচরণ করে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তারপর তিনি তাকে ওয়াদা দিলেন, আমরা যদি অভিযানে সফল হই, বিজয় অর্জন করি,

তাহলে তোমার বংশের শুধু একশো ব্যক্তি নয়– তোমার গোটা বংশকে আমরা নিরাপত্তা দেব এবং তাদের সমুদয় দায়-দায়িত্বও আমরা বহন করব।

ইরানি বলল, প্রথমে আমার সঙ্গে একজন লোক পাঠান, যাকে আমি নগরী সম্পর্কে অবহিত করাব। আবু মুসা আশ'আরি (রাযি.) অত্যন্ত সাহসী ও বিচক্ষণ মুজাহিদ আসরাস ইবনে আওফ শায়বানিকে তার সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

ইরানি বলল, একে একজন দাস ও সাধারণ মানুষের বেশ পরিয়ে দিন, যাতে নগরবাসীর কেউ একে চিনতে না পারে যে, এ মুসলমান। তখনই তাকে গোলামের পোশাক পরিয়ে ছদ্মবেশ ধরিয়ে দেওয়া হলো।

ইরানি লোকটা আসরাসকে সে রাতেই সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

উক্ত অঞ্চলে কয়েকটা খাল ছিল। তসতরের এই দুর্গটা যখন নির্মিত হয়েছিল, তখনকার বাদশা তাকে এমনভাবে নির্মাণ করিয়েছিলেন যে, একটা খাল তার একদম কোল ঘেঁষে অতিক্রম করে গেছে। তার থেকে একটা শাখা বের করে এমনভাবে নগরীর তল দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো যে, কারুরই জানা ছিল না, এর নিচ দিয়ে একটা খাল প্রবহমান আছে। এই খালটা একটা সুড়ঙ্গপথে অতিক্রম করেছে। একেবারে কাছে থেকে নিরীক্ষা করে দেখলেই তবে বোঝা যেত, খালটা নগরীর তল দিয়ে অতিক্রম করেছে। নগরীর ভিতরে তার থেকে স্থানে-স্থানে ফোয়ারা বের করা হয়েছে।

* * *

আসরাস ইরানি লোকটার দিকনির্দেশনায় খানিক দূর থেকে খালে নেমে পড়ল এবং ইরানি তাকে নগরীর ভিতরে নিয়ে গেল। পরে একটা জায়গা দিয়ে দুজনে খাল থেকে বেরিয়ে এল।

ইরানি এই মুজাহিদকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ভিজা কাপড়গুলো শোকাল এবং পরে আবার তাকে গোলামের বেশ ধরিয়ে দিয়ে মাথায় একটা কম্বল ছড়িয়ে দিলে বলে দিল, এবার তুমি আমার পেছনে-পেছনে নগরীতে ঘুরে বেড়াও।

ইরানি দিনের বেলা আসরাসকে রাজপ্রাসাদ ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক জায়গাগুলো দেখাল। ফটকগুলোতে পাহারার ব্যবস্থা ছিল; তাও দেখাল। সেই প্রাচীরটার কাছেও নিয়ে গেল, যেখানে টাওয়ারগুলোতে ইরানি সৈন্যরা অবস্থানরত ছিল। তারপর তাকে পুরোটা প্রাচীর ঘুরিয়ে দেখাল।

আসরাস হরমুজানের নগরীটা ভালোমতো দেখে ইরানির ঘরে ফিরে এল।

ইতিহাসে এসেছে, এই ইরানি অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক ছিল। সে আসরাসকে বলল, মাত্র দুশো সৈনিকের পক্ষে এই নগরীটা দখল করে নেওয়া সম্ভব। আসরাসের অনুমানও এ রকমই ছিল।

রাতে আসরাস যেপথে এসেছিল, সেপথেই বেরিয়ে গেল এবং সিপাহসালার আবু উবায়দা (রাযি.)কে ইতিবৃত্ত জানাল। বলল, মাত্র দুশো সাহসী মুজাহিদ হলেই আমি এই বিশাল নগরীটা জয় করতে পারি।

সিপাহসালার আবু উবায়দা (রাযি.) দুশো মুজাহিদ নির্বাচন করলেন এবং তাদেরকে আসরাসের হাতে তুলে দিলেন। আসরার তাদের কীভাবে নগরীতে প্রবেশ করতে হবে, প্রবেশ করে কী করতে হবে প্রয়োজনীয় সব কিছু তাদের বুঝিয়ে দিল।

পরবর্তী রাত মুজাহিদদের এই বাহিনীটি আসরাসের নেতৃত্বে রওনা হয়ে গেল। আসরাস তাদের সেপথে নগরীতে নিয়ে গেল, যেপথে সে নিজে গিয়েছিল।

নগরীর ফটকে যেকজন প্রহরী ছিল, এই দুশো মুজাহিদ তাদের প্রত্যেককে হত্যা করে ফেলল। তারপর উপরে টাওয়ারগুলোতে চলে গেল। অভিযানটা তারা এতখানি সাবধানতার সঙ্গে চালাল যে, কেউ টেরই পেল না নগরীতে কী ঘটছে। টাওয়ারগুলোতে উঠে মুজাহিদরা ছড়িয়ে গিয়ে বিপুলসংখ্যক ইরানি সৈন্যকে হত্যা করে ফেলল। এবার তারা ফটকটা খুলে দিল। তারপর এক মুজাহিদ একটা টাওয়ারে উঠল এবং উচ্চৈঃস্বরে তাকবিরধ্বনি তুলল।

হযরত আবু মুসা (রাযি.) এই সংকেতের অপেক্ষায়ই অপেক্ষমাণ ছিলেন। তিনি তাঁর অবশিষ্ট সৈনিকদের নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দিলেন। মুজাহিদরা বানের মতো ছুটে চলল এবং নগরীতে ঢুকে পড়ল। ইরানিরা তো কল্পনা করেনি, তাদের উপর এই আপদ নেমে আসতে পারে। তারা নিজেদের সামলে নিতে-না-নিতে তাদের গণহত্যা শুরু হয়ে গেল।

ইউরোপীয় ঐতিহাসকি বাটলার লিখেছেন, হরমুজান ও তার নেতারা সৈনিক ও সাধারণ মানুষদের মাঝে প্রচার করেছিল, মুসলমান যে-নগরী জয় করে, তার নারীদের সঙ্গে তারা খুবই খারাপ আচরণ করে এবং পরে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বাটলার লিখেছেন, এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত ইরানিরা যখন দেখল, মুসলমানরা নগরীতে ঢুকে পড়ছে, তখন কয়েক ব্যক্তি তাদের যুবতী মেয়েদের নিজহাতে হত্যা করে খালে ফেলে দিতে শুরু করল। মুজাহিদরা বিষয়টা জেনে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে তারা এই নারীহত্যা বন্ধ করে দিল।

হরমুজান সেসময় তার প্রাসাদে ছিলেন। ওখান থেকে তিনি পালিয়ে গেলেন এবং একটা টাওয়ারে গিয়ে উঠলেন। বাটলার লিখেছেন, হরমুজান তার অধীন সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের বললেন, 'মনে হচ্ছে, খালের গোপন পথটা কেউ আরবদের দেখিয়ে

দিয়েছে। আর সেই লোকটা আমাদেরই কেউ হবে। তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, আমাদের সূর্য ডুবে গেছে আর আরবদের সূর্য উদয়ের পথে।'

এই ঘটনাটি ইতিহাসের পাতায় স্থান দানকারী ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, নগরীর অধিবাসীদের মাঝে মহাপ্রলয় ঘটে গিয়েছিল। তাদের জানা ছিল না, মুসলমানরা ফটক কীভাবে খুলল। তাদের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, হরমুজান আমাদের বলতেন, এই নগরী ও তার দুর্গ অজেয়; কিন্তু আজ তিনি নিজেই নগরীর ফটক খুলিয়ে দিয়েছেন! তার প্রতিক্রিয়ায় নগরবাসী হরমুজান ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল, হরমুজানকে কোনো প্রকার সাহায্য করব না।

এই প্রতিক্রিয়ারই অংশ হিসেবে কেউ একজন মুসলমানদের জানিয়ে দিল, হরমুজান অমুক টাওয়ারে রয়েছেন। মুজাহিদরা ওখান থেকে তাকে গ্রেফতার করতে গেল। গিয়েই তাকে পেয়ে গেল। তিনি হাতে একটা ধনুক আর কাঁধে তূনীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা তির তিনি ধনুকে সংযোজন করে রেখেছেন। রাত কেটে গেছে। এখন ফকফকা দিনের আলো। মুজাহিদরা হুঙ্কার ছেড়ে তাকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাল।

'আমার তূনীরে একশো তির আছে'– ইতিহাসে হরমুজানের উত্তর এ-ভাষাতেই এসেছে– 'আমার কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা তিরও অবিশষ্ট তাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এ-ও ভেবে দেখো, আমার কোনো তির কোনোদিন ব্যর্থ যায়নি। নিজেদের একশো লোককে হত্যা করিয়েই তবে তোমরা আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে।

সেনাপতি আবু মূসাকে সংবাদ জানানো হলো। তিনিও এসে পড়লেন। তিনি বললেন, তুমি অস্ত্রসমর্পণ করো– হাতের তির-ধনুকগুলো ফেলে দাও।

'আমি জানি, লড়াই করা অবস্থায় যদি আমি গ্রেফতার হই, তাহলে তোমরা আমাকে হত্যা করে ফেলবে'– হরমুজান বললেন– 'আমার সামনে একটা পথ আছে; আমি তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করে নেব এবং নিজেকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। কিন্তু আমি চাচ্ছি অন্যকিছু।'

'আর কিছু চাওয়ার অধিকার তুমি হারিয়ে ফেলেছ'– মুসলিম সেনাপতি আবু মুসা বললেন– 'এটি আমাদের শহর। অবশ্য মুসলমানদের চরিত্রটাও তোমাকে দেখানো দরকার। তাই আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, কী চাও তুমি?'

'আমাকে তোমাদের খলীফা ওমরের কাছে পৌঁছিয়ে দাও'– হরমুজান বললেন– 'তাঁর যেকোনো সিদ্ধান্ত আমি অম্লানবদনে মেনে নেব। মরার আগে আমি তোমাদের খলীফার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর নির্দেশ ছিল, শত্রুপক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি আমার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ ব্যক্ত করে, তাহলে তার সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ করবে– তাকে আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবে। তাঁর এই নির্দেশ অমান্য করার সাহস কোনো সেনাপতির নেই। হরমুজান বিরাট এক ব্যক্তিত্ব এবং প্রবল শক্তির অধিকারী লোক। সব কিছু বিবেচনা করে সেনাপতি আবু মুসা (রাযি.) বললেন, ঠিক আছে; তোমার এই মনষ্কামনা আমি পূরণ করব এবং অনতিবিলম্বে আমীরুল মুমিনীনের তুমি দেখা পেয়ে যাবে। এখন তুমি আত্মসমর্পণ করো।

হরমুজানের বোধহয় জানা ছিল, মুসলমান কথা দিয়ে কথা রাখার মতো মানুষ; তারা ওয়াদা লঙ্ঘন করতে জানে না। আবু মুসা (রাযি.) কথাটি বলামাত্র তিনি তূনীর ও তিরগুলো তাঁর সম্মুখে ছুড়ে মারলেন। সামরিক আইন অনুযায়ী হযরত আবু মুসার আদেশে হরমুজানের হাতদুটো পিঠমোড়া করে রশি দ্বারা বাঁধা হলো। যত বড় ব্যক্তিত্বই হোক যুদ্ধবন্দি বলে কথা।

সেনাপতি আবু মুসা (রাযি.) তাঁর বাহিনীর দুজন দায়িত্বশীল আনাস ইবনে মালিক ও আহনাফ ইবনে কায়েসকে দায়িত্ব দিলেন, তোমরা হরমুজানকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে মদিনায় আমীরুল মুমিনীনের কাছে নিয়ে যাও। হরমুজানের আরেকটি বাসনাও পূরণ করা হলো যে, আমাকে রাজকীয় পোশাক ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে হবে।

উক্ত নগরী থেকে যেসব মালে গনিমত অর্জিত হয়েছিল, সেখান থেকে বাইতুল মালের অংশটুকু হযরত আনাস ও আহনাফ (রাযি.)-এর সাথে দিয়ে দিলেন যে এগুলোও মদিনায় নিয়ে যাও। এভাবে তাঁদের সঙ্গে অনেকগুলো উটের বেশ বড়সড় একটা কাফেলা প্রস্তুত হয়ে গেল। উটগুলোর পিঠে মালে গনিমত ও হরমুজানের সরঞ্জামাদি বোঝাই ছিল।

* * *

কাফেলা যখন মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে গেল, তখন হরমুজান কাফেলা থামিয়ে নিল এবং নিজের বেশ বদল করে নিল, যার বিবরণ ইতিহাসে এভাবে এসেছে–

'হরমুজান জাঁকালো শাহী পোশাক পরিধান করল। মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট মাথায় দিল এবং মুক্তা ও পোখরাজখচিত খাঁটি সোনার তৈরি রাজযষ্ঠি হাতে নিল, যাতে হযরত ওমর ও ইসলামি সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাগরিকরা তার জাঁকজমক দেখে চমকিত হন।'

কাফেলা মদিনায় প্রবেশ করলে জনতা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে হরমুজানকে দেখতে লাগল। তার পরিধানের পোশাক ও সাজগোজ মদিনার মানুষের কাছে একেবারেই নতুন ও অভিনব ছিল। তাকে হযরত ওমরের ঘরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

কিন্তু দর্শনার্থীদের একজন বলল, আমীরুল মুমিনীন তো মসজিদে আছেন। তারা আরও জানতে পারল, কুফা থেকে একটি প্রতিনিধিদল এসেছিল, যারা আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে দেখা করে চলে গেছে; কিন্তু তিনি এখনও মসজিদেই অবস্থান করছেন।

আনাস ও আহনাফ হরমুজানকে মসজিদে নিয়ে গেলেন। কিন্তু মসজিদ একদম শূন্য; কেউ নেই মসজিদে। ইতিহাসে এসেছে, তিন-চারটা বালক একদিকে ইশারা করল, যার অর্থ ছিল, আমাদের আমীরুল মুমিনীন মসজিদের এককোণো শুয়ে আছেন। ঘটনাটা ঘটল এই যে, কুফার প্রতিনিধিদল চলে গেলে আমীরুল মুমিনীন মসজিদের এককোণে গিয়ে পরিধানের চোগাটা খুলে ভাঁজ করে মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়েছেন।

হরমুজানের পায়ের জুতাজোড়া মসজিদের বাইরেই খুলে নেওয়া হলো এবং তাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো। হযরত ওমর (রাযি.) গভীর ঘুম ঘুমোচ্ছেন। হযরত আনাস ও আহনাফ (রাযি.) হরমুজানকে সঙ্গে নিয়ে আলাদা একজায়গায় বসে পড়লেন, যাতে আমীরুল মুমিনীনের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে।

দুজন খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ আল্লামা তাবরীযি ও ইবনে কাছীর আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে হরমুজানের এই সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তারা লিখেছেন, মসজিদে আরও কিছু মানুষ এসে-এসে বসে পড়তে শুরু করল। শেষাবধি এত মানুষের সমাবেশ ঘটে গেল যে, মসজিদ কানায়-কানায় ভরে গেল। ফলে নীরবতা রক্ষা করা আর সম্ভব হলো না। হযরত ওমর (রাযি.)-এর চোখ খুলে গেল।

যেহেতু হযরত ওমর ও হরমুজানের মাঝে কথোপকথন হবে, তাই একজন দোভাষীও উপস্থিত ছিলেন। ইনি হলেন প্রখ্যাত সাহাবি হযরত হুজরা ইবনে শু'বা (রাযি.)। হরমুজানকে বলে দেওয়া হলো, তোমার কথা যা বলবার আছে, এর সঙ্গে বলবে আর ইনি আরবিতে অনুবাদ করে আমীরুল মুমিনীনকে বুঝিয়ে দেবেন।

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) ঘুমিয়ে ছিলেন। হরমুজান বিস্ময়ের সঙ্গে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন যে, আমীরুল মুমিনীন কোথায়! না জানি তিনি কখন এসে হাজির হবেন!

'তোমাদের খলীফা ওমর কোথায়?' হরমুজান দোভাষী হুজরা ইবনে শু'বাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'তিনি তোমার সামনেই শুয়ে আছেন।' হুজরা ফারসিতে উত্তর দিলেন।

হরমুজানের মুখমণ্ডলে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল এবং তিনি নিজের মাথাটা ঝুঁকিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে প্রথমে হযরত ওমরের পানে তাকালেন। তারপর মুজরা ইবনে শু'বার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, ইনি তোমাদের খলীফা'– হরমুজান বললেন– 'মসজিদের সামনে একজন দারোয়ান দেখলাম না। নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো দেখা পেলাম না। ইনি যদি খলীফা হন, তাহলে তো এখানে ব্যাপক প্রহরা থাকবার কথা।'

'আমাদের খলীফার রক্ষী হলেন আল্লাহ'– মুজরা ইবনে শু'বা মুচকি হেসে বললেন– 'তোমাদের মতো দারোয়ান-রক্ষী আমাদের লাগে না যে, খলীফা যেখানে যাবেন, একটা বাহিনী তাঁর সঙ্গে থাকবে।'

তখন মন্তব্য করতে গিয়ে ইরানসেনাপতি হরমুজান যেকথাটি বলেছিলেন, ইতিহাসের আঁচলে তা সংরক্ষিত আছে। তিনি বললেন, 'এই লোকটির নবী হওয়া দরকার ছিল। নবী না হলেও এঁর কর্মকাণ্ড নবীদেরই মতো।

মসজিদ লোকাকীর্ণ হয়ে গেল, যাদের নীরব রাখা যাচ্ছিল না। হরমুজানও আলাপ শুরু করে দিয়েছেন। ফলে হযরত ওমর (রাযি.)-এর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি হযরত আনাস ও আহনাফকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ইরানরণাঙ্গনের পরিস্থিতি জানতে তিনি উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু রাজা-বাদশাদের মতো একজন মানুষ তাঁদের সঙ্গে দেখে তিনি হযরত আনাস ও আহনাফ (রাযি.)-এর পানে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'ইনি ইরানি বাহিনীর অনেক বড় মাপের একজন সেনাপতি'– আনাস ইবনে মালিক হযরত ওমরকে জানালেন– 'রাজপরিবারের সদস্য। এরই নাম হরমুজান।'

লোকটাকে কীভাবে গ্রেফতার করা হলো, তার ইতিবৃত্ত আমীরুল মুমিনীনকে জানানো হলো। তারপর বলা হলো, ইনি আপনার সাক্ষাত কামনা করছিলেন।'

'আমি জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি'– হযরত ওমর (রাযি.) গভীর চোখে হরমুজানের জাঁকজমকের প্রতি তাকিয়ে বললেন– 'আমি আল্লাহর শোকর আদায় করছি, যিনি একে ও এর সতীর্থদের ইসলামের মোকাবেলায় অপদস্থ ও অপমানিত করেছেন।'

হযরত ওমর মসজিদে বসেই জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিতে শুরু করলেন– 'মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহর দীনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে থাকো। দুনিয়ার সেসব প্রতারণা-প্রবঞ্চনায় পা দিয়ো না, যেভাবে ইরানের এই লোকটা এসেছে। মনে রোখে, দুনিয়ার আড়ম্বর ও জাঁকজমকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নেই।

'আমীরুল মুমিনীন!'– আহনাফ ইবনে কায়েস বললেন– 'আপনি এর বক্তব্য শুনুন; ইনি আপনার সাক্ষাতের প্রত্যাশী ছিলেন।'

'না'– হযরত ওমর বললেন– 'যতক্ষণ পর্যন্ত এর গায়ে এই পোশাকের একটা সুতাও অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সঙ্গে কথা বলব না। আগে একে সেই পোশাক পরাও, যে-পোশাক আমি ও তোমরা পরিধান করি।

হুজরা ইবনে শু'বা আমীরুল মুমিনীনের আদেশটা হরুমুজানকে জানিয়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে আদেশের তামিল শুরু হয়ে গেল। হরমুজানকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো আর দুজন লোক তার রাজকীয় পোশাকটা খুলে ফেলল। শুধু শরীরের নিম্নাংশের পোশাকটুকু অবশিষ্ট রাখা হলো। একব্যক্তি গিয়ে তার জন্য মোটা ও খুবই সাধারণ পোশাক নিয়ে এল। এই পোশাকটা হরমুজানকে পরিয়ে দেওয়া হলো।

'হরমুজান!'– হযরত ওমর হরমুজানকে উদ্দেশ করে বললেন– 'সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য তোমার জানা হয়ে গেছে, নাকি এখনও হয়নি? আল্লাহর বিধান অমান্যের পরিণতি তুমি নিজচোখে দেখেছ, নাকি এখনও তা দেখার কাজ বাকি আছে?'

'ওমর!'– হরমুজান পরম সাহসিকতার সঙ্গে বলল– 'জাহেলি যুগেও আমরা ও তোমরা লড়াই করেছি এবং আমরা তোমাদের উপর জয়লাভ করেছি। এমনটা শুধু এজন্য হয়েছিল যে, আল্লাহ না তোমাদের পক্ষে ছিলেন, না আমাদের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এখন আল্লাহ তোমাদের পক্ষে চলে গেছেন। ফলে তোমরা আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছ।

এখানে এসে হযরত ওমর অনুভব করলেন, হুজরা ইবনে শু'বা তরজুমানি ঠিকভাবে করছেন না। ইতিহাসে এসেছে, হুজরা ইবনে শু'বা ফারসি ভাষায় অতটা দক্ষ ছিলেন না। হযরত ওমর (রাযি.) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাযি.)কে ডেকে পাঠালেন। তিনি ফারসি ভালো জানতেন এবং অনর্গল বলতে পারতেন।

'একটা কথা তুমি বুঝতে পারনি হে ইরানি সেনাপতি!'– 'জাহেলি যুগে আমাদের উপর তোমরা স্রেফ এজন্য জয়ী হয়েছ যে, তখন তোমরা ঐক্যবদ্ধ ছিলে; তোমাদের কাছে তখন ঐক্য ছিল। আর আমরা ছিলাম নানামতে বিভক্ত ও গোত্রে-গোত্রে বিচ্ছিন্ন। এবার চিন্তা করে দেখো, তোমার জাতিকে এই যে আমরা একের-পর-এক পরাজয় দিয়ে যাচ্ছি, তার রহস্য কী।'

হযরত ওমর (রাযি.)-এর বলার ভঙ্গিতে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল তা পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, যেন এই লোকটার প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা। তা তো থাকবারই কথা। এর বাহিনী ইসলামের হাজার-হাজার সৈনিককে শহীদ করেছে আর এখন যখন পরাজিত হয়ে এখানে এল, তো এল অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে রাজকীয়ভাবে।

হরমুজান অভিজ্ঞ ও মানুষ চেনায় ওস্তাদ ছিলেন। হযরত ওমরের মেজাজ দেখে তিনি তাঁর ভাবগতি বুঝে ফেললেন।

হরমুজান আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

'ওমর!'– হরমুজান বললেন– 'আমি জানি তুমি আমাকে হত্যা করে ফেলবে।'

'মৃত্যুকে ভয় করো না হরমুজান!'– হযরত ওমর বললেন– 'তবে এখনও জানি না, আমি কী করব এবং আল্লাহ আমাকে দিয়ে কী করাবেন।

হরমুজান পানি চাইলেন এবং বললেন, আমি পিপাসায় মরে যাচ্ছি। আমীরুল মুমিনীন আদেশ করলে তার জন্য পানি আনা হলো। কিন্তু যে আনল, বোধহয় সে মনে করেছিল, আমীরুল মুমিনীন যেহেতু তার শরীর থেকে রাজকীয় পোশাক খুলে অতি সাধারণ পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন, তার অর্থ হলো, একে তিনি অপদস্থ করতে চাচ্ছেন। তাই সে হরমুজানের জন্য একটা গড়া থেকে ঢেলে একটা সাধারণ পেয়ালায় করে পানি নিয়ে এল।

'ও হে মুসলমানদের খলীফা!'– হরমুজান বলল– 'পিপাসায় মরে গেলেও তো আমি এই পেয়ালায় করে পানি পান করব না।'

হযরত ওমরের আদেশে একটা ভালো পেয়ালায় করে পানি নিয়ে আসা হলো। হরমুজান পানি পান করতে গেল। কিন্তু তার হাতটা কাঁপতে শুরু করল।

'ওমর!'– হরমুজান বললেন– 'আমি আশঙ্কা করছি, পানিটুকু পান করা হয়ে গেলেই আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলবেন।'

'এই ভয় মন থেকে বের করে দাও'– হযরত হরমুজানকে অভয় দিলেন– 'এই পানিটুকু পান না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে হত্যা করব না।'

কথাটা আদায় করে নিয়ে হরমুজান পানি পান না করে পেয়ালাটা একধারে সরিয়ে রাখলেন। তারপর আমীরুল মুমিনীন ও হরমুজানের মাঝে যে-কথাবার্তা হলো, তাতে তিক্ততা ও উত্তেজনা তৈরি হয়ে গেল। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে গড়াল যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আহনাফ ইবনে কায়েস ও আনাস ইবনে মালিক হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন।

'আমি তোমাকে হত্যা করব।' হযরত ওমর (রাযি.) বললেন।

'ওমর!'– হরমুজান বললেন– 'আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না। কারণ, এইমাত্র আপনি আমাকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়ে ফেলেছেন।'

'তুমি মিথ্যা বলছ'– হযরত ওমর রাগত স্বরে বললেন– 'বেঁচে থাকার অধিকার আমি তোমাকে দিতে পারি না।'

হযরত ওমর (রাযি.)—এর ক্ষোভ ও রোষ দেখে হযরত আনাস ইবনে মালিককে আবারও হস্তক্ষেপ করতে হলো। তিনি হযরত ওমরকে উদ্দেশ করে বললেন, হরমুজান প্রতারণার মাধ্যমে আপনার থেকে জীবনের নিরাপত্তা আদায় করে নিয়েছে।

'তুমি কী বলছ আনাস!'– হতচকিত হয়ে হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন– 'যে-মানুষটা আমাদের দামি-দামি সালারদের হত্যা করল, তাকে আমি কীভাবে জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারি! আমি বুঝতে পারলাম না, প্রতারণার মাধ্যমে এ কীভাবে আমার থেকে জীবনের নিরাপত্তা আদায় করে নিল!

'আমীরুল মুমিনীন!'– হযরত আনাস (রাযি.) বললেন– 'এ বলেছিল, আমি আশঙ্কা করছি, পানিটুকু পান করা হয়ে গেলেই আপনি আমাকে হত্যা করে ফেলবেন। আপনি বলেছিলেন, এই পানিটুকু পান না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে হত্যা করব না। হরমুজান পানিটুকু পান না করে একধারে সরিয়ে রেখেছেন। এখন তো ইনি পানি পান করবেনই না।'

'আরে ইরানের চালবাজ সেনাপতি!'– হযরত ওমর (রাযি.) রোষকষায়িত লোচনে হরমুজানের চোখে চোখ রেখে বললেন– 'আমাকে তুমি ধোঁকা দিয়েছ! আল্লাহর কসম, ধোঁকাটা আমি এজন্য খেয়েছি যে, আমি মুসলমান। মুসলমান উগড়ানো কথা গলাধঃকরণ করে না।'

'খলীফাতুল মুসলিমীন!'– হরমুজান মিটিমিটি হাসলেন এবং ডান হাতটা হযরত ওমর (রাযি.)-এর প্রতি এগিয়ে দিলেন– 'আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। আর এ লক্ষ্যেই আমি এখানে এসেছি।'

ইরানের বড় মাপের একজন সেনাপতি– যিনি রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন– ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। পরক্ষণেই তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, আমি অবশিষ্ট জীবনটুকু মদিনাতেই কাটিয়ে দিতে চাই। হযরত ওমর তাকে অনুমতি দিলেন এবং তার নামে বার্ষিক দু-হাজার দেরহাম ভাতা চালু করে দিলেন।

দুজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, হরমুজান হযরত ওমর (রাযি.)কে বলেছিলেন, আপনাকে ধোঁকাটা আমি এজন্য দিয়েছিলাম, যেন কেউ; বিশেষ করে কোনো ইরানি বলতে না পারে, আমি জীবনের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি। ইতিহাসে একথাও লিখা আছে যে, হযরত ওমর সামরিক বিষয়াদিতে হরমুজান থেকে পরামর্শ নিতেন। তবে তিনি কাজ কী করতেন, ইতিহাসে সেই তথ্য পাওয়া যায় না। ইতিহাস শুধু এটুকু বলছে যে, ইসলামের স্বার্থে তিনি অনেক কিছু করেছেন।

২৩ হিজরির ২৬ যুলহজ্জ বুধবার এক ঘাতক মসজিদে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)কে শহীদ করেছিল। ঘাতকে নাম ছিল আবু লুলু ফিরোজ। লোকটা মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.)-এর খ্রিস্টান গোলাম ছিল। গ্রেফতার হওয়ার পর সে নিজেরই খঞ্জর দ্বারা আত্মহত্যা করেছিল। লোকটা ছিল ইরানি এবং নাহাওন্দে যুদ্ধবন্দি হয়ে এসেছিল।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর পুত্র অনুসন্ধানে বের হলেন, লোকটা হযরত ওমরকে শুধু ব্যক্তিগত কারণে হত্যা করা হলো, নাকি এর পিছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। ঘাতকের খঞ্জরটা জব্দ করা হলো। নীরিক্ষা করে দেখা হলো, এটা সাধারণ কোনো খঞ্জরের মতো ছিল না। বরং তার বাঁটটা ছিল মধ্যখানে এবং একটার বদলে দুটা খঞ্জর। একটা ফলা একদিকে, একটা অপরদিকে।

ইতিহাস বলছে, হযরত আবুবকর (রাযি.)-এর পুত্র হযরত আবদুর রহমান খঞ্জরটা দেখে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলেন।

'আল্লাহর কসম!'– আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর বললেন– 'আমি হরমুজানকে দুজন লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করতে দেখেছি। তাদের একজন জুফায়না আর অপরজন অভিশপ্ত ঘাতক ফিরোজ। আমাকে দেখে এরা তিনজনই চমকে উঠেছিল। যখন তড়িঘড়ি এদিক-ওদিক সরে যেতে লাগল, তখন এই খঞ্জরটা পড়ে গিয়েছিল। আবুলুলু খঞ্জরটা তুলে নিয়ে হেঁটে গিয়েছিল।'

আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর (রাযি.)-এর এই জবানবন্দি শুনে প্রবীণ সাহাবি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযি.) অভিমত ব্যক্ত করলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে, হরমুজান ও জুফায়না হযরত ওমর (রাযি.)-এর এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত। হযরত ওমর (রাযি.)-এর পুত্র উবায়দুল্লাহ যখন এসব তথ্য-প্রমাণ এবং প্রবীণ সাহাবিগণের অভিমত শুনলেন, তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে তরবারি হাতে করে ছুটে গেলেন। প্রথমে তিনি হরমুজানের ঘরে গেলেন এবং তাকে ডেকে বাইরে আনলেন। বললেন, আমার সঙ্গে এসো; আমার ঘোড়াটা একটু দেখো। হরমুজান তাঁর সামনে-সামনে হাঁটতে শুরু করল। তিনি পিছন থেকে এক আঘাতে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। হরমুজানের ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

সেখান থেকে তিনি জুফায়নার ঘরে গেলেন এবং তাকেও হত্যা করে ফেললেন। তারপর ঘাতক আবুলুলুর ঘরে গেলেন। ঘরে তার ছোট একটা মেয়ে ছিল। তিনি মেয়েটাকেও হত্যা করে ফেললেন। তারপর চরম উত্তেজনা ও উন্মাদনার মধ্যে তরবারিটা ঘোরাতে-ঘোরাতে ছুটতে শুরু করলেন আর বলছিলেন, আমি একটাও ইরানি ও অমুসলিম গোলাম জীবিত রাখব না।

* * *

দুর্ভিক্ষসৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) ভাবনায় পড়ে গেলেন, রোমানরা কিংবা ইরানিরা যদি আক্রমণ করে বসে, তাহলে তো মারাত্মক সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে! কিন্তু তার অর্থ এই ছিল না যে, এই পরিস্থিতিতে মুসলমানরা আক্রমণের চাপ সামলাতে পারবে না এবং শামের দখল ছেড়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হবে।

কিন্তু এই চিন্তাটা হযরত ওমরের মাথায় এখনও আসেনি যে, প্রকাশ্য আক্রমণের পরিবর্তে আন্ডারগ্রাউন্ড আক্রমণও আসতে পারে এবং হেরাকল-এর রাজদরবারে শামে খ্রিস্টানদের দ্বারা বিদ্রোহ ঘটানোর সম্ভাবনা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

বিনয়ামিনের কাছে আরও জনাকতক খ্রিস্টান এসে অবস্থান নিয়েছে। তাদের কয়েকজন বিনয়ামিনের গোপন সংগঠনের সদস্য। এক-দুজন ইবনে সামেরের মতো পলাতক আসামী। তাদের দুজন ইবনে সামেরের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেল। তারাও ইবনে সামেরের মতো ধর্মোন্মাদ ছিল। দুজনই ইবনে সামেরেরই মতো রোমান ও মুসলমানদের ঘোর বিরোধী।

বিনয়ামিনের কাছে দীর্ঘ রিপোর্ট নিয়ে যে-দুজন গোয়েন্দা এসেছিল, তাদের একজন ইবনে সামেরের একবন্ধুর ঘনিষ্ট সুহৃদ। সে তার বন্ধুকে রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানিয়ে দিল।

'তার মানে কি শামের খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?' ইবনে সামেরের বন্ধু জিজ্ঞেস করল।

'না'– গোয়েন্দা উত্তর দিল– 'বিনয়ামিন বিদ্রোহের পক্ষে নন। তাঁর যুক্তি হলো, ইতিপূর্বে শামের খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ করে শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হয়েছে। ওদিকে হেরাকল-এর বিশপ কায়রাসও বিদ্রোহের বিপক্ষে।'

'সম্রাট হেরাকল কি শামের উপর আক্রমণ চালাবেন না?' ইবনে সামেরের বন্ধু জিজ্ঞেস করল।

'না'– গোয়েন্দা উত্তর দিল– 'হেরাকল আসলে কী করবেন দিশা ঠিক করতে পারছেন না। তিনি দ্বিধায় পড়ে আছেন।

'এরা মুসলমানদের আত্মসংবরণের সুযোগ দিয়ে দিচ্ছে'– ইবনে সামেরের বন্ধু তাচ্ছিল্যের সুরে বলল– 'আক্রমণের এটিই মোক্ষম সময়। এই সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেলে মুসলমানরা পুনরায় শক্তি অর্জন করবে এবং মিশরি বাহিনীকে আগেরবারেরই মতো শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেবে।

ইবনে সামের ও তার এই দু-বন্ধু বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা কম এবং আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেশি চিন্তা করছিল।

'বিনয়ামিনের চিন্তাধারা ভিন্ন কিছু'– গোয়েন্দা বন্ধু বলল– 'তাঁর বক্তব্য হলো, শামে বিদ্রোহ না হওয়া উচিত, যাতে মুসলমানরা মহামারির প্রভাব থেকে বেরিয়ে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে এবং মিশরের উপর আক্রমণ করে রোমান বাহিনীকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়।'

'এমনটা হবে না'– ইবনে সামেরের বন্ধু আবেগপূর্ণ ও ক্ষোভমেশানো কণ্ঠে বলল– 'তার অর্থ তো এই দাঁড়াল যে, শামের উপর তো মুসলমানদের রাজত্ব আছেই; মিশরের উপরও তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে! না-না; আমরা মিশরে বিদ্রোহ করাব।'

তিনজন নিজেদের মতো করে একটা পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করে দিল। চিন্তা করল, শামে বিদ্রোহ উসকে দিতে এখান থেকে কিছু লোক পাঠাতে হবে, যারা ওখানে গোপন পন্থায় মানুষকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে। তাদের ধারণা ছিল, এই কাজটি তারা নিজেরাও করতে পারে এবং এটি তাদের ধর্মীয় কর্তব্যও। তাদের বিবেকের উপর ধর্মীয় উন্মাদনা ও কঠোরতা চেপে বসল।

তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, বিনয়ামিনকে না জানিয়ে তারা এখান থেকে বেরিয়ে শাম চলে যাবে।

আইনি এখন ইবনে সামেরের স্ত্রী। সেও এই তিন বন্ধুর আসরগুলোতে অংশগ্রহণ করছিল এবং তাদের কথাবার্তা শুনছিল। মেয়েটা তরুণী এবং খুবই সুন্দরী। তার মাঝে বিশেষ ধরনের চঞ্চলতা ও প্রাণবন্ততা ছিল। ইবনে সামেরের দুই বন্ধুর সঙ্গে সে পুরোপরি অকপট ও অকৃত্রিম হয়ে গিয়েছিল। ইবনে সামের ও তার বন্ধুদের চিন্তার সঙ্গে সেও একাত্মতা ঘোষণা করল।

বিনয়ামিনের আস্তানায় ঘোড়া থাকত। একরাতে তারা চারটা ঘোড়া প্রস্তুত করে নিল এবং লুকিয়ে-লুকিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এল। বিনয়ামিনের আস্তানায় কোনো পাহারা ছিল না। কাজেই তাদের পলায়ন দেখার মতো কেউ ছিল না। একটা ঘোড়ায় আইনি আর বাকি তিনটাতে তিন বন্ধু চড়ে ছুটতে শুরু করল। এলাকাটা ছিল বালুকাময়। ফলে পলায়মান ঘোড়াগুলোর পায়ের আওয়াজ কারও কানে গেল না। তারা অনেক দূর চলে গেল।

* * *

সকালে বিনয়ামিন দেখতে পেলেন, তারা চারজন উধাও। আস্তাবলে ঘোড়াও চারটা কম। তখন তিনি শুধু এটুকু বললেন, খোদা! ওদের তুমি নিরাপদের রাখো।

তারা যদি এসকান্দারিয়া চলে যেত, তাহলে আন্তাকিয়াগামী নৌজাহাজ পেয়ে যেত। কিন্তু তাদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন জরুরি ছিল। এটা বেশি প্রয়োজন ছিল ইবনে

সামেরের জন্য। সে সেনাবাহিনীর পলাতক খুনী। তার চেষ্টা ছিল, ভ্রমণপথে যেন কেউ তাকে চিনতে না পায়।

তারা লোকালয় ও সেনাচৌকিগুলো এড়িয়ে দূর-দূরান্তের জনমানবহীন অঞ্চল দিয়ে পথ চলছে। ইবনে সামের অনেক বড় দাড়ি রেখেছে এবং একজন পাদরির বেশ ধারণ করেছে। মিশর সেনাবাহিনীর একজন দায়িত্বশীল ছিল বিধায় ইবনে সামেরের পথ-ঘাট অনেক চেনা। তার জানা আছে, মিশরের পূর্বাঞ্চলে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খালে নিয়মতান্ত্রিক বন্দর রয়েছে। কিন্তু ওখানে তাকে কেউ-না-কেউ চিনে ফেলতে পারে। কারণ, ওখানে সেনাবাহিনীর উপস্থিতির আশঙ্কা বিদ্যমান। তার জানা ছিল, কোনো-কোনো জায়গা থেকে এমন কিছু জাহাজও পাওয়া যায়, যেগুলো নিয়মতান্ত্রিক বন্দরগুলোতে ঘাট ধরে না।

তিন দিন পথ চলার পর তারা লোহিত সাগরের কূলে গিয়ে পৌঁছল, যেখান থেকে সুয়েজ খালের যাত্রা শুরু। তারা এমন একটা জায়গায় গিয়ে যাত্রাবিরতি দিল, যেখানে ছোট-ছোট পালতোলা নৌকা পাওয়া যেতে পারে। ঘোড়াগুলোকেও তারা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। জাহাজে করে ঘোড়া বহন করার নিয়ম আছে। এখানে এসে তারা জানতে পারল, তিন-চার দিনের মধ্যে একটা জাহাজ প্রস্তুত হয়ে যাবে।

জাহাজ প্রস্তুত হয়ে গেল। আরবের কূলে পৌঁছতে যে-পরিমাণ অর্থ-কড়ি দরকার, তা এদের কাছে আছে। জাহাজটাও এতখানি বড় যে, তারা ঘোড়াও নিয়ে নিতে পারল।

সোজাসুজি পথে এখান থেকে আরবের কূল পর্যন্ত দূরত্ব একশো মাইলের সামান্য বেশি। কিন্তু এই জাহাজ পথে আরেকটা ঘাট ধরবে বলে যাবে অনেকখানি পথ ঘুরে, যে-পথের দূরত্ব সাড়ে তিনশো মাইল। এতখানি পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছতে সময় লাগবে কয়েক দিন।

জাহাজ নোঙর খুলে পাল তুলে দিল। বন্দর ছেড়ে জাহাজ গন্তব্যপানে চলতে শুরু করল। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ইবনে সামের তার বন্ধুদের পরামর্শ দিল, জাহাজের যাত্রীদের সাথে মিশে আমাদের খাতির জমাতে হবে। যারা এদের মধ্যে খ্রিস্টান আছে, তাদেরকে আমাদের মিশনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

তারা সেদিনই যাত্রীদের সাথে মিশতে শুরু করল। দুদিনেই তারা জেনে ফেলল, এই জাহাজের যাত্রীদের কারা খ্রিস্টান আর কারা মুসলমান। কতজন খ্রিস্টান আর কতজন মুসলমান।

ইবনে সামেরের এ-ও জানা ছিল, এই জাহাজ তাদের আরবের কোনো ঘাটে নিয়ে নামাবে, সেখান থেকে শাম যেতে অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে এই পুরো

অঞ্চলটা মরুভূমি। খ্রিস্টবাদের নামে সে এত দীর্ঘ সফর ও নানা কষ্ট-যন্ত্রণা মানসিকভাবে বরণ করে নিয়েছে এবং সহকর্মীদেরও ব্যাপারটা অবহিত করে রেখেছে। তাদের কাছে ঘোড়া ছিল। তাই বেশি বিচলিত হওয়া আবশ্যক মনে করল না।

তারা খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে চার-পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বেছে নিল এবং কথা বলে-বলে তাদের ঘনিষ্ঠ বানিয়ে নিল। ঘটনাক্রমে তাদের একজন ছিল শামেরই কোনো এক গোত্রের অধিপতি। লোকগুলোকে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করল। দুপক্ষে মতবিনিময় হলো। এমনকি কথা কাটাকাটিও হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ইবনে সামেরের মিশনের সঙ্গে একাত্ম হতে বাধ্য হলো।

ইবনে সামের ও তার বন্ধুরা এই খ্রিস্টান নেতাদের বলল, আপনারাও শাম গিয়ে ওখানকার খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করুন।

মধ্যবয়সী আরেক খ্রিস্টানের সঙ্গে তাদের দেখা হলো। ইবনে সামের ও তার বন্ধুরা বিশেষভাবে অনুভব করল, এই লোকটা খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। যখন কথা বলে তার বক্তব্য অন্যদের খুবই প্রভাবিত করে।

একদিন তারা লোকটাকে ঘিরে বসল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায়? সে শামের একটা শহরের নাম বলল, আমি অমুক শহরের বাসিন্দা।

ইবনে সামের ও তার বন্ধুরা তাকে অনেক কিছু বোঝাল। অবশেষে বলল, শামে যদি খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ করে, তাহলে অন্তত ওই দেশটির ওপর খ্রিস্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। লোকটি তাতে সমর্থন জানাল এবং জিজ্ঞেস করল, কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব হবে এবং আপানারা কী জন্য আসছেন। ইবনে সামের তাকে জানিয়ে দিল, আমরা এই মিশন নিয়েই এসেছি এবং ওখানে গিয়ে আমরা একটা আন্ডারওয়ার্ল্ড গড়ে তুলব এবং গোপনে কাজ চালিয়ে যাব।

এ ক্ষেত্রে সম্রাট হেরাকল, মুকাওকিস ও পাদরি বিরয়ামিন এদের কার কী দৃষ্টিভঙ্গি লোকটি এদের কাছ থেকে সেই তথ্যও জেনে নিল। গোয়েন্দা বিনয়ামিনকে যে-তথ্যগুলো সরবরাহ করেছিল, ইবনে সামের লোকটিকে তাও শুনিয়ে দিল। রোমান বাহিনী এখন কী অবস্থায় আছে, তারা কী করছে এসব তথ্যও সে খুটিয়ে-খুটিয়ে তাদের কাছ থেকে বের করে নিল। ইবনে সামের নিজে একজন সৈনিক। আবার বিনয়ামিনের কাছে অবস্থান করে সেখান থেকেও অনেক তথ্য জানতে পেরেছিল। এসব নিজের জানা সমস্ত তথ্য এই লোকটির দিয়ে দিল।

একরাতে ইবনে সামের জাহাজের ছাদে গেল। আকাশে জোসনা ছিল। ফলে ছাদটা আলোয় ফকফক করছিল। ইবনে সামের ছাদে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ এই লোকটা তার সামনে পড়ল। ইবনে সামেরের মনে সন্দেহ জাগল, এ কি সেই

লোকটা না? হ্যাঁ; সে-ই তো মনে হয়। আবার ভাবল, নাকি অন্য কেউ? চেহারায়-চেহারায় মিলও থাকতে পারে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইবনে সামের তার কাছে গিয়ে ভালো করে দেখল। ইবনে সামেরের মনে সন্দেহটা এজন্য জেগেছিল যে, লোকটি নামায পড়ছিল। সে তো নিজেকে খ্রিস্টান দাবি করেছিল। এ যদি সেই লোক হয়, তাহলে এ নামায পড়বে কেন? নামায তো মুসলমানরা পড়ে!

লোকটি ঈশার নামায পড়ছিল এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে আরও দুজন লোক নামায আদায় করছিল।

'বলেছিলে, তুমি খ্রিস্টান'– ইবনে সামের তাকে জিজ্ঞাসা করল– 'তুমি নামায পড়ছ কেন? নামায তো মুসলমানরা পড়ে?'

'আমি দরবেশ মানুষ'– লোকটি উত্তর দিল– 'ফরজ হলো খোদার এবাদত করা। এবাদত একই নিয়মে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তুমি দেখেছ, আমি নামায পড়ছিলাম। কিন্তু আমি মুসলমানি নামায পড়িনি। এই নিয়মে আমি খোদাকে স্মরণ করছিলাম।'

ইবনে সামেরের মন প্রবোধ মানল না। সে প্রশ্নোত্তরের ধারা শুরু করে দিল আর লোকটিও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তাকে বোঝাতে থাকল। অবশেষে ইবনে সামের সেখান থেকে উঠে বন্ধুদের কাছে চলে গেল। সে নিশ্চিত হয়ে গেল, লোকটি খ্রিস্টান নয়– মুসলমান। ব্যাপারটা সে সঙ্গীদের জানাল এবং অভিমত ব্যক্ত করল, এ ধরনের মানুষ সাধারণ গোয়েন্দা হয়ে থাকে; এই লোকটাকেও আমার গোয়েন্দা বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

পরদিন তারা বিভিন্ন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল এবং নিশ্চিত হলো, লোকটি মুসলমান এবং আরবি। তবে কারুরই জানা ছিল না, লোকটি গোয়েন্দাও বটে।

সত্য হলো, লোকটি মুসলমান এবং গোয়েন্দা, যাকে গোয়েন্দাগিরি করারই জন্য মিশর পাঠানো হয়েছিল। আর রাতে জাহাজের ছাড়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে যে-দুজন লোক নামায পড়ছিল, তারা এর সহকর্মী। তবে মিশরে এদের কোন মিশন নিয়ে পাঠানো হয়েছিল ঐতিহাসিকরা সেই তথ্য লিখেননি।

ব্যাপারটায় ইবনে সামের বড় বেশি বিচলিত হয়ে পড়ল। কারণ, মুসলমান গোয়েন্দা তার পেট থেকে অনেক তথ্য বের করে নিয়েছে। এখন তার পুরোপুরিই বুঝে আসছে, লোকটা আসলেই গোয়েন্দা। কেননা, গোয়েন্দা না হলে এভাবে কথা নিতে পারে না।

ইবনে সামের আবেগপ্রবণ ও উন্মাদ প্রকৃকির মানুষ। তার সহকর্মীরা তারই মতো। মাথা খাটিয়ে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা একজনেরও নেই। আবেগতাড়িত

হয়েই তাদের এই মিশনে যাত্রা এবং আবেগেরই কারণে এত কথা বলা। এবার আরেকটি আবেগের প্রমাণ দিল আরেকবার। তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নিল, রাতে সুযোগমতো লোকটাকে বেঁধে নদীতে ফেলে দেব; তবেই ল্যাঠা চুকে যাবে।

ইবনে সামের বলল, কাজটা আজ রাতেই সমাধা করে ফেলতে হবে; দেরি করা যাবে না।

'আমার সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় খুবই ভালো'– ইবনে সামের বলল– 'আমি যদি বলি, চলো; ছাদে গিয়ে কথা বলি, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে যাবে। এনে তাকে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাব যে, কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এই কাজটা আমরা রাতে করব। আমরা তাকে একটা ঠেলা দিয়ে নদীতে ফেলে দেব। কেউ দেখবে না আর জাহাজ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।'

ইবনে সামের সেদিনই সন্ধ্যায় মুসলমান গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা করল এবং অকৃত্রিম বন্ধুসুলভ হৃদ্যতা প্রকাশ করল। বলল, আজ রাতে তোমার সাথে আমার দীর্ঘ সময় বসতে হবে। মুসলমান গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, বিশেষ কোনো কথা আছে, নাকি এমনি সময় কাটাতে চাও?'

'আমি অনেক চিন্তা করেছি'– 'অবশেষে তোমার কথাগুলো আমার মাথায় ধরেছে, খোদার উপাসনা একই নিয়মে করতে হবে এমন কোনো বিধান নেই। তোমাকে ধর্মপণ্ডিত ও বিজ্ঞ লোক বলে মনে হচ্ছে। আমি তোমার শিষ্যত্ব বরণ করে নিচ্ছি। আজ রাতেই আমি তোমার থেকে পাঠ শিখতে চাই। আমি আসলে একজন অস্থির মনে মানুষ। বোধহয় খোদা আমার উপর অসন্তুষ্ট। তোমাকে আমি আমার জীবন-কাহিনী শোনাতে চাই।'

'যখনই বলবে আমি উপরে চলে যাব'– মুসলমান গোয়েন্দা বলল– 'বললে সারাটা রাত তোমার সঙ্গে আমি উপরে বসে থাকব।'

ইবনে সামের তাকে একটা সময় বলল, যখন যাত্রীরা সবাই আপন-আপন জায়গায় শুয়ে পড়ে, মানুষের হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যায় এবং ছাদে কেউ ওঠে না। মুসলমান বলল, ঠিক আছে; আমি এসে পড়ব।

ইবনে সামের ও তার বন্ধুরা খুব খুশি হলো এবং মুসলমান গোয়েন্দাকে নদীতে নিক্ষেপ করার আয়োজন সম্পন্ন করে প্রস্তুত হয়ে রইল।

সেরাতে জাহাজ প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করে ফেলেছে। মুসলমান গোয়েন্দা নির্ধারিত সময়ে ছাদে উঠে গেল। পরক্ষণেই ইবনে সামেরও তার কাছে পৌঁছে গেল। যাত্রীরা নিচে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছাদে এক আছে ইবনে সামের আর আছে মুসলমান গোয়েন্দা। আরও দু-তিনজন লোক আলাদা একজায়গায় রেলিংয়ের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জোৎস্না রাতে সমুদ্রের নজরকাড়া দৃশ্য উপভোগ করছে।

একদিকে দিগন্তে বিজলি চমকাচ্ছে। আকাশে মেঘ জমছে। বাতাস একদম ঝিম মেরে আছে। একেবারে থমথমে অবস্থা। জাহাজের পাল একটা সাধারণ কাপড়ের মতো ফড়ফড় করছে, যার ফলে জাহাজের গতি একদম থেমে আছে।

ইবনে মুসলমান গোয়েন্দার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনই রেলিং ধরে চাঁদের আলোয় ঝলমল করা নদীর সুষমা উপভোগ করতে লাগল। তারপর তারা আকাশের দিগন্তে দ্রুত উঠে আসা মেঘের প্রতি তাকাল। দেখতে-না-দেখতে মেঘমালা চাঁদটাকে ঢেকে ফেলল। ইবনে সামেরের বন্ধুদ্বয়ও ছাদে উঠে এসেছে। তারা ধীরে-ধীরে ইবনে সামের ও মুসলমান গোয়েন্দার কাছে এগিয়ে আসছে।

ইবনে সামের সময়টা বেশ যুৎসই নির্বাচন করেছিল। সেইসঙ্গে মেঘরাশি তাকে বাড়তি একটু সহযোগিতা করল যে, চাঁদটাকে ঢেকে রাতটাকে ঘোর অন্ধকার বানিয়ে দিল। এবার তিনজনের পক্ষে মুসলমান গোয়েন্দাকে তুলে নদীতে ফেলে দেওয়া একদম সহজ হয়ে গেছে। তাদের এই অপকর্মটা দেখবার মতো কোনো লোক ধারে-কাছে নেই।

ইবনে সামেরের বন্ধুরা কাছে এসে পৌঁছলে হঠাৎ তীব্র বায়ু ছুটতে শুরু করল। সবাই অনুভব করল, বাতাস স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা। তিনজন চোখাচুখি করল। তার মানে, আর বিলম্ব না করে কাজটা এখনই সমাধা করে ফেলা দরকার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা তাদের শিকারটাকে মেরে ফেলবে বলে।

'ও হে ভাইয়েরা!'– তারা খানিক দূর থেকে হাঁক শুনতে পেল– 'যে যেখানে আছ, এখনই নিচে চলে আসো। ঝড় আসছে। নাহয় নদীতে পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি এসো; নিচে চলে যাও।'

সবাই ওদিকে ফিরে তাকাল। জাহাজের দু-তিনজন কর্মচারী এদিক দৌড়ে আসছে। তাদের একজন এদের নিচে চলে যেতে বলল। এরা জায়গা থেকে সরে ধীরে-ধীরে হাঁটতে লাগল। ইবনে সামের ও তার বন্ধুরা দেখল, জাহাজের কর্মচারীরে মাঝে অস্থিরতা তৈরি হয়ে গেছে। তারা ছোটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি করছে। সম্ভবত তারা সবাই উপরে উঠে এসেছে এবং পালগুলোর রশি টানতে শুরু করেছে।

অল্পক্ষণ পর বাতাসে গতি আরও বেড়ে গেল এবং যথারীতি ঝড়ের রূপ ধারণ করল। তারপর এমন মুষলধারা বৃষ্টি শুরু হলো যে, উপরে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। জাহাজটা কাগজের নৌকার মতো দুলতে শুরু করল। পরক্ষণেই মনে হলো, যেন মস্ত কোনো শক্তি জাহাজটাকে উপরে তুলে-তুলে সমুদ্রপিঠে আছাড় মারছে।

যাত্রীরা জেগে উঠেছে। তারা হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে এবং একজন অপরজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কে কোথায় আছে একজনের খবর আরেকজন জানে না। দানবের মতো এক-একটা ঢেউ উঠে-উঠে জাহাজের মধ্যে আছড়ে পড়ছে।

পালগুলো নামিয়ে গুটিয়ে রাখা হয়েছে। জাহাজটা এবার ভয়ঙ্কর ঝড়ের কবলে এসে পড়ছে। মায়েরা শিশুদের বুকের সঙ্গে আগলে রেখেছে। কিন্তু জাহাজ এমনভাবে দুলছে যে, বুকে আগলে রাখা শিশুরা মায়েদের কোল থেকেও ছিটকে পড়ছে। জাহাজটা পানিতে ভরে যেতে লাগল।

যাত্রীরা হইচই করছে, চিৎকার করছে। কিন্তু ঝড়ের দাপট এত বেশি, তীব্র যে, তার শোর এতগুলো যাত্রীর সম্মিলিত চিৎকারকে ছাপিয়ে ফেলছে। নিজেদের চিৎকারের শব্দ নয়– প্রবল ঝড়ের চিৎকারই সবার কানে বাজছে। ঝড়ের এই চিৎকার গগনবিদারী, হৃদয়বিদারী। জাহাজ জাহাজচালকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। বিপুলসংখ্যক যাত্রীবাহী এই নৌযানটা নিজেকে প্রবল ঝড় আর ঝড়বিক্ষুব্ধ সাগরের করুণার উপর ছেড়ে দিয়েছে। এবার শব্দ-সাড়া যা কানে আসতে লাগল, তার অর্থ হলো, যেন কারও কোনো আপনজন নদীতে পড়ে গেছে।

যাত্রীরা একজন-দুজন করে নদীতে ডুবে যেতে শুরু করেছে।

ঝড় জাহাজটাকে কূলের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। কিন্তু জাহাজের মধ্যে এতখানি পানি ঢুকে পড়েছে যে, এখন যেকোনো মুহূর্তে জাহাজটা ডুবে যাবে।

ঝড়ের গতি প্রতি মুহূর্তেই তীব্র-থেকে-তীব্রতর হচ্ছে। এবার জাহাজ এক দিক থেকে ডুবে যেতে লাগল। একজায়গা থেকে জাহাজের তিন-চারটা তক্তা খুলে গেছে এবং সেদিক দিয়েই পানি ঢুকতে গিয়ে জাহাজটা কাত হয়ে গেছে। যাত্রীরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহাজটা পুরোপুরি তলিয়ে গেল।

* * *

রাত পোহানোর পর দেখা গেল, কয়েক টুকরা মেঘ আকাশে ঘুরে ফিরছে। তাদের মাঝে একধরনের নিষ্পাপতার ছাপ। নদীটা শান্ত , যেন রাতে তার মাঝে কোনো অঘটনই ঘটেনি। অথচ এই নদীটা-ই না-জানি কত ক্ষনিকের মধ্যে কত মায়ের বুক খালি করেছে! কত নারীকে বিধবা করেছে! কত শিশু-কিশোরকে পিতৃ-মাতৃহারা করেছে! কত আদমসন্তানকে মুহূর্তের মধ্যে আপন পেটে পুরে হজম করেছে!

কূলে খানিক দূরে-দূরে কিছু মানুষ চোখে পড়ল। তাদের কয়েকজন এমনভাবে পড়ে আছে, যেন তারা চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে। আবার কতক পা টেনে-টেনে হাঁটছে। এরা সেই কজন ভাগ্যবান মানুষ, যারা ঝড়ের থাবা আর সলিল-সমাধি থেকে রক্ষা পেয়ে কূলে এসে পৌঁছেছে। এরা সাঁতার জানত। ঝড় তাদের উপর এটুকু দয়া করেছে যে, জাহাজটাকে কূলের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। কিন্তু জাহাজ যেখানটায়

নিমজ্জিত হলো, সেখানটায় নদী অনেক গভীর ছিল। কেবল ভাগ্যবান সাঁতারুদের পক্ষেই সেখান থেকে উঠে আসা সম্ভব ছিল। এরা কজন সেই কজন ভাগ্যবান পুরুষ।

এখন দিনের শেষ প্রহর। তিন ব্যক্তি কূল থেকে বেশ দূরে একজায়গায় এসে-এসে সমবেত হলো। লোকগুলোকে আরবি বলে মনে হলো। উক্ত অঞ্চলের বসতিগুলো সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত। এটা যে জিদ্দা ও মদিনার মধ্যবর্তী অঞ্চল, তাও তাদের জানা।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এরা তিনজন নদী থেকে উঠে এসেছে। মাইলতিনেক পথ অতিক্রম করার পর তারা দেখতে পেল, একলোক পথের একধারে মাথাটা দুই হাঁটুর উপর রেখে বসে আছে, যেন বসে-বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা লোকটা কোনো কষ্টে আছে। এরা তিনজন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কারও আগমন টের পেয়ে লোকটা মাথা তুলে একজন-একজন করে তাদের পানে তাকাল এবং তিনজনের একজনকে চিনে ফেলল। এই লোকটি সেই মুসলমান গোয়েন্দা, ইবনে সামের ও তার সাথীরা যাকে নদীতে ফেলে দিতে ছাদে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা ঝড় এসে তাদের পরিকল্পনাটা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল।

মুসলমান গোয়েন্দা যাকে চিনল, সে হলো ইবনে সামের।

'তুমি ভাগ্যবান ইবনে সামের!' মুসলমান গোয়েন্দা বলল– 'এমন ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্র থেকে উঠে আসতে পারা সৌভাগ্য নয় তো কী! তোমাদের সঙ্গে একটা সুন্দরী যুবতী মেয়ে ছিল; ও কি পানিতে ডুবে গেছে?'

'না বন্ধু!'– ইবনে সামের উত্তর দিল– 'ও আমার স্ত্রী ছিল। সমুদ্রের পানিতে নয়– ও মরুভূমির বালিতে ডুবে গেছে।'

'বুঝেছি ইবনে সামের!'– মুসলমান গোয়েন্দা বলল– 'ও সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এখানে এসে মারা গেছে আর তুমি তাকে বালিতে পুতে রেখেছ। কোথায় পুতেছ?'

'তুমি কিছুই বুঝতে পারনি ভাই!'– ইবনে সামের বলল– 'তোমাকে আমি কী বলব, আমার উপর দিয়ে কেমন ঝড় বয়ে গেছে!'

'ইবনে সামের!'– মুসলমান গোয়েন্দা বলল– 'এবার নিজের ব্যাপারে আমি তোমাকে কিছু সঠিক কথা বলতে চাই। তোমাকে বলেছিলাম, আমি খ্রিস্টান। আমি খ্রিস্টান নই– মুসলমান। আমার নাম মাসউদ সুহাইলি মক্কি। এখন তুমি আমার দেশে আছ। আমি এখারে তোমাকে একা ফেলে যাব না।'

মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার দুই সাথী ইবনে সামেরের পাশে বসে পড়ল। মাসউদ বলল, এবার বলো, তোমার কী বলবার আছে আর তোমার উপর উপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গেছে?'

ইবনে সামেরের অবশ্যই মনে পড়ে থাকবে, এই লোকটিকে সে হত্যা করতে জাহাজের ছাদে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাসউদ তার সেই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানত না। এখনও পর্যন্ত জানে না। ইবনে সামের মনে-মনে ভাবল, এই মুসলমানদের থেকে কোনো সদাচারের আশা রাখা উচিত হবে না। এটা তার ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষেরই এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার সাথীরা আগ্রহ নিয়ে পাশে বসে পড়ায় নিজের আসল ঘটনা শুনিয়ে দিল।

বলল, জাহাজটা যখন ডুবতে শুরু করল, তখন আমি ও আমার দুই বন্ধু নদীতে লাফিয়ে পড়লাম। আমার সবচেয়ে বেশি লক্ষ ছিল আইনির প্রতি। মনে-মনে এমনও সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম, আইনি যদি ডুবে যায়, তার সাথে আমিও ডুবে মরে যাব। সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে আমি আইনিকে ডাকতে লাগলাম। সেও সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল। কিন্তু সমুদ্রে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তার অনুসন্ধানে আমি এদিক-ওদিক সাঁতরাতে লাগলাম। ভাগ্য ভালো যে, আমি তাকে অল্পতেই পেয়ে গেলাম। দেখলাম, আমারই এক বন্ধু তাকে পিঠে করে সাঁতার কেটে কূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওখানে ঝড়ের শোর-চিৎকার ছিল এবং ফুলে-ওঠা সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ ছিল। আমার কানে আওয়াজ এল, বন্ধুটি আমাকে হাঁক দিয়ে বলছে, তুমি আইনির চিন্তা করো না; ওকে আমি নদীর করাল গ্রাস থেকে বের করে নিয়ে কূলে উঠব। আমি নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হলাম এবং কূলে উঠতে নদীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেলাম। সৈনিক হওয়ার সুবাদে সাঁতার আমার ভালোই জানা আছে। এই বিদ্যায় আমার বেশ দক্ষতা আছে।

সমুদ্রের তরঙ্গমালা আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। ঢেউয়ের গতি ছিল কূলের দিকে। ঢেউগুলো কূলের সঙ্গে আছাড় খেয়ে-খেয়ে ফিরে আসছিল। এভাবে ঢেউ আমাদের কূলে নিয়ে ছুড়ে দিল। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের দৈহিক শক্তি এতই শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। অবশ্য কিছুক্ষণ পর থেকে দেহে শক্তি ফিরে আসতে শুরু করল এবং আমরা হাঁটার শক্তি ফিরে পেলাম। কিন্তু তখন আমরা কোথায় এবং আমাদের গন্তব্যইবা কোন জায়গায় তার কিছুই আমাদের জানা ছিল না। আমাদের মতো আরও দু-একজন যাত্রী কূলে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছিল। তারা আমাদের জানাল, এটা আরবের উপকূল এবং শাম এখান থেকে বহুদূর।

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম এবং রাত এসে পড়ল। আমরা অনেকখানি পথ অতিক্রম করে ফেলেছিলাম। কিন্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত জনবসতির কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। রাতে আমরা একটা জায়গায় শুয়ে পড়লাম। আইনি আমার স্ত্রী ছিল। সেজন্য আমরা দুজন খানিক দূরে সরে গিয়ে আলাদা শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তি আমার

শরীরগুলোকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল। তাই শোওয়ামাত্রই রাজ্যের ঘুম এসে আমাদের চোখগুলোকে জড়িয়ে ধরল। আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

মধ্যরাতের খানিক আগে আমি কিছু একটা হট্টগোলের শব্দ শুনতে পেলাম। তাতে আমার চোখ খুলে গেল। চাঁদনি রাত ছিল। ফলে অনেক দূর পর্যন্ত ভালোমতোই দেখা যাচ্ছিল। সজাগ হয়েই দেখলাম, আইনি আমার বাহুতে নেই এবং একটু দূরে খানিক আড়ালে আমার বন্ধুদ্বয় তার সঙ্গে অসদাচরণ করছে। আমার যে-বন্ধুটি পিঠে করে তাকে নদী থেকে বের করে এনেছিল, ও তাকে নিচে ফেলে রেখেছে এবং তাকে নগ্ন করার চেষ্টা করছে। অপরজন তার হাতদুটা শক্ত করে ধরে রেখেছে।

আমি দৌড়ে ওখানে পৌঁছে গেলাম। প্রথমে একজনকে একটা ঘুসি মেরে ফেলে দিলাম। তারপর অপরজনকে সজোরে লাথি মেরে আইনিকে বাহুতে ধরে তুলে দাঁড় করালাম। আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না যে, আমার বন্ধু হয়ে এরা আমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভ্রম ও মর্যাদার উপর এমন অপরাধমূলক আক্রমণ চালাচ্ছে! আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, এরা তো ধর্মের জন্য পাগলপারা ছিল; এখন এরা এমন হলো কী করে!

'দূরে দাঁড়িয়ে থাকো ইবনে সামের!'– আমার এক বন্ধু বলল– 'আমি একে সমুদ্র থেকে বের করে এনেছি আর এই বন্ধু আমাকে সহযোগিতা করেছে। এখন এর উপর আমাদেরও অতটুকু অধিকার আছে, যতখানি আছে তোমার।'

আমি আইনিকে আমার পিছনে নিয়ে নিলাম এবং বন্ধুদের উদ্দেশ করে বললাম, তোমরা তো ধর্মের অনুসারী মানুষ! কিন্তু তোমরা যা করছিলে, তা তো শয়তানি কর্ম। আমরা একটি পবিত্র মিশন নিয়ে এ দেশে এসেছি।

কিন্তু আমার কোনো কথা-ই আমার বন্ধুদের উপর ক্রিয়া করল না। তারা বলপ্রয়োগের পর্যায়ে নেমে এল এবং আমাকে হুমকি-ধমকি দিতে শুরু করল। অবশেষে একবন্ধু বলল, শুধু এই একটা রাতের জন্য একে আমাদের হাতে তুলে দাও; তারপর তোমার স্ত্রী তোমারই থাকবে।

কিন্তু আমি এই প্রস্তাবও মানতে রাজি হলাম না। এ তো মানার মতো কোনো প্রস্তাব নয়। নিজের স্ত্রীকে কেউ অন্যের সঙ্গে রাত কাটাতে দেয় নাকি!

'তোমাদের দুজনের উপর শয়তান জয়ী হয়ে গেছে'– আমি বললাম– 'শয়তানে দেমাগ ঠিক করার কৌশল আমার জানা আছে। বলেই আমি এগিয়ে গিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমাদের কারও কাছেই অস্ত্র ছিল না। অন্যথায় আমরা সবাই রক্তাক্ত হয়ে যেতাম এবং কেউ-না-কেউ খুনও হতাম। আমার দুই বন্ধু

আমার উপর পালটা আক্রমণ চালাল এবং অনবরত আমাকে কিল-ঘুসি ও লাথি মারতে থাকল।

আমি তাদের মোকাবেলা করে চললাম। কিন্তু তারাও ছিল যুবক ও শক্তিশালী। আইনি অল্প বয়সের একটা মেয়ে। ও আমার কোনো সাহায্য করতে পারছিল না। ফলে একধারে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের মারামারি দেখতে থাকল। ওদের কাছে যদি অস্ত্র থাকত, তাহলে আমাদের ওরা মেরেই ফেলত।

তারা দুজনে মিলে আমাকে কাবু করে ফেলল এবং খুব পেটাল। আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। তারপরও তারা আমাকে পেটাল, যাতে আমি আর উঠে দাঁড়াতে না পারি।

পরে যখন আমার হুঁশ ফিরে এল, তখন আমার মনে হলো, যেন শরীরের কয়েক জায়গা থেকে আমার হাড়গোড় ভেঙে গেছে। মাথাটা তখনও চক্কর দিচ্ছিল। আমি অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু মনে হলো, পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ততক্ষণে রাত পোহায়ে ভোর হয়েছে এবং আমাশে সূর্য উদিত হয়েছে। আমি চার দিকে তাকালাম। সামনে বিশাল-বিস্তৃত একটা মরুভূমি। কোথাও আইনির নাম-চিহ্নও দেখতে পেলাম না। বুঝে ফেললাম, আমার আইনিকে নিয়ে ওরা এখান থেকে চলে গেছে।

আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এখন আমি কী করব এবং কোন দিকে যাব। আমি হাঁটতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই বসে পড়লাম। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। আমি দুই হাঁটুর উপর মাথাটা রেখে এই তিক্ত বাস্তবতাকে মানসিকভাবে বরণ করে নিতে চেষ্টা শুরু করলাম। আমার বন্ধুরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেছে। আইনিকে আমি আর পাব না।

মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার বন্ধুরা ইবনে সামেরকে তার এই তিক্ত ভাবনার জগত থেকে জাগিয়ে তুলল।

'মাসউদ ভাই!'– ইবনে সামের বলল– 'তোমাদের প্রতি আমার এই আশা রাখা উচিত হবে না যে, তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। তুমি বলেছিলে, আমি এখন তোমাদের দেখে আছি আর আমাকে তুমি একলা ফেলে যাবে না। আমি কি ধরে নেব, তোমরা আমাকে সব ধরনের সাহায্য দেবে? নাহ; করবে না! এটা হয় না। আমি খ্রিস্টান আর তোমরা মুসলমান। তোমরা কেন আমাকে সাহায্য করবে?

'আমি মুসলমান ইবনে সামের!'– মাসউদ ইবনে সুহাইল বলল– 'ইসলামের অনুসারী আমি। তোমার ধর্ম যা-ই হোক; তুমি মানুষ এবং বিপদগ্রস্ত। ইসলাম আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি তোমাকে সাহায্য করব। এটা আমার অবশ্যকর্তব্য। ইসলামের এই বিধানটিও তুমি মাথায় রেখো যে, যেকথাটি তোমার মুখ থেকে

বেরিয়ে গেছে, তা তোমাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। আমি আর আমার এই বন্ধুরা তোমাকে সাহায্য দেব। আসলে তোমার বউটা এতই রূপসী ছিল যে, তার রূপই তাকে তোমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন তুমি শান্ত হও, ধৈর্যের পরিচয় দাও।

* * *

ইবনে সামের উঠে দাঁড়াল। মাসউদ সুহাইলি ও তার সাথীরাও উঠে গেল। তারা প্রথমে ওখানকার মাটি পরীক্ষা করে দেখল। কিছু মানুষের সংঘাত-সংঘর্ষের সুস্পষ্ট আলামত দেখা যাচ্ছে। মাসউদ একদিকে তাকাল এবং কাউকে সাথে না নিয়ে একাই ওদিকে হাঁটতে শুরু করল। ইবনে সামেরের দুই বন্ধুর ও আইনির পদাঙ্ক দেখা যাচ্ছে। মাসউদ অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। সে দেখতে পেল, কোনো-কোনো জায়গায় পায়ের চিহ্ন এমন, যেন আইনিকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কিছু দূর গিয়ে মাসউদ ফিরে এল এবং কী দেখে এসেছে, সব তার সাথীদের জানাল। মরুভূমিকে পদচিহ্ন লুকানো যায় না এবং এই চিহ্ন ধাওয়াকারীদের খুবই স্পষ্ট ও নিশ্চয়তার সঙ্গে পথের দিশা দেয়।

'এখনও ওরা বেশি দূর যেতে পারেনি'– মাসউদের এক সাথী বলল– 'পারা সম্ভব নয়। আচ্ছা ইবনে সামের! তাদের কাছে কি পানি আছে?'

'না'– ইবনে সামের উত্তর দিল– 'পানি তাদের কাছে কোত্থেকে থাকবে? আমরা তো সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছি!'

'আসো; আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই'– মাসউদ ইবনে সুহাইল ইবনে সামেরকে বলল– 'আমাদের গন্তব্য অন্য কোথাও। কিন্তু আগে আমরা চেষ্টা করব, তোমার স্ত্রীকে খুঁজে বের করতে পারি কিনা।'

ইবনে সামের মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার বন্ধুদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু সে ঠিকভাবে হাঁটতে পারছিল না। মাসউদ ও তার এক সাথী ইবনে সামেরকে একজন ডান দিক থেকে, অপরজন বাম দিক থেকে ধরে তার দেহের বোঝা কিছুটা নিজেদের উপর নিয়ে নিল। এভাবে তারা কিছু পথ এগিয়ে গেল। সূর্য মাথার উপর উঠে এলে তার উত্তাপ ইবনে সামেরের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে দিল। এখন সে কারও সহযোগিতা ব্যতিরেকেই হাঁটতে পারছে। ইবনে সামের একজন প্রবীণ সৈনিক। তার দেহ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। বারচারেক আহত শরীর নিয়েও সে ভ্রমণ করেছে। সে তিন মুসলমানের সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

ইবনে সামেরের দুই বন্ধু ও তার স্ত্রী আইনির পদাঙ্ক খুবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই চিহ্নগুলো দেখে-দেখেই তারা চলতে থাকল এবং অনেকখানি পথ এগিয়ে গেল। সামনে মাটি খানিক রুক্ষ এবং অঞ্চলটা কোথাও নিচে নেমে গেছে আবার কোথাও উপরে উঠে গেছে এবং স্থানে-স্থানে টিলা-টিপি, যেগুলো একটা অপরটা থেকে

এমনভাবে আলাদা, যেন ওগুলো গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়ে আছে। ওখানে নিয়মতান্ত্রিক কোনো রাস্তা নেই। তারা ইবনে সামেরের বন্ধুদের পদাঙ্ক দেখে-দেখে পথ চলছে এবং দেখতে-না দেখতে অনেকখানি পথ অতিক্রম করে ফেলেছে।

এবার তারা পিপাসা অনুভব করতে শুরু করল। কিন্তু তারা সহনশীলতার পরিচয় দিল। তারা কথা বলতে-বলতে এগিয়ে যেতে লাগল এবং পদচিহ্নের নির্দেশনায় ছোট-বড় টিলা-ঢিপির গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়েও সম্মুখপানে এগিয়ে গেল।

সামনে এবার বিস্তৃত সমতল ভূমি, যার চারদিকটা যেন উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। তার মধ্যেও ছোট-বড় অনেকগুলো টিলা। সামনে উপত্যকা চোখে পড়ছে। কিন্তু তাও দেখতে ঠিক প্রাচীরের মতো।

চার পথচারী এগুতে থাকল। সম্মুখের কিনারায় পৌঁছে তারা একজন অপরজনকে ঠেস দিয়ে উপরে উঠে গেল। সবার আগে মাসউদের এক সাথী সামনে-সামনে উপরে উঠে গেল।

'আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করেছেন'– উপরে পা রেখেই এই সাথী উচ্চ আওয়াজে বলে উঠল– 'সবাই উঠে এসো। দেখো; জান্নাত আমাদের অপেক্ষা করছে।'

সবাই উপরে উঠে গেল। তারা খেজুর গাছের সারি দেখতে পেল, যার অবস্থান এখান থেকে বড়জোর দু-মাইল দূরে। ওটা যে খেজুরের বাগান, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। চরম ক্লান্তি সত্ত্বেও তারা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। সূর্যটা পশ্চিমাকাশে চলে গেছে।

খেজরের বাগান তাদের দেহগুলোতে সজীবতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তারা দেখতে পেল, খেজুরবাগানের চারধারে উঁচু বাঁধের মতো তৈরি হয়ে আছে। বাঁধটা প্রাকৃতিক, যা কিনা অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে এবং তার আকার বৃত্তের মতো। আরবের মানুষ খেজুর বাগান ও তার প্রাকৃতিক আকার-গঠন সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত। বাঁধের কাছাকাছি পৌঁছে গেলে তারা নারীকণ্ঠের চিৎকারধ্বনি শুনতে পেল।

তারা দৌড়ে বাঁধের উঠতে শুরু করল। অমনি তারা দেখতে পেল, একটা তরুণী মেয়ে নিচে নেমে আসবার চেষ্টা করছে আর দুজন পুরুষ পিছন থেকে এসে তাকে ধরে ফেলেছে। এই মেয়েটা-ই ইবনে সামেরের স্ত্রী আইনি আর পুরুষদুজন তার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু।

'পেয়েছি! পেয়েছি!'– ইবনে সামের চিৎকার দিয়ে বলে উঠল– 'ও-ই আমার স্ত্রী আইনি।'

মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার দুই সাথী দৌড়ে বাঁধের উপর উঠে গেল এবং আইনিকে ধরে ফেলল। ইবনে সামেরের বন্ধুদ্বয় বলে উঠল, এই মেয়েটা আমাদের আপনজন; কেউ একে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কারা তোমরা?

এমনি সময়ে ইবনে সামের বাঁধের উপর উঠে গেল এবং বলল, এ আমার স্ত্রী; এর নাম আইনি।

মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার সঙ্গীরা খঞ্জর বের করে হাতে নিল। ইবনে সামেরের বন্ধুদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। মাসউদ ইবনে সুহাইল তাদের বলল, তোমরা এখানেই বসে পড়ো। একটুও নড়াচড়া কর যদি তাহলে খুন করে ফেলব।

তারা বসে পড়ল। মাসউদ ইবনে সুহাইল আইনিকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

'বলো মেয়ে!'– মাসউদ ইবনে সুহাইল আইনিকে উদ্দেশ করে বলল– 'আমাদের বলো এরা তোমার সঙ্গে কী আচরণ করেছে?'

আইনি বলল, গত রাতে এরা আমাকে টেনে আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল এবং আমার প্রতি হস্তক্ষেপ করেছিল। তারপর সে সেই কাহিনী শোনাল, যা ইবনে সামের তাদের শুনিয়েছিল। শেষে বলল, এখানে এনে এরা আমার ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে, আমার সম্ভ্রম ছিনিয়ে নিয়েছে।

মাসউদ ইবনে সুহাইল তার বন্ধুদের প্রতি তাকাল। একজন বলল, এই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুর চেয়ে কম কিছু হতে পারে না। শুনেই ইবনে সামেরের বন্ধুরা অনুনয়-বিনয় শুরু করে দিল। কিন্তু মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার সঙ্গীরা মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্তে অটল রইল। তারা একজনকে ধরে চিত করে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তার পা ও বাহুদটো চেপে ধরল। মাসউদ ইবনে সুহাইল তার খঞ্জরটা আইনির হাতে দিয়ে বলল, এই বুকটা সই করে তোমার সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে এই খঞ্জর দ্বারা আঘাত করো। তারপর এর পেটটা চিড়ে ফেলো।

আইনি ছিলও ওদের প্রতি চরম ক্ষুব্ধ। এবার প্রতিশোধ নেওয়ার উপযুক্ত মওকা পেয়ে গেল। খঞ্জরটা হাতে নিয়ে মাসউদ ইবনে সুহাইলের শেখানো পন্থায় লোকটার উপর আঘাত হানল। তারপর অপরজনকেও একইভাবে আইনিকে দিয়ে হত্যা করাল।

ক্ষোভে আইনি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। ফলে লোকদুটোর পেটে ও পিঠে উপর্যুপরি খঞ্জরের আঘাত হানতে থাকল। শেষে তাদের চোখেও আঘাত হানল। শেষমেষ যদি তাকে ধরে না ফেলা হতো, তাহলে সে খঞ্জর মারতেই থাকত। পরে হাত থেকে খঞ্জরটা ফেলে দিয়ে সে ইবনে সামেরকে জড়িয়ে ধরল এবং অঝোরে কাঁদল।

অভিযান শেষ করে, অপহৃতাকে উদ্ধার করে এবার তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তৃপ্তিভরা চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। দেখল, চারদিকে পানি আর পানি। সবাই দৌড়ে বাঁধ থেকে নেমে এল এবং আজলাভরে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করল। ওখানে অনেকগুলো খেজুরগাছ ছিল। আগার দিকে তাকিয়ে দেখল, গাছে-গাছে ফলের সমাহার। প্রতিটি গাছে থোকা-থোকা খেজুর ঝুলে আছে। কিছু খেজুর গাঢ় বাদামি রং ধারণ করেছে। তবে বেশিরভাগ খেজুর এখনও কাঁচা। মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার সাথীরা তিনজন তিনটা গাছে উঠে গেল।

তারা খেজুরের থোকা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নিচে ফেলতে লাগল। তারপর তারা নিচে নেমে খেজুরগুলো পরিষ্কার করার জন্য কিছু সময় পানিতে ভিজিয়ে রাখল। তারপর খেতে শুরু করল। কাঁচা-পাকা সবগুলো খেজুর তারা খেয়ে ফেলল। ক্ষুধা তাদের বেহাল করে তুলেছিল।

* * *

এরই মধ্যে সূর্য অস্তমিত হয়েছে। তারা ওখানেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। ক্ষুধা, পিপাসা আর একটানা পথচলায় তাদের শরীরগুলো ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছিল। সূর্য অস্ত গেলে মাসউদ ইবনে সুহাইলের এক সাথী আযান দিল। তারপর মাসউদ ইবনে সুহাইলের ইমামতে তারা তিনজন মাগরিবের নামায আদায় করল। ইবনে সামের ও আইনি তাদের দেখতে থাকল। ঈশার সময় আবারও একজন আযান দিল। তারপর জামাতের সাথে নামায আদায় করল। তারপর তারা তিনজন একজায়গায় শুয়ে পড়ল।

ইবনে সামের ও আইনি তাদেরই কাছাকাছি একজায়গায় শুতে গেলে মাসউদ ইবনে সুহাইল ইবনে সামেরকে বলল, তোমরা স্বামী-স্ত্রী; কাজেই তোমরা দুজন দূরে আলাদা কোথাও গিয়ে ঘুমোও। তারা উঠে গেল এবং মাসউদ ইবনে সুহাইলদের থেকে দূরে গিয়ে একজায়গায় শুয়ে পড়ল।

আইনি এতখানি সন্ত্রস্ত ছিল যে, ভয়ে তার চোখে ঘুম আসছিল না। ইবনে সামেরের কিছুটা ভয়-ভয় লাগছিল। ওই মুসলমান লোকগুলোকে সে কতখানি বিশ্বাস করবে কিছুই তার বুঝে আসছিল না। কে জানে, এই রাতটা কি নিরাপদে কাটে, নাকি নতুন কোনো বিপদ এসে হানা দেয়!

'ওই লোকগুলোর উপর কি তোমার ভরসা আছে?' আইনি ইবনে সামেরকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি কিছুই বুঝতে ও বলতে পারছি না'– ইবনে সামের উত্তর দিল– 'আমার আক্ষেপ লাগছে, আমি যখন নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম, তখন আমার হাতে কোনো

অস্ত্র ছিল না। আমি নিরস্ত্র। তবে তুমি চিন্তা করো না। যদি এমন কিছু ঘটেই যায়, তাহলে আমি ওদের থেকে খঞ্জর ছিনিয়ে আনতে চেষ্টা করব।'

'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো না ইবনে সামের! সজাগ থাকো।' আইনি ধরা গলায় বলল।

ঘুম ইবনে সামেরকে জড়িয়ে ধরছিল। কিন্তু সে চেষ্টা করে যাচ্ছে, যাতে ঘুম তাকে কাবু করতে না পারে। তার অনুভূতি আছে, আইনির তরুণী মেয়ে এবং সীমাহীন রূপসীও। সমধর্মী ভাইয়েরা যদি তার সঙ্গে এই আচরণ করতে পারে, তাহলে এরা তো ভিন্নধর্মী মুসমান। এদের উপর আস্থা রাখি কী করে!

দুজন জোর করে সজাগ থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিন মুসলমান ইতিমধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ঘুমের সঙ্গে লড়াই করে আধা রাত অতিবাহিত করার পর এবার ইবনে সামের হার মানতে বাধ্য হলো। ঘুম তাকে ঝাপটে ধরে কাবু করে ফেলল। ইবনে সামের গভীর ঘুম ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ এমন কিছু শব্দ কানে এল, যেন কতগুলো মানুষ পরস্পর লড়াই করছে এবং শোরগোলও চলছে। ইবনে সামের ও আইনি ঘাবড়ে গিয়ে উঠে বসল এবং ভয়জড়িত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। সবার আগে তারা মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার সাথীদের প্রতি তাকাল। তারা এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এই শোরগোল তাদের জাগাতে পারেনি। ইবনে সামেরের সন্ত্রস্ত চোখ খেজুর বাগানের বাঁধের উপর গিয়ে পড়ল তো ওখানে চাঁদের আলোতে কয়েকটা মরুশিয়াল দেখতে পেল। ওরা তার বন্ধুদের মরদেহদুটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এবং লাশদুটো খাবলে খাচ্ছে।

ইবনে সামের ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চোখ ফিরিয়ে আনল এবং নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। দুজনে পুনরায় শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর তারা আযানের শব্দ শুনতে পেল এবং সজাগ হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখল, মাসউদ ইবনে সুহাইলের এক সাথী বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আযান দিচ্ছে আর অপর সাথী পানির কাছে বসে উজু করছে।

'ঘুমিয়ে পড়ো আইনি!'– ইবনে সামের বলল– 'ওরা তিনজন নামায পড়বে।'

দুজনে আবারও ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর মাসউদ ইবনে সুহাইল এসে তাদের জাগিয়ে তুলল এবং বলল, রওনার সময় হয়ে গেছে। যদি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও, তাহলে উঠে আসো।

'আমি একলা তো আর কোথাও যাব না'– ইবনে সামের বলল– ' তোমাদের গন্তব্য পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যাব; তারপর সামনের দিকে এগিয়ে যাব।'

'তোমরা যাবে কোথায়?' মাসউদ জিজ্ঞেস করল।

ইবনে সামের তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর না দিয়ে আইনির প্রতি তাকাল এবং মাথাটা অবনত করে ফেলল। তারপর মাসউদ ইবনে সুহাইলের পানে তাকাল। মনে হলো, মাসউদ ইবনে সুহাইলের প্রশ্নের সঠিক উত্তর তার জানা নেই। মাসউদ প্রশ্নটা আবারও করল। ইবনে সামের এবারও মাথাটা নত করে ফেলল।

'গন্তব্যের ঠিকানা জানা নেই কি তোমার?' মাসউদ ইবনে সুহাইলের এক সাথী জিজ্ঞেস করল।

'না'– ইবনে সামের উত্তর দিল– 'গন্তব্যেরও ঠিকানা নেই আর লক্ষ্য সম্পর্কেও কোনো সংশয় নেই।'

'আমরা তোমাকে বাধ্য করব না'– মাসউদ বলল– 'ইচ্ছে হলে তোমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করো। মনে হয় এই অঞ্চল সম্পর্কে তোমাদের জানাশোনা নেই। আমাদের সঙ্গ যদি তোমাদের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা তোমাদের সঙ্গে রাখব। যদি না হয়, তাহলে এখানেই তোমাদের বিদায় জানাব।'

'তোমাদের আচরণে আমি এত বেশি প্রভাবিত হয়েছি যে, মন চাচ্ছে, আমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা সব তোমাদের বলে দিই'– ইবনে সামের বলল– 'আমি একজন কট্টর খ্রিস্টান। খ্রিস্টবাদ ও খ্রিস্টধর্মের কোনো অনুসারীর বিরুদ্ধে একটা কথাও আমি সহ্য করতে পারতাম না। কিন্তু আমার এই দুই বন্ধু আমার বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। তারাও পাক্কা খ্রিস্টান ছিল। আমাদের অন্তর দুটা জাতির ঘৃণায় পরিপূর্ণ ছিল। এক হলো রোমান আর হলো মুসলমান। আমি কিবতি খ্রিস্টান। আমাদের নেতা হলেন বিনয়ামিন।'

'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ'– মাসউদ ইবনে সুহাইল বলল– 'জাহাজে আমাকে খ্রিস্টান মনে করে তুমি তোমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যর কথা ব্যক্ত করেছিলে। আমার মনে পড়ে গেছে, তোমরা শাম যাচ্ছিলে। কিন্তু ঝড় তোমাদের গন্তব্য থেকে অনেক দূরে এখানে এনে ফেলেছে। তোমরা শামের খ্রিস্টানদের দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে যাচ্ছিলে।

'হ্যাঁ'– ইবনে সামের বলল– 'আমি এ লক্ষ্যেই শাম যাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন আর যাব না।'

'কেন?'– মাসউদ ইবনে সুহাইল জিজ্ঞেস করল– 'এখন কেন যাবে না? যদি মনে ভয় ধরে গিয়ে থাকে, আমরা তোমাকে হত্যা করে ফেলব, তাহলে এই ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। আমি তোমাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিচ্ছি। আমরা তোমাকে কিছুই বলব না। স্ত্রীকে সাথে নিয়ে তুমি চলে যাও। আমরা মদিনা যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঝড় জাহাজটাকে আমাদের বন্দর পর্যন্ত পৌছতে দিল না এবং এখানে নিয়ে এল।

তোমরা আমাদের সঙ্গে মদিনা চলো। ওখান থেকে আমরা তোমাদের শামের পথে তুলে দেব।'

ওখান থেকে মদিনা অনেক দূর। মাসউদ ও তার সাথীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। রাতে তারকা আর দিনে সূর্য দেখে তারা দিঙ্‌নির্ণয় করতে পারে। তা ছাড়া মরুভূমির ভেদ-রহস্যও তাদের জানা আছে।

ইবনে সামের মূলত মনোবল হারিয়ে ফেলেছে, যার ফলে তার পরিকল্পনা ও ধর্মানুরাগ সবই প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। মাসউদ ও তার সাথীরা সম্ভবত তার এই অবস্থাটা বুঝে ফেলেছে। তাই তাকে তাদের সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইবনে সামের তার মনের সব কথা তো মাসউদ ও তার সাথীদের বলেই দিয়েছে। মাসউদ ইবনে সুহাইল তাকে সঙ্গে নিয়ে নিল।

সফরের পরবর্তী রাতটাও খোলা নীল আকাশের তলে কাটাতে হলো। ইবনে সামের আইনিকে নিয়ে আজও আলাদা একস্থানে শয়ন করল। এ রাতটাও তারা ভয়ে-ভয়ে কাটাল। তাদের বোধহয় এখনও বিশ্বাস জন্মায়নি, এমন কোনো উন্নত চরিত্রের মানুষও থাকতে পারে, যে এমন হৃদয়কাড়া একটা রূপসী মেয়েকে উপেক্ষা করতে পারে। ইবনে সামেরের অপারগতা হলো, সে একা আর যাদের নিয়ে তার এই শঙ্কা, তারা তিনজন।

তার আশঙ্কায় যুক্তি ছিল বটে; কিন্তু এ রাতটাও তাদের নিরাপদে কেটে গেল।

তারপর যে-রাতটা এল, সেটা কাটল একটা লোকালয়ের কাছে। ওখান থেকে তাদের পানাহারের ব্যবস্থা হয়ে গেল, যার ফলে তাদের বাকি সফর সহজ হয়ে গেল।

তারপর আরও দুটা রাত এল এবং এই রাতগুলোও খোলা আকাশের তলে অতিবাহিত হলো। এবার ইবনে সামেরের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেছে। সে দেখছিল, এরা তিনজন আইনির প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এরা জামাতের সঙ্গে নামায পড়ছে আর মাসউদ ইবনে সুহাইল তাদের ইমামত করছে। মাসউদ ইবনে সুহাইলের সবটুকু মনোযোগ ইবনে সামেরের প্রতি নিবদ্ধ। খুটিয়ে-খুটিয়ে ইবনে সামেরের বুক থেকে তথ্য বের করে আনার প্রাণপণ চেষ্টায় রত সে। ইবনে সামের এখন মিশর, মিশরের কিবতি খ্রিস্টান ও রোমান বাহিনী সম্পর্কে এমন ধারায় কথা বলছে, যেন সে মুসলমান এবং মিশরের উপর মুসলমানদের সেনা-অভিযানের পক্ষে। একদিন সে ইবনে মাসউদকে পরিষ্কার ভাষায় বলল, রোমান বাহিনীতে এখন সেই শক্তি নেই, যা এককালে ছিল। শামের দীর্ঘ লড়াই, একের-পর-এক পরাজয় ও পিছুহটা এই বাহিনীটার দম নাকের আগায় এনে দিয়েছে। ইবনে সামের আরও জানাল, এর অর্থ এই নয় যে, আক্রান্ত হলেই বাহিনীটা

অস্ত্রত্যাগ করে ফেলবে। তার সেনাপতি তাকে আগেকার রোমান ফৌজ বানানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মুসলমানদের কৃতিত্ব ও দুর্বলতা সবই দেখে নিয়েছে।

ইবনে সামের অবশেষে মদিনায় পৌঁছে গেল। তার মনের কোনো কথা-ই এখন আর এই তিন মুসলমান থেকে গোপন নেই। মদিনা পৌঁছে মাসউদ ইবনে সুহাইল তাকে জিজ্ঞেস করল, বলো, কোথায় যাবে?

'কোথাও না'– ইবনে সামের কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই উত্তর দিল– 'আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। এখানে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করব।'

'চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নাও ইবনে সামের!'– মাসউদ ইবনে সুহাইল বলল– 'তোমাদের উপর আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলাম গ্রহণ না করলেও আমি তোমাদের সেখানে পৌঁছিয়ে দেব, যেখানে তুমি যেতে চাও।'

'মাসউদ ভাই!'– ইবনে সামের গম্ভীর গলায় বলল– 'আসল কথা হলো, আমি তোমাদের তিনজনের চরিত্রে প্রভাবিত হয়েছি। তোমাদের আচরণে আমি যারপরনাই অভিভূত। আমি শুনেছিলাম, আরবের মানুষ অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত ছিল আর ইসলাম এসে তাদের লাঞ্ছনাময় জীবন থেকে বের করে মানবতার উঁচু মাকামে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যার স্বরূপ আমি নিজচোখে দেখলাম। এখন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আইনি যদি একা তোমাদের সঙ্গে থাকত, তবুও তার সঙ্গে তোমরা সেই আচরণ করতে না, যেমনটা আমার সমধর্মী বন্ধুরা করেছে।'

মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার সাথীরা ইবনে সামের ও তার স্ত্রী আইনিকে তাদের সালারের কাছে নিয়ে গেল এবং ঘটনার বৃত্তান্ত শোনাল। অবশেষে ইবনে সামেরের ইচ্ছার কথাও তাঁকে অবহিত করল। সালার ইবনে সামের ও আইনিকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে নিলেন এবং মাসউদ ইবনে সুহাইলেরই হাতে তুলে দিয়ে বলে দিলেন, এদের ইসলামের দীক্ষা দাও।

ইবনে সামের মিশর, রোমান বাহিনী ও কিবতি খ্রিস্টানদের যে-দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনার কথা মাসউদ ইবনে সুহাইলকে অবহিত করেছিল, মাসউদ ইবনে সুহাইল সেসব সালারের কানে দিল। এ বড়ই মূল্যবান তথ্য ছিল। তাই বোধ করি সালারও বিষয়টি আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর গোচরীভূত করে থাকবেন।

* * *

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে গুপ্তচরবৃত্তির অতিশয় বিচক্ষণ ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান ছিল। এমনটা বলা ভুল হবে যে, ইবনে সামের যদি মুসলিম গোয়েন্দা মাসউদ ইবনে সুহাইল-এর হাতে ধরা না পড়ত এবং সে তার খ্রিস্টান বন্ধুদের প্রতি বিরক্তি ও অনাস্থা তৈরি না হতো, তাহলে তার বুক থেকে কোনো তথ্যই বের হতো না আর হযরত ওমর (রাযি.) জানতেই পারতেন না, মিশরের পরিস্থিতি কেমন এবং হেরাকল-এর পরিকল্পনা কী। মাসউদ ইবনে সুহাইল ও তার দুই সাথী মিশরে গোয়েন্দাগিরি করতেই গিয়েছিল। তার আগেও অন্য গোয়েন্দাদের ওখানে পাঠানো হয়েছিল। সিপাহাসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) নিজের পক্ষ থেকেও মিশরে গোয়েন্দা পাঠিয়েছিলেন। কারণ, মিশরজয়ের চিন্তা সারাক্ষণ তাঁর মন-মস্তিষ্কের উপর চেপে থাকত এবং তাঁর পুরোপুরি আশা ছিল, আমীরুল মুমিনীন একদিন-না-একদিন অবশ্যই তাঁকে মিশর-অভিযানের অনুমতি দেবেন।

মহামারির আপদ দূর হয়ে গেছে। এই বালা মুজাহিদ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য একটি অংশকে হজম করে ফেলেছে। বাহিনীর সংখ্যার ঘাটতি পূরণের কাজ চলছে। কিন্তু আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর উৎকণ্ঠা দিন-দিন বেড়েই চলছিল। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল। মহামারির আগে তিনি আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করেছিলেন এবং যুক্তির মাধ্যমে তাঁকে মিশরকে সালতানাতে ইসলামিয়ায় যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এখন যখন মহামারির অবসান ঘটল, তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে বার্তা পাঠালেন। তাতে আবেদন জানালেন, এবার আমাকে মিশর-অভিযানের অনুমতি দিন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি)কে লিখলেন, মিশর থেকে যে-খবরাখবর পাচ্ছি, তাতে আশঙ্কা করছি, আমরা যদি আরও সময় নষ্ট করি, তাহলে হেরাকল শামের উপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বসবে কিংবা সর্বসাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী শামের খ্রিস্টান গোত্রগুলোকে বিদ্রোহের জন্য উসকে দেওয়া হবে। যদি বিদ্রোহ ঘটেই যায় আর মুজাহিদরা বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত হয়, তাহলে এই সুযোগে হেরাকল আক্রমণ করে বসবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর এমনও হতে পারে, সেই বিপর্যস্ত অবস্থায় আমরা হেরাকল-এর সেই হামলা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হব।

পিছনের বিবরণে আমরা জানতে পেরেছি, হযরত ওমর (রাযি.) মিশর-আক্রমণের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। কতিপয় সাহাবা ও সহচর তাঁর মতে একমত ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশই এই অভিযানের বিরোধী ছিলেন। এ-কারণেরই মিশর-অভিযান বিলম্বিত হতে থাকল

আর এই ফাঁকে প্রথমে দুর্ভিক্ষ এবং তার পরপরই মহামারি এসে আক্রমণ করে বসল।

এবার আমর ইবনে আস বিষয়টা পুনরায় আলোচনায় তুলে আনলে হযরত ওমর (রাযি.) বিষয়টি আগের চেয়েও বেশি গুরুত্বের সঙ্গে মাথায় নিলেন। মিশরের সর্বসাম্প্রতিক পরিস্থিতি, হেরাকল-এর অভিপ্রায় ও কিবতি খ্রিস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনিও সম্যক অবহিত ছিলেন। আমর ইবনে আস যে-যুক্তি উপস্থাপন করলেন এবং যে-আশঙ্কা ব্যক্ত করলেন, এসব হযরত ওমরকে আগেই বিচলিত করে রেখেছিল। অবশেষে তিনি আমার ইবনে আসকে জবাব পাঠালেন। বার্তা বহনকারী দূতের নাম ছিল শারীক ইবনে আবদা। সে-সময় হযরত আমর ইবনে আস কায়সারিয়া দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন। দূত সেখানে পৌঁছে বার্তাটি আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর হাতে দিলেন। তাতে হযরত ওমর (রাযি.) লিখেছেন, মহামারি আমাদের বাহিনীর সেনাসংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে। ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বলো, তারা তোমার বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যাক। সংখ্যার ঘাটতি পূরণ করে তুমি মিশর-অভিযানে যাত্রা করো।

সেকালে এভাবে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেই বাহিনী প্রস্তুত করা হতো। হযরত ওমর (রাযি.) এই নিয়মে উন্নতি সাধন করেন। তিনিই বাহিনীকে নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর রূপ দান করেন এবং তাদের জন্য ভাতাও নির্ধারণ করে দেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) এই আদেশের অপেক্ষায়ই অপেক্ষমাণ ছিলেন। তিনি অবরোধ হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানের হাতে সোপর্দ করে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে যান। আমর ইবনে আস (রাযি.) সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না। তাই অতি দ্রুত তিনি নতুন কিছু মুজাহিদ তৈরি করে এবং পুরাতন বাহিনী থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে একটি বাহিনী তৈরি করে নিলেন। তারপর রওনা হয়ে গেলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আমর ইবনে আস (রাযি.) যে-বাহিনী নিয়ে মিশর-অভিযানে রওনা হয়েছিলেন, তার মুজাহিদের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন হাজার। কেউ-কেউ চার হাজারও লিখেছেন। এই বাহিনীতে অশ্বারোহী ইউনিটও ছিল।

বাহিনী তৈরির আগেই আমর ইবনে আস (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর দূতকে জবাবি বার্তা দিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, আমি ফিলিস্তিন ও শাম থেকে জরুরি সাহায্য নিতে চাই না। অন্যথায় এই অঞ্চলগুলো দুর্বল হয়ে যাবে। আমার জন্য সাহায্য মদিনা থেকে পাঠাবেন, যারা মিশরের পথে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তাঁর প্রবল আশা ছিল, মদিনা থেকে তিনি পর্যাপ্ত সাহায্য পেয়ে যাবেন। তিনি জানতেন, যে-বাহিনটি নিয়ে তিনি মিশর যাচ্ছেন, পরদেশে গিয়ে লড়াই করার জন্য এই বাহিনী যথেষ্ট নয়।

মিশর-অভিযানে রওনার ক্ষেত্রে হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.) এত তাড়াহুড়া করার কারণ হলো, তাঁর কাছে সংবাদ এসেছে, মদিনায় এবং খেলাফত-ভবনে যাঁরা মিশর-অভিযানের বিরোধী ছিলেন, তারা আগের চেয়ে বেশি তৎপর হয়ে উঠেছেন এবং হযরত ওমর (রাযি.)কে ঘিরে ধরে তাঁকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য করার চেষ্টা করছেন। এই তালিকার শীর্ষ ব্যক্তি হলেন হযরত ওছমান ইবনে আফফান (রাযি.), যিনি ব্যক্তিত্বেও অসাধারণ, জ্ঞানে-বিচক্ষণতায়-দূরদর্শিতায়ও অনন্য। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর মনে ভয় ধরে গিয়েছিল, পাছে এমন না হয় যে, তাদের কাছে হার মেনে আমীরুল মুমিনীন সিদ্ধান্ত পালটে ফেলেন এবং মিশর-অভিযান মুলতবি করে দেন।

ইতিহাসে একথটা স্পষ্ট করে লেখা নেই, আমর ইবনে আস (রাযি.)কে মদিনার এই খবরাখবর কে সরবরাহ করেছিল। প্রবল ধারণা হলো, হযরত ওমর (রাযি.)-এর দূত শারীক ইবনে আবদা-ই খবরগুলো হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কানে গিয়ে থাকবেন। মদিনা থেকে তিনি-ই এসেছিলেন এবং খেলাফত-ভবনে কী সব হচ্ছে, সেসব তথ্য তাঁরই ভালো জানা ছিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল হাকাম অপর কয়েকজন ঐতিহাসিকের বরাতে লিখেছেন, আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। তিনি যে-সংবাদ পেয়েছিলেন, তা সঠিকই ছিল। সংবাদ পেয়ে হযরত ওছমান (রাযি.) হন্তদন্ত হয়ে হযরত ওমরের কাছে ছুটে এসেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা সত্যায়ন করিয়ে নিলেন, তিনি সত্যিসত্যিই আমর ইবনে আসকে মিশর-অভিযানের অনুমতি দিয়েছেন।

'আল্লাহর কসম আমীরুল মুমিনীন!'– হযরত ওছমান (রাযি.) বিচলিত কণ্ঠে বললেন– 'আপনি এমন ভুল করার মতো মানুষ ছিলেন না। কিন্তু আপনার এই সিদ্ধান্ত ভুল। আর যাকে সিদ্ধান্তটা দিয়েছেন, সেও সঠিক মানুষ নয়।'

হযরত ওমর (রাযি.) চকিত হয়ে হযরত হযরত ওছমান (রাযি.)-এর পানে এমন চোখে তাকালেন, যাতে বিস্ময়ও ছিল এবং এই প্রশ্নটিও ছিল যে, তুমি আমর ইবনে আস-এর মতো সেনাপতি সম্পর্কে বলছ, লোকটা ঠিক মানুষ নয়!

'আল্লাহর কসম ওমর!'– হযরত ওছমান (রাযি.) বললেন– 'আমর ইবনে আস-এর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। তিনি একজন নির্ভীক ও দুঃসাহসী সালার। খালিদ ইবনে অলীদ-এর মতো তিনিও নিজেকে এবং নিজের বাহিনীকে চরম ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়ার সাহস রাখেন। এটিও একটি কারণ যে, তাঁকে অনুমতি না দেওয়া উচিত ছিল। আরেকটি কারণ হলো, আমর বিত্তশালী পরিবারের সন্তান। তাঁর মাঝে ক্ষমতার মোহ আছে। তৃতীয় কারণটি হলো, তিনি মিশর-পরিস্থিতির সঠিক পরিসংখ্যান নেননি এবং যে-বাহিনীটি তিনি নিয়ে গেছেন, প্রয়োজনের

তুলনায় তা অপর্যাপ্ত। এই বাহিনীতে এমন অনেক মুজাহিদও আছেন, যারা জয়ের-পর-জয় অর্জন করে রোমানদের শাম থেকে বিতাড়িত করেছে। আপনি আর আমর দুজনে মিলে সেই বিজেতাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।'

হযরত আমর এমন একটা দ্বিধায় পড়ে গেলেন, যা তাঁর স্বভাবের অনকূল ছিল না। সব সময় তিনি ঠান্ডা ও পরিচ্ছন্ন মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। কিন্তু আজ এই ভাবনা তাঁকে পেরেশান করে তুলল যে, যদি ওছমান-এর মতো ব্যক্তিত্বের মতামত যদি না শুনি, তাহলে তিনি নারাজ হয়ে যাবেন। তা ছাড়া তাঁর সমপর্যায়ের আর কতিপয় ব্যক্তিত্বও মিশর-অভিযানকে মস্ত একটা ঝুঁকি মনে করতেন। হযরত ওমর (রাযি.) বিচলিত হয়ে উঠলেন। এই প্রথমবারই এমন একটা পরিস্থিতি জন্ম নিল যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর কঠোর বিরোধিতার সম্মুখিন হলেন এবং উপলব্ধি করতে শুরু করলেন, শেষাবারের মতো পরামর্শ না মিশর-অভিযানের সিদ্ধান্ত দেওয়া আমার ঠিক হয়নি।

গভীর চিন্তা-ভাবনার পর হযরত ওমর সিদ্ধান্ত নিলেন, আমর ইবনে আসকে ফিরিয়ে আনব। তিনি আমর ইবনে আসবরাবর বার্তা পাঠালেন। বার্তায় লিখলেন, 'যদি আমার এই পত্রখানা মিশরের সীমানা অতিক্রম করার আগেই পেয়ে যাও, তাহলে সেখান থেকেই বাইতুল মুকাদ্দাস ফিরে যাও। আর যদি মিশরের সীমানা পার হয়ে থাক, তাহলে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখো। আমি তোমার জন্য সাহায্য পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বার্তাটি শারীক ইবনে আবদার হাতে দিয়ে হযরত ওমর (রাযি.) বলে দিলেন, যত কম সম্ভব বিরতি দেবে এবং যত বেশি সম্ভব দ্রুত এগিয়ে যাবে আর এই পত্রখানা আমর ইবনে আস-এর হাতে পৌঁছিয়ে দেবে।

* * *

দূত যখন আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন তিনি রাফাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি খুব ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং নদীর কূলে-কূলে যাচ্ছিলেন। ধীরে চলার কারণ ছিল, তিনি মদিনার সাহায্যের অপেক্ষা করছিলেন, যার ব্যাপারে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আসবেই। পরিকল্পনা ছিল, সাহায্য এসে পৌঁছার পর যাত্রার গতি বাড়িয়ে দিবেন।

ইতিহাস এখানে একটা মজার ঘটনা লিখেছে। দূত যখন আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে পৌঁছল এবং তাঁকে জানাল, আমি আমীরুল মুমিনীন-এর বার্তা নিয়ে এসেছি, তখন আমর ইবনে আস বার্তাটি গ্রহণ করে নিলেন বটে; কিন্তু পড়লেন না। তার স্থলে তিনি এগিয়ে যেতে-যেতে দূতের কাছ থেকে মদিনা খবরাখবর নিতে থাকলেন, এবং এটা-ওটা জিজ্ঞেস করতে থাকলেন। এভাবে তিনি

রাফাহ থেকে অনেক সম্মুখে চলে গেলেন। এবার একটা গ্রাম এল। আমর ইবনে আস গ্রামের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করলেন, এটা দেশের গ্রাম? তারা জানাল, এটা মিশরের গ্রাম। আমর ইবনে আস (রাযি.) এবার বার্তাটি খুলে পড়লেন। তারপর অধীন সালারদের ডেকে বার্তাটি পড়ে শোনালেন এবং বললেন, আমীরুল মুমিনীন আদেশ দিয়েছেন, আমরা যদি মিশরে ঢুকে গিয়ে থাকি, তাহলে যেন যাত্রা অব্যাহত রাখি।

আমর ইবনে আস দূতে বার্তার উত্তর লিখে দিলেন, 'আমার বাহিনী মিশরের সীমানায় ঢুকে গেছে। কাজেই আপনি সাহায্য পাঠিয়ে দিন। তিনি দূতকেই সাক্ষী রাখলেন, বাহিনী মিশরের সীমানায় ঢুকে গেছে।

আমর ইবনে আস তাঁর অধীন সালারদের বললেন, আমি যখন দেখলাম, সাহায্যের বদলে দূত এসেছে, তখনই আমি বুঝে ফেলেছি, এটা ফিরে যাওয়ার আদেশ। হযরত ওমরের স্বভাব ও ফরমান জারির ধরন আমার জানা আছে। আমি ধরে নিয়ে নিয়েছি, হযরত ওমর এমন মানুষ নন যে, একটি আদেশ জারি করে আবার সরাসরি তা প্রত্যাহার করে নেবেন। ফলে তিনি অবশ্যই লিখে থাকবেন, যদি মিশরের সীমানায় প্রবেশ করে থাক, তাহলে পিছপা হয়ো না– সামনের দিকে এগিয়ে যাও।

হযরত আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সামনে মিশরের বিখ্যাত স্থান আরিশ। এটা মাঝারি আকারের একটা শহর। আমর ইবনে আস এই শহরটা অবরোধ করতে চাইলেন। কিন্তু দেখে তিনি বিস্মিত হলেন যে, শহরে একজনও রোমান সৈন্য নেই। আমর ইবনে আস বিনা বাধায় শহরটা দখল করে নিলেন।

তার আগে ৭০ মাইল দূরে মিশরের আরেক নগরী ফরমা। আমর ইবনে আস খুবই আনন্দিত যে, তিনি মিশর আক্রমণের অভিযানটা রোমানদের অজ্ঞাতেই করে ফেলেছেন এবং পরবর্তী শহরটাও তিনি ওভাবেই বিনা বাধায় জয় করে ফেলবেন। মদিনার সাহায্য এখনও এসে পৌছায়নি এমন কোনো উৎকণ্ঠা-ই তার নেই। কিন্তু এটা ছিল আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর আত্মপ্রবঞ্চনা। তাঁর বাহিনী মিশরের সীমানায় প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে মিশরে মুকাওকিস ও সেনাপতি আতরাবুন কাছে সংবাদটা পৌছে গেছে।

মিশরের শাসক মুকাওকিস কৌশল ঠিক করলেন, মুসলিম বাহিনীটাকে আরও ভিতরে ঢুকতে দেব। তিনি সেনাপতি আতরাবুনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, আরিশ থেকে ফরমা পর্যন্ত ৭০ মাইল দীর্ঘ খোলা মাঠ। মুসলমানদের আমরা খোলা মাঠে পরাজিত করতে পারব না। তাদের আরও সামনে যেতে দাও।

আতরাবুন মুকাওকিসের পরামর্শ মেনে নিল এবং অতি দ্রুত আরিশ থেকে তার সমস্ত সৈন্য বের করে পিছনে ফরমায় নিয়ে সমবেত করল এবং এই নগরীর প্রতিরক্ষা আরও শক্ত করে তুলল।

আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর অপর্যাপ্ত বাহিনী নিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই নগরীটাও তিনি জয় করে ফেলবেন এবং এখানেও তাঁকে কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে না। আর যারা মিশর-অভিযানে আমীরুল মুমিনীনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের চিন্তাধারাকে তিনি ভুল প্রমাণিত করে দিবেন। কিন্তু তাঁকে বলবার মতো কেউ ছিল না, রোমানরা আপনার জন্য ফাঁদ তৈরি করে রেখেছে।

চার

আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর বাহিনী মিশরের নগরী ফরমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অগ্রসর হচ্ছেন তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। এমনিতেই শত্রুবিরোধী অভিযানে সতর্কতা অবলম্বন একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এর কোনো বিকল্প নেই। তদুপরি এই অভিযানে আমর ইবনে আস-এর সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। তার বিশেষ কারণ হলো, যে-বাহিনীটা নিয়ে অভিযানে বের হয়েছেন, তার সেনাসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে অপ্রতুল। মাত্র সাড়ে তিন হাজার মুজাহিদ। আবার অগ্রযাত্রার গতিও রেখেছেন খুবই ধীর। মনে-মনে আশা রেখেছেন, এই ফাঁকে যদি মদিনা থেকে সাহায্য এসে পৌঁছয়। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর মতো একজন সচেতন ও অভিজ্ঞ সেনানায়কের পক্ষে এমনটা মনে করার প্রশ্নই আসে না যে, রোমান বাহিনী তার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে না।

এলাকাটা ছিল পুরোপুরি মরুভূমি। মুসলিম বাহিনীর সৈনিকরা উটের মতো পরম আরামের সাথে ও নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলছে, যেন তাদের পায়ের তলায় সমতল ও পাকা ভূমি। রোমান শাসক মুকাওকিস ঠিকই বলেছিলেন, খোলা মাঠে মুসলমানদের পরাজিত করা সহজ নয়।

বাহিনী প্রথমবারের মতো যাত্রাবিরতি দিল। মদিনা থেকে সাহায্য এখনও আসেনি। হালব থেকে হাদিদ ইবনে খাযরাজ মুমিন তার স্ত্রী শারিনাসহ এসে পৌঁছেছে এবং সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সঙ্গে দেখা করেছে।

পরদিন মদিনা থেকে আরেক অভিজ্ঞ গোয়েন্দা মাসউদ ইবনে সুহাইল মক্কি এসে পৌঁছয়। তার সঙ্গে ছিল ফাহাদ ইবনে সামের। ফাহাদের স্ত্রী আইনিও এসেছে। ইসলাম গ্রহণের পর ইবনে সামেরের নাম রাখা হয়েছিল ফাহাদ– ফাহাদ ইবনে সামের। কিন্তু আইনি তার নাম পরিবর্তন না করে এ-নামই বহাল রেখেছে।

মাসউদ ইবনে সুহাইল মক্কিকে মদিনা থেকে আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) পাঠিয়েছেন। মিশর সম্পর্কে তার ভালো ধারণা ছিল এবং গোয়েন্দাবৃত্তির

জন্য বেশ কিছু সময় সেখানে কাটিয়েও এসেছে। ফাহাদ ইবনে সামের মদিনায়ই ছিল। এখন মাসউদ ইবনে সুহাইলের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এসেছে। কারও থেকে তার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তার চলে আসার পর আইনির একা থাকা সম্ভব ছিল না। তাই সেও চলে এসেছে। ইসলাম গ্রহণের পর ফাহাদ ইবনে সামেরকে মদিনায় রাখা হয়েছিল এবং তার জন্য কিছু ভাতা চালু করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও তাকে কোনো কাজে জড়ানো যাচ্ছিল না। কারণ, আর কটা দিন দেখবার প্রয়োজন আছে, লোকটাকে আসলেই বিশ্বাস করা যায় কিনা। কিন্তু বেকার সময় কাটানোর কষ্ট তার সহ্য হচ্ছিল না। ফলে সে বারকয়েক বলেছিলও, রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাকে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিন কিংবা গোয়েন্দাগিরি বা নাশকতামূলক কাজের দায়িত্ব প্রদান করুন। মিশর সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা ছিল। বিশেষ করে আমর ইবনে আস (রাযি.) যে-অঞ্চলে যাচ্ছিলেন, সেই অঞ্চলের সব কিছু ছিল তার নখদর্পণে। মাসউদ ইবনে সুহাইলকে যেতে দেখল। সঙ্গে-সঙ্গে কাউকে কিছু না বলেই তার সঙ্গ নিল। ওখানে ঘোড়া ও অন্যান্য সরঞ্জামের কোনো অভাব ছিল না। সে দুটা ঘোড়া নিয়ে নিল। এভাবেই মাসউদ, ফাহাদ ও আইনি মদিনা ত্যাগ করে রওনা হলো। তারা পথে যথাসম্ভব কম বিরতি দিয়ে মিশর পৌঁছে গেল এবং সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে পৌঁছে গেল।

কোনো ঐতিহাসিকই একথা লিখেননি যে, মাসউদ ও ফাহাদ যখন আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে গিয়েছিল, তখন মদিনা থেকে জরুরি সাহায্য আসছে কিংবা আসবে না এমন কোনো সংবাদ বা বার্তা নিয়ে গিয়েছিল কিনা। ইতিহাস ও আলামত প্রমাণ করছে, ফরমা পর্যন্ত পৌঁছানাগাদ মদিনা থেকে কোনো সাহায্য আসেনি। কেন আসেনি, তার কারণ কোনো ঐতিহাসিকই লিখেননি।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) একটি বিত্তবান ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি প্রায়ই ব্যবসার কাজে মিশর যেতেন। শাম্মাস নামক মিশরের এক ইহুদির জীবন রক্ষা করেছিলেন। শাম্মাস তাকে মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া নিয়ে গিয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার জৌলুস ও রাজকীয় জাঁকজমক দেখে তিনি এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, মিশর তাঁর মন-মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছিল। মিশর সম্পর্কে, বিশেষ করে উত্তর মিশর সম্পর্কে তিনি সম্যক ধারণা রাখতেন। মিশরের লোকদের সম্পর্কেও তাঁর ভালো জানাশোনা ছিল। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং শাম ও ফিলিস্তিনে সমরবিদ্যা ও সেনাপতিত্বের নতুন রেকর্ড তৈরি করলেন। তারপর আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)কে বোঝাতে লাগলেন, মিশরকে যেকোনো মূল্যে সালতানাতে ইসলামিয়ায় যুক্ত করে

নেওয়া দরকার। এর জন্য তিনি মিশরের উপর সেনা-অভিযান পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। শেষ পর্যন্ত অনুমতি তিনি পেয়ে গেলেন।

আমর ইবনে আস মিশর সম্পর্কে অবগত ছিলেন ঠিক; কিন্তু তারপরও শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁর গোয়েন্দার প্রয়োজন ছিল। অভিযান শুরু করার আগে তিনি নিজের মতো করে মিশরে গোয়েন্দা পাঠাতে থাকেন। তিনি গোয়েন্দামারফত কিবতি খ্রিস্টানদের প্রধান পুরোহিত বিনয়ামিনের সঙ্গেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এখন মাসউদ ইবনে সুহাইল ও হাদিদ ইবনে খাযরাজ মুমিন-এর মতো গুপ্তচর– যারা পরম দুঃসাহসী গেরিলা এবং সুদক্ষ নাশকতাকর্মীও বটে– তাঁর কাছে এসে পৌঁছল। তিনি ভাবলেন, গোয়েন্দাগিরির কাজটা এবার আমি ভালোমতো আঞ্জাম দিতে পারব। আমর ইবনে আস (রাযি.) এদের বুদ্ধিমত্তা, বিদক্ষণতা ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। ফাহাদ ইবনে সামের তাঁর জন্য বিলকুল নতুন মানুষ। মাসউদ ইবনে সুহাইল তাঁকে ফাহাদ সম্পর্কে ধারণা দিল এবং ফাহাদও নিজের জযবার বহিঃপ্রকাশ ঘটাল। ফলে আমর ইবনে আস তার সম্পর্কেও আশ্বস্ত হলেন। ফাহাদ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বসল, যতখানি সফল গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা আমি করতে পারব, অতটা কোনো আরব গোয়েন্দা পারবে না।

* * *

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর অধীন সালারদের পাশে বসিয়ে এই তিন গোয়েন্দাকে পরিস্থিতির ইতিবৃত্ত শোনালেন। তিনি বললেন, আমার গোয়েন্দারা ফরমা ঘুরে এসেছে। তারা তথ্য দিয়েছে, ফরমায় রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা আমাদের বাহিনীর দ্বিগুণ।

ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করা বা এর সত্যায়নের জন্য তিনি মাসউদ ইবনে সুহাইল মক্কিকে ফরমা পাঠিয়ে দিলেন। তিনি জানালেন, আমি দুজন গোয়েন্দা বিনয়ামিনের কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছি। বলে দিয়েছি, তারা বিনয়ামিনকে বলবে, কিবতি খ্রিস্টানরা যেন মুসলমাদের বিরুদ্ধে মাঠে না নামে এবং পরদার অন্তরালে থেকে মুসলমানদের সাহায্য করে।

'তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'আমার সৈন্যসংখ্যা কত কম। অবরোধের জন্য যে-পরিমাণ সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, তাও আমার কাছে পুরোপুরি নেই। আমি নিজের জন্য এই সংকটটা তৈরি করে নিয়েছি যে, নিজেই আমীরুল মুমিনীন থেকে মিশরে সেনা-অভিযানের অনুমতি প্রার্থনা করেছি এবং তাঁকে সম্মত হতে বাধ্য করেছি। অতএব, যেকোনো মূল্যে সফল আমাকে হতেই হবে।'

'সফল আমাদের হতেই হবে'– এক সালার বললেন– 'যদি ব্যর্থ হই, তাহলে শুধু আমাদেরই লজ্জিত হতে হবে না– আমীরুল মুমিনীনকেও তাঁর সেই সহচরদের সামনে লজ্জা পেতে হবে, যারা আজও এই অভিযানে তাঁর বিরোধিতা করছেন।'

'মিশর অভিযানে জয়-পরাজয় আমার জন্য বাঁচা-মরার বিষয়'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'যদি বিফল হই, তাহলে আমি আর জীবন নিয়ে মদিনায় ঢুকব না। অন্যথায় মিশর-অভিযানের বিরোধীদের আমি মুখ দেখাতে পারব না, যাঁদের মাঝে ওছমান ইবনে আফফানের মতো আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। তিনি বলবেন, আমরা তোমাকে বারণ করেছিলাম না যে, এটা করো না! তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ আমরা কত দূরে চলে এসেছি এবং আমাদের কাছে রসদেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে এসেছি। আল্লাহর উপর ভরসা করে এসেছি। এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। শর্ত হলো, প্রত্যয় আমাদের দৃঢ় ও নেক হতে হবে। ঈমান ও তাওয়াক্কুলের মানদণ্ডে যদি আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমাদের জন্য পথ খুলে দেবেন।'

'আপনি কি কোনো রাস্তা চিন্তা করেছেন?' ফাহাদ ইবনে সামের জিজ্ঞেস করল।

'করেছি'– আমর ইবনে আস (রাযি.) উত্তর দিলেন– 'আর সেই পথটা তুমি আর হাদিদ উন্মুক্ত করতে পার। সবার আগে আমাদের রসদ চাই। তরিতরকারি আর গবাদি পশু। একটা ব্যবস্থা এই করতে পারি যে, বাহিনীর কিছু সৈন্য সেই অঞ্চলে পাঠিয়ে দেব, যেখানে তরিতরকারির ভাণ্ডার ও পশুপাল আছে। এরা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সেই গ্রামগুলোর উপর আক্রমণ চালাবে। এবং প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে চলে আসবে। কিন্তু এই পন্থা অবলম্বন করলে আমার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কমে যাবে।'

'দু'আ করুন যেন সাহায্য এসে পড়ে'– এক সালার বললেন– 'মদিনার জরুরি সাহায্যের অপেক্ষা করুন।'

'অপেক্ষা না করা-ই ভালো হবে'– আমর ইবনে আস বললেন– 'শত্রুপক্ষ তথ্য পেয়ে গেছে, আমরা তাদের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছি এবং একটা শহর দখল করে নিয়েছি। এখন তারা আঁটসাঁট বেঁধেই আমাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে। আমাদের অপেক্ষা দুশমনকে প্রস্তুতির অনেক সময় দিয়ে দেবে। আমি অন্য আরেকটা উপায় বের করে নিতে পারি।'

এই উপায়টা কী ছিল? প্রখ্যাত এতিহাসিক বাটলার তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও স্পষ্টরূপে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। উপায়টা ছিল, এই মরু-অঞ্চলের সীমানা যেখানে শেষ, সেখান থেকেই সবুজ-শ্যামল অঞ্চলের শুরু। আবাদি থেকে দূরে-দূরে মধ্যবর্তী এই অঞ্চলটাতে কতগুলো যাযাবর গোত্র বাস করত। বাহ্যত তারা খ্রিস্টান ছিল বটে; কিন্তু খ্রিস্টধর্মে তারা

নিজেদের মতো করে কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার যোগ করে নিয়েছিল। তাদের নিজস্ব একটা সমাজ ছিল। ছিল তারা রণবিদ্যায় পারদর্শী একটা রক্তপায়ী সম্প্রদায়। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) চিন্তাটা এ রকম করেছিলেন যে, এই যাযাবর গোত্রগুলো যদি আমাদের হাতে চলে আসে, তাহলে তরিতরকারি ও গাবদি পশু জোগানোর দায়িত্বটা আমরা তাদের উপর ন্যস্ত করতে পারি। সম্মত হলে কাজটা তারা সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে পারবে। গবাদি পশু দ্বারা উদ্দেশ্য ভেড়া, বকরি, গরু ও উট। এগুলো জবাই করে বাহিনীকে খাওয়াতে হবে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) যেইমাত্র এই বেদুইন গোত্রগুলোর কথা উল্লেখ করলেন, অমনি ফাহাদ চকিত হয়ে উঠল এবং একটা হাত উঁচু করে ইঙ্গিতে সিপাহসালারকে থামিয়ে দিল। মনে হলো, হঠাৎ তার কী একটা কথা যেন মনে পড়ে গেছে।

'মাননীয় সিপাহসালার!'– ফাহাদ ইবনে সামের বলল– 'আপনি ঠিকই বলেছেন যে, নিয়ত যদি ভালো হয় আর তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে, তাহলে পথ একটা বেরিয়ে আসেই। আমি যখন রোমান বাহিনীতে ছিলাম, তখন ওই অঞ্চলগুলোতে ডিউটি করেছি। তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও বোধ-বিশ্বাস সম্পর্কে আমার ভালোই জানাশোনা আছে। পাঁচ-ছয়দিন পর চাঁদের তিন তারিখ হবে। এই মৌসুমে বছরে একবার চাঁদের তিন তারিখে তারা একটা অনুষ্ঠান পালন করে। আমি আর হাদিদ ওই রাতে সেখানে যাব।'

* * *

মুকাওকিস ও আতরাবুন এসকান্দিরায় ছিলেন। তারা গোয়েন্দামারফত প্রতিনিয়ত এখানকার খবরাখবর পাচ্ছিলেন। গোয়েন্দারা তাদের তথ্য সরবরাহ করেছে, মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা খুবই কম এবং পিছন থেকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত জরুরি সাহায্যের কোনোই নাম-গন্ধ নেই।

মুকাওকিস আগেই ঘোষণা করেছিলেন, এই মুসলিম বাহিনীটাকে সামান্য যুদ্ধেই নিঃশেষ করে ফেলব এবং এরা যুদ্ধের মাঠে নামার আগেই না খেয়ে মরে যাবে। তিনি একথাও বলেছেন যে, হতে পারে, মুসলমানরা লড়াই করার পরিবর্তে অস্ত্রসমর্পণ করবে এবং বলবে, কিছু খাবার দিয়ে আমাদের বাঁচাও।

তার গোয়েন্দারা তাকে এ তথ্যও দিয়েছিল যে, মুসলমানদের হাতে রসদ খুবই কম,যা ফরমা পর্যন্ত পৌঁছার আগেই শেষ হয়ে যাবে। এই তথ্য পাওয়ামাত্র মুকাওকিস তরিতরকারি ও গবাদিসমৃদ্ধ গ্রাম্য এলাকাগুলোতে বাহিনী ছড়িয়ে দিলেন, যাতে মুসলমানরা হানা দিয়ে কোনো খাদ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নিতে না পারে।

এভাবে মুকাওকিস ও আতরাবুন মুসলামানদের না খাইয়ে মারার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে ফেললেন।

মুকাওকিসের প্রাথমিক এক আদেশে আরিশ থেকে সমস্ত রোমান ফৌজ বেরিয়ে এসেছে এবং ফরমা পৌঁছে গেছে। মুকাওকিস কৌশলটা ঠিক করেছেন, মুসলমানরা সামনের দিকে চলে আসুক এবং পথ এত দীর্ঘ হয়ে যাক, যাতে পিছন থেকে জরুরি সাহায্য ও রসদ এসে পৌঁছতে না পারে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল। তিনি মদিনায় দূত পাঠালেন। বার্তা দিলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাহায্য পাঠিয়ে দিন। কিন্তু আমি সাহায্যের অপেক্ষা করব না।

মাসউদ ইবনে সুহাইল মক্কি উটচালকের বেশে ফরমা গিয়েছিল এবং ফিরেও এসেছে। সে চালক সেজে উটে চড়ে গিয়েছিল। মরুভূমিতে উটের গতি খুব তীব্র হয়। সে সংবাদ নিয়ে এসেছে, মুকাওকিস ও আতরাবুন নিজেরা ফরমায় আসবেন না। বাহিনীর জন্য তারা আদেশ পাঠিয়েছেন, তোমরা অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে না। বরং বারবার বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাবে, যাতে তারা দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। মুকাওকিস বলেছেন, মুসলমানদের যে-ই প্রাণ হারাবে, তার শূন্যস্থান তারা পূরণ করতে পারবে না।

ফরমা মিশরের একটি বিখ্যাত শহর। ফেরাউনদের আমলে তার নাম ছিল পালুজ। সময় সামনের দিকে গড়িয়ে গেল। মিশর কিবতিদের শাসনাধীনে চলে এল। এবার পালুজ নাম ধারণ করল পারমুন। কিছুদিন পর এই নামও বদলে গেল। হলো ফরমা।

ফরমা যে-অঞ্চলটায় অবস্থিত, নীলনদ সেখানে এসে সাতটা শাখায় বণ্টিত হয়ে সাত দিকে চলে গেছে। তার একটা শাখার নাম পালুজি। পালুজি থেকেই নগরীটার নাম হয়েছে পালুজ। এভাবে প্রতিটা শাখার একটা করে নাম ছিল।

এই পুরোটা এলাকা ছিল উর্বর ও সবুজ-শ্যামল। ওখানে বিপুলসংখ্যক ফলবাগান ছিল। ফলে সেকালেও এলাকাটা বেশ ঘনবসিত ও স্বচ্ছল ছিল। বসতবাড়ির আশপাশে বাগান থাকত, যা কিনা মানুষকে নানা ধরনের ফল দান করত। ওখানকার আঙুর ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। আঙুরের ব্যাপক উৎপাদনের কারণে ওখানে মদও তৈরি হতো।

ফরমা নগরীটা গড়ে উঠেছিল একটা পাহাড়ের উপর। তার নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল খুবই মজবুত। সাধারণত একটা নগরীর নিরাপত্তার জন্য কোথাও একটা দুর্গ আর চারদিকে শক্ত একটা প্রাচীর থাকে। কিন্তু এই নগরীটাকে একাধিক দুর্গ দ্বারা দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়েছিল। এভাবে একে একটা দুর্জয়

নগরীতে পরিণত করা হয়েছিল। একে তো নিরাপত্তার এমন কঠোর ব্যবস্থা তদুপরি এর অবস্থান পাহাড়ের উপর । সব মিলিয়ে অবরোধ করে একে জয় করা দুঃস্বপ্নের মতো ব্যাপার ছিল।

* * *

মিশরি বেদুইনরা তাদের অঞ্চলে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। ফরমা নগরী থেকে বেশ দূরে এবং সাধারণ চলাচলের পথগুলো এড়িয়ে একটা অঞ্চল ছিল বালুকাময়। তাতে কোথাও-কোথাও সবুজের সমারোহ। উক্ত অঞ্চলের সীমানা পার হলেই সবুজ এলাকা। এই অঞ্চলেরই একটা জায়গা আছে বিস্তৃত নিম্নাঞ্চল। তার চারদিককার কিনারা উঁচু বাঁধের মতো। বর্ষা মৌসুমে এই জায়গাটায় পানি জমে বিশাল জলাশয়ে পরিণত হয়। দু-দিন মাস পর পানি শুকিয়ে যায় এবং এলাকাটা তরতাজা সবুজ ঘাসে ভরে যায়। তাতে কিছু গাছগাছালিও আছে এবং স্থানে-স্থানে মাটি সামান্য উঁচু হয়ে আছে এবং ছোট-ছোট টিলার রূপ ধারণ করে আছে। কিন্তু এমন জায়গার পরিমাণ খুবই কম।

এই জায়গাটাকে বেদুইনরা খুবই সুদর্শন বানিয়ে রেখেছিল এবং তাকে একটা পবিত্র জলাশয় বলে বিশ্বাস করত। তারই সন্নিকটে একস্থানে বেদুইনদের ধর্মনেতা এবং আরও কয়েকজন গোত্রপতি বাস করত।

রাতের বেলা। চাঁদের তিন তারিখ। অন্তত তিন হাজার বেদুইন বৃত্তাকারে উক্ত জায়গায় বসে আছে। মধ্যখানে অনেকখানি জায়গা খালি রাখা হয়েছে। এই খালি জায়গাটার মাঝখানে নাদুসনুদুস শক্তিশালী একটা ষাড় একটা খুটার সঙ্গে রশি দ্বারা বাঁধা। ষাড়টার বাঁকা শিংদুটো নানা ধরনের রং দ্বারা সাজানো। গায়ে সবুজ বর্ণের ঝলমলে একটা কাপড় জড়ানো। বাতাসে যখন কাপড়টা দুলছে, তখন মশালের আলোতে তার উপর এক প্রকার চমকের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তার সবগুলো খুরের উপরও চমকদার কোনো বস্তু লাগানো। গলায় নানা প্রকারের ফুলের মালা পরানো।

একই রকম পোশাকপরিহিতা বিশ-বাইশটা যুবতী মেয়ে ষাড়টার চার দিকে বৃত্তাকারে নাচছে। মেয়েগুলোর গায়ে পোশাক আছে বটে; কিন্তু পুরোপুরি আবৃতা নয়। ঢোল, তবলা ও সানাই বাজছে। মেয়েগুলোর এই নাচ নর্তন-কুর্দন নয় এবং বিশৃঙ্খলও নয়। তাদের প্রত্যেকের প্রতিটি আচরণ ও নড়চড় একই রকম। একটা মেয়েও অন্যদের থেকে সামান্যতমও ব্যতিক্রম আচরণ করছে না।

মনে হচ্ছে, সব কটা মেয়ে একটা শিকলে বাঁধা আর শিকলটা অদৃশ্য কোনো শক্তির হাতে ধরা। না নাচ অসংলগ্ন, না বাজনা বেসুরো। মরুর শীতল রজনী মদিরতায় যেতে লাগল। তিন হাজার বেদুঈনের উপর নীরবতা বিরাজ করছিল, যেন এতগুলো মানুষ সবাই স্বপ্নে বিভোর।

ষাড়ের চারদিক গোটাকতক চক্কর দিয়ে এক মেয়ে নাচের মুদ্রার সাথে তাল মিলিয়ে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে ষাড়টার সামনে চলে গেল এবং তার মুখে একটা চুম্বন এঁটে দিয়ে আবার মেয়েদের বৃত্তের মাঝে ফিরে গেল। তার পিছনে আসা মেয়েটাও একই কাজ করল। এভাবে প্রতিটি মেয়ে ষাড়ের মুখে চুমো খেল। বৃত্তটা একটা সারিতে পরিণত হয়ে গেল মেয়েগুলো একজন অপরজনের পিছনে সেখান থেকে চলে গেল।

যে-জায়গাটা নাচের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল, তার চার পাশে বড়-বড় পাঁচটা মশাল জ্বলছিল। তিন তারিখের চাঁদ দিগন্তে ফিরে গেছে এবং রাত অন্ধকার হয়ে গেছে।

সর্বশেষ মেয়েটা অন্ধকারে হারিয়ে গেলে সারেন্দার সুর-তাল তীব্র হয়ে উঠল এবং সানাইগুলোর বাজনাও সেই তালে বদলে গেল। সুরটা রক্ত গরমকরা সামরিক বাজনার মতো। একদিক থেকে একই ধরনের পোশাকে আবৃতা অন্তত বিশজন বেদুইন অন্ধাকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এক সারিতে মশালের আলোতে আত্মপ্রকাশ করল এবং মেয়েদেরই মতো ষাড়টার চার পাশে বৃত্তাকারে নাচতে লাগল। এদেরও নাচের লয়-তাল-মুদ্রা হুবহু মেয়েদেরই মতো। এখানেও কোনো ক্রটি নেই, কোনো খুঁত নেই।

এটা হলো পুরোষিত নাচ, যাকে সামরিক মহড়া বলা-ই অধিকতর শ্রেয়। নাচিয়েদের এক হাতে তরবারি, অপর হাতে ঢাল। এদের হাতে তরবারিগুলো চরকার মতো এমনভাবে ঘুরছে, যেন একটা তরবারিকে কয়েকটা তরবারি বলে মনে হচ্ছে। ঢোল ও দফের বাজনা তীব্র হয়ে উঠল এবং নাচে জোশ তেজ বেড়ে চলল। দর্শনার্থীরা সুরের তালে-তালে করতালি দিচ্ছে। এই নাচ এমন একটা প্রভাব তৈরি করে ফেলল যে, দর্শকদের শরীরগুলো যেন কাঁপতে শুরু করেছে।

রক্ত গরমকরা এই নাচ শুধু লোকদেখানো সামরিক নয়। এই লোকগুলো প্রকৃতই যুদ্ধবাজ এবং নাচ তাদের সামরিক কালচারেরই প্রতিধ্বনি। এই বেদুইন গোত্রগুলো মুক্তমনা মানুষ, যাকে অবাধ্যতা বললেও ভুল হবে না। হেরাকল কোনো এক সময় এদের তার ফৌজে নিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, আমরা তোমার বাহিনীতে যাব না। অবশ্য নেতারা হেরাকল-এর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল, আপনি যদি কখনও প্রয়োজন বোধ করেন, আমাদের সহযোগিতা দরকার, তা হলে বললে আমরা আপনার সাহায্যে পৌছে যাব। শর্ত থাকবে আমরা মিশরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করব না।

* * *

নাচিয়ে বেদুইনদের মাঝে দুজনের তরবারি অন্যদের তরবারিগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই দুজনের তরবারি চওড়া ও ভারী। এরা দুজন নাচতে-নাচতে বৃত্ত

থেকে বেরিয়ে এল। একজন গরুটার ঘাড়ের একদিকে অপরজন আরেক দিকে দাঁড়িয়ে গেল। বাদ বাকি বেদুইনরা তন্ময় হয়ে নাচ উপভোগ করছে। ওদিক থেকে নর্তকী দুটা মেয়ে দৌড়ে এল। তাদের হাতে একটা করে পিতলের বড়সড় থালা।

চওড়া তরবারিধারী বেদুইনরা তাদের তরবারিগুলো উঁচু করে ধরল এবং পূর্ণ শক্তিতে ষাড়টার ঘাড়ে মাথার কাছাকাছি আঘাত হানল এবং ষাড়ের অর্ধেক ঘাড় কেটে দিল। পরক্ষণেই অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান বেদুইন ষাড়ের বাকি অর্ধেক ঘাড়ও কেটে দিল। এবার ঘাড়টা পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেল। মেয়েদুটো দুদিক থেকে থালাগুলো ধরে রেখেছিল। ষাড়ের মাথাটা কেটে থালায় গিয়ে পতিত হলো।

ষাড়টা একদিকে কাত হয়ে পড়ে যেতে লাগল। দুজন নাচিয়ে দুজন লোক দৌড়ে এল। তাদের হাতে মাটির চওড়া একটা পাত্র। পাত্রটা চারদিক এক বিঘত পরিমাণ উঁচু। ষাড়টা পড়ে যেতে লাগলে তারা এই পাত্রটা ষাড়ের কর্তিত ঘাড়ের নিচে রেখে দিল এবং ঘাড়টা শক্তভাবে ধরে ফেলল। কারণ, ঘাড়টা ছটফট করছিল। তারা এই চেষ্টায় রত, যেন রক্তের একটা ফোঁটাও নষ্ট না হয়। নাচিয়ে বেদুইনদের নাচ বন্ধ হয়ে গেল। সবাই ধরে ছিন্নমাথা ষাড়টাকে কাবু করে ফেলল।

ষাড়ের রক্ত ছিল একটি বরকতময় বস্তু। এর প্রতি ফোঁটা রক্ত তারা সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে এবং শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও নারীদের পান করাবে। তাদের বিশ্বাস, এই রক্তমেশানো পানি পান করালে দুরারোগ্য ব্যাধি ভালো হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী রোগী সেরে ওঠে, দুগ্ধদায়িনী পশুদের এক ঢোক পান করালে তারা অধিক পরিমাণ দুধ দিতে শুরু করে। গবাদি পশুরা সেই চামচিকাগুলো থেকে নিরাপদ থাকে, যারা রাতে তাদের দুধ পান করে নিঃশেষ করে ফেলে এবং তাদের মেরে ফেলে। এই পানি ঘরে রেখে দিলে ঘরে প্রেতাত্মা আসে না এবং ঘরের অধিবাসীরা জিন-ভূতের উপদ্রব থেকে নিরাপদ থাকে।

ঘাড় কেটে দেওয়ার পর যেইমাত্র ষাড়টা পড়ে যেতে উদ্যত হলো, সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত বেদুইন উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং আকাশপানে হাত তুলে গগনবিদারী ধ্বনি তুলল। ষাড়টা পড়ে গেলে এবং তার রক্ত চওড়া বরতনে পড়তে শুরু করলে তাদের ধর্মগুরু উঠে দাঁড়ালেন এবং ষাড়টার দিকে এগিয়ে গেলেন। জনতা নীরব হয়ে গেল।

'পবিত্র ষাড়ের রক্ত বরকতময় হোক'– খানিক দূর থেকে কে যেন বলে উঠল– 'তোমাদের কুরবানি কবুল হয়ে গেছে। খোদার আওয়াজ শোনো, যিনি সূর্যকে উত্তাপ আর চাঁদ-তারাকে আলো দান করেন।'

ধর্মনেতা যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আওয়াজটা যেদিক থেকে এল, ওদিকে ফিরে তাকালেন। তার পাশে বেদুইনদের যে-তিন-চারজন নেতা উপবিষ্ট ছিলেন, তারাও মাথা তুলে মুখ ফিরিয়ে ওদিকে তাকালেন। বেদঈনদের

এই গোটা সমাবেশ ওদিকে ফিরে তাকাল। এখন প্রতিজন মানুষের দৃষ্টি সেদিকে, যেদিক থেকে আওয়াজটা এসেছিল।

আওয়াজটা যেদিক থেকে এল, ওদিকে এই নিম্নভূমির কিনারা একেবারেই কাছে। জনতা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। সেজন্য মাটিতে গাড়া লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা মশালের আলো ওই কিনারা পর্যন্ত পৌঁছছিল না। ধর্মনেতা জনতাকে বসে যেতে কিংবা সামনে থেকে সরে যেতে বললেন।

জনতা আলোর সামনে থেকে সরে গেল। এবার ঢালু কিনারায় একজন মানুষ চোখে পড়তে লাগল, যার মুখাবয়বটা ঠিকভাবে চেনা যাচ্ছে না। কারণ, ওই পর্যন্ত গিয়ে মশালের আলো ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। লোকটাকে শাদা একটা বস্তুর মতো মনে হচ্ছে। দুটা লাঠিও দেখা যাচ্ছে। একটা তার ডানে আর অপরটা বাঁয়ে পুতে রাখা। লাঠিগুলোর মাথায় এতগুলো কাপড় জড়ানো যে, তার বিস্তৃতি এক বিঘত পরিমাণ ছড়িয়ে গেছে। এগুলো মশাল, যা এখনও জ্বালানো হয়নি।

লোকটার মাথায় পাগড়ি এবং তার উপর রুমাল, যেটি দুদিকে তার দুই কাঁধের উপর গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কাঁধ থেকে শুরু হয়ে একটা চোগা তার পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মাথার রুমালটাও শাদা। চোগাটাও আকাশে চমকানো তারকার মতো শুভ্র। বাহুগুটো সামনের দিকে এবং খানিক ডানে-বাঁয়ে ছড়ানো।

কেউ যদি কাছে গিয়ে দেখত, তাহলে সে জানতে পারত, লোকটা তাদেরই মতো একজন মানুষ। তার দাড়ি কালো, ঘন ও লম্বা। কিন্তু ওখানকার একজন মানুষের মাঝেও, এমনকি তাদের ধর্মনেতার মাঝেও এতটুকু সাহস নেই যে, কাছে গিয়ে দেখে ও কে। লোকগুলো কুসংস্কারের পুজারী। মস্তিষ্কে প্রশস্ততা নেই। চিন্তায় গভীরতা নেই। পৃথিবীতে যা কিছু বিস্ময়কর, যা কিছু তাদের বুঝের ঊর্ধ্বে, তা-ই তাদের চোখে অলৌকিক ও ঊর্ধ্বজগতের বিষয়। কাজেই এই লোকটিও তাদের জন্য কোনো আধ্যাত্মিক বা আসমানি বস্তু। একে তারা প্রেতাত্মা বা জিন-ভূত মনে করতে পারে না। কারণ, এর পোশাক-আশাক শ্বেত-শুভ্র। জিন-ভূত, ডাইনি-পেতনিরা এমন পোশাক পরে না। তাদের বিশ্বাসমতে যারা মানুষের ক্ষতি করে, তারা কালো পোশাকে আবৃত হয় কিংবা হয় বিবস্ত্র। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল। এমনই নীরবতা অবলম্বন করল, যেন ওখানে কোনো প্রাণীর অস্তিত্বই নেই।

'ভয় করো না'– কিনারায় দাঁড়ানো লোকটি উচ্চ আওয়াজে বলল– 'আমি তোমাদেরই মতো মানুষ। খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের জন্য খোদার পয়গাম নিয়ে এসেছি। তোমাদের জন্য আমি আলো নিয়ে এসেছি।'

প্রথমে তার ডান দিককার মশালটা জ্বলে উঠল। তারপর বাঁয়েরটা। মশালগুলো এই লোকটি জ্বালায়নি। কালো দাড়িওয়ালা শাদা পোশাকের এই মানুষটি ঠায় দাড়িয়েই ছিল। ডান-বাম, অগ্র-পশ্চাৎ, উপর-নিচ কোনো দিক থেকে কাউকে এসেও বাতিটা জ্বালাতে দেখা যায়নি। কাজেই প্রদীপগুলো আপনা-আপনি জ্বলে উঠেছে তাতে সংশয়ের লেশমাত্র নেই।

বেদুইনদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তাদের ধর্মনেতা ও গোত্রনেতারাও অবাকবিস্ময়ে থ বনে দাঁড়িয়ে রইল।

'খোদার পয়গাম খোদার পাঠানো দূতের কাছ থেকে শুনে নাও।' শাদা চোগাপরিহিত লোকটি বলল।

লোকটা এমনভাবে ধীরে-ধীরে কিনারা থেকে নিম্নভূমির দিকে নামতে শুরু করল, যেন তার পা উঠছে না এবং সে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। তার ডানে ও বাঁয়ে প্রজ্বলমান মশালগুলোর আলোর নাচ তাকে আরও অধিক রহস্যময় বানিয়ে তুলেছে। সে অতন্ত ধীরে-ধীরে নিচের দিকে গড়াতে লাগল। আর সে এতক্ষণ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে আপাদমস্তক একটা রূপসী তরুণী আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করল। মনে হলো, মেয়েটা এই লোকটির অস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে আসছে।

মেয়েটাকে এই জগতের কোনো সৃষ্টি বলে মনে হলো। মুখটা তার এতই সুন্দর, এতই নিস্পাপ যে, বেদুইনরা এমন নারী এর আগে কখনও দেখেনি। মুখের রং কিছুটা শুভ্রতা আর কিছুটা সূক্ষ্ম লালিমামেশানো। মাথার উন্মুক্ত রেশমি চুলগুলো কাঁধ ও বুকের উপর ছড়িয়ে আছে। বাহুদুটো নগ্ন। ঘাড়টা খানিক দীর্ঘ আর শরীরটা এক কাপড়ে আবৃত।

'তোমাদের কুরবানি কবুল হয়ে গেছে'– মেয়েটা বাহুদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল– 'তোমরা সাবধান থেকো। রক্তঝড় আসছে। এই ঝড় তোমাদের দুগ্ধদায়িনী পশুগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তোমরাও অনেকে উড়ে যাবে। অবশ্য খোদা তোমাদের রক্ষা করতে পারেন যদি তোমরা খোদার হুকুম তামিল কর। কাল তোমাদের কাছে তিনজন মানুষ আসছে। তাদের আলামত হবে, তারা উটে চড়ে আসবে। খোদা তাদের ইশারা দিয়ে দিয়েছেন। তারা যা কিছু বলবে, তাকে খোদার পয়গাম মনে করবে। অন্যথায় ষাড়ের রক্ত বৃথা যাবে এবং সে তোমাদের ধ্বংস রোধ করতে পারবে না। তোমাদের কাছে খোদার পয়গাম পৌঁছে গেছে। আমি আকাশে খোদার কাছে ফিরে যাচ্ছি।'

চোগাপরা লোকটি– যে মেয়েটার সম্মুখে ঢালুতে দাঁড়ানো ছিল– আস্তে-আস্তে উলটো পায়ে উপরে উঠে যেতে লাগল আর মেয়েটা তার পিছনে কিংবা তার

অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। লোকটি কিনারায় মশালদুটোর মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'এই বাতিগুলো সারা রাত এখানে জ্বলতে থাকবে'– লোকটি বলল– 'এটি খোদার আলো। কাল সকালে এটি তুলে নিয়ে রেখে দেবে। এটি শুধু কুরবানির দিন জ্বালাবে। আমি যাচ্ছি। সকালনাগাদ কেউ এদিকে আসবে না। কেউ এলে তার উপর আসমানি গজব নেমে আসবে।'

লোকটি পিছনে সরে গেল এবং উলটো পায়ে পিছনের ঢালুতে এমনভাবে নেমে গেল, যেন সে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। বাতিগুলো ওখানেই জ্বলতে থাকল। নীরব বেদুইনরা পূর্ববৎ নীরবই রইল। একজনও মুখে একটা শব্দও উচ্চারণ করার সাহস পেল না।

'তোমরা ভয় করো না'– ধর্মনেতা মুখ খুলে নীরবতা ভঙ্গ করলেন– 'এটি খোদার ইশারা। ভাগ্যবান সেই জাতি, যারা এধরনের ইশারা লাভ করে। তোমরা উল্লাস করো। কাল যারা আসবে, তাদের থেকে আমরা খোদার আরও কিছু পয়গাম জানতে পারব।'

* * *

এসব কী ছিল? এর মধ্যে বাস্তবতা বলতে কিছু ছিল কি? কিছুই ছিল না। এটা আরবদের বুদ্ধিমত্তার বহিঃপ্রকাশ ছিল। এই বাস্তবতাকে বিদ্বেষপরায়ণ ইউরোপিয়ান বিশ্লেষক ও চিন্তাবিদগণও স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তার একাধিক উপমা তুলে ধরেছেন যে, মহান আল্লাহ আরবের মানুষদের এমন সৃষ্টিধর্মী যোগ্যতা দান করেছেন, যা পৃথিবীর অন্য কোনো ভূখণ্ডের মানুষের ভাগ্যে জোটেনি।

ফাহাদ ইবনে সামের সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে বলেছিল, দিনকতক পর মিশরি বেদুইনরা একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, যেটি প্রতি বছর এ মাসে চাঁদের তিন তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নতুন চাঁদ উঠতে দিনকতক সময় বাকি ছিল। ফাহাদ ইবনে সামের, মাসউদ ইবনে সুহাইল ও হাদিদ ইবনে মুমিন খাযরাজ বিষয়টি নিয়ে মতবিনিময় করল। তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো, এই বেদুইনদের মুখের কথায় দলে ভিড়ানো সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আমাদেরকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

মাসউদ ও হাদিদের আরবের বেদুইনদের সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল। কিন্তু তারা জানত না, মিশরের বেদুইনরা আরবের বেদুইনদের থেকে অনেকখানি ব্যতিক্রম এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র সবই নিজেদের মতো। এসব তথ্য সে ফাহাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে। হেরাকল তাদের গণহারে হত্যা করলেন এবং পরে মিশর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ারও হুমকি দিলেন, তোমরা রোমান বাহিনীতে শামিল হয়ে

যাও। কিন্তু বেদঈনরা কারও কোনো হুমকি-ধমকিকে পরোয়া করার মতো মানুষ ছিল না। তারপর হেরাকল তাদের নানা ধরনের প্রলোভন দেখাতে লাগলেন। কিন্তু বেদুইনরা নিজেদের অবস্থান থেকে এক চুলও নড়ল না। হেরাকল-এর মতো প্রতাপশালী ও ফেরাউন-চরিত্রের সম্রাট চুপসে গেলেন। তিনি জানতেন, আমি যদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এদের বাগে আনবার চেষ্টা করি, তাহলে মরুভূমিতে এরা আমার বাহিনীর জন্য বিপদ দাঁড় করিয়ে দেবে।

আমর ইবনে আস (রাযি.) যখন এই বেদুইনদের প্রয়োজন অনুভব করলেন, তখন ফাহাদ ইবনে সামের তাঁকে বলেছিল, এরা মুখের কথায় বাগে আসবে না, পায়ের লাথিতেও নয়। এর জন্য আমাদেরকে অন্য কোনো পন্থা ভাবতে হবে। ফাহাদ এই বেদুইনদের সমাজ, ধর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত ছিল এবং জানত, মৌলিকভাবে এরা কুসংস্কারবাদী। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, যাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ফাহাদ মিশরের মানুষ। মাসউদ ও হাদিদের জন্ম আরবের মরু অঞ্চলে। তিনজন মিলে একটা নাটক তৈরি করে নিল। শারিনাও রূপসী মেয়ে। কিন্তু যে-সজীবতা আর নিষ্পাপতা আইনির মাঝে ছিল, শারিনার চেহারায় তা ছিল না। আইনির বয়স সবে সতেরো। কাজেই আকাশ থেকে বার্তা বহনের দায়িত্ব আইনির কাঁধেই চাপানো হলো।

মাসউদ ও হাদিদ গোয়েন্দা। ফলে নানা ধরনের পোশাক ও ছদ্মবেশ সব সময় তাদের সঙ্গেই থাকে। এই নাটকের জন্য তারা এমন একজন তিরন্দাজ বেছে নিল, যার কোনো তির কখনও ব্যর্থ হয়নি। ধনুকটা পুরোপুরি টেনে ধরে যদি তির ছোড়া হয়, তাহলে তা নিশানায় গিয়ে আঘাত না করে ছাড়ে না। কিন্তু ধনুক সামান্য টেনে ধরে যদি কাছে তির ছোড়া হয়, তাহলে লক্ষ্যে আঘাত হানা কঠিনই হয়। একাজটা একজন সুদক্ষ তিরন্দাজেরই পক্ষে সম্ভব। এমনই একজন তিরন্দাজ পেয়ে গেল মাসউদ ও হাদিদ।

এই নাটকটা খেলতে হবে চাঁদের তিন তারিখ রাতে। সেই তারিখটি আসতে সময় বাকি মাত্র দিনকতক। সেজন্য তারা খুব দ্রুত মহড়া দিয়ে নিল এবং পরদিনই ফাহাদের দিকনির্দেশনায় এই দলটি রওনা হয়ে গেল। অঞ্চলটা মরুভূমি। তাই তারা ঘোড়ার বদলে উটে চড়ে গেল। পথ দুদিনের। ফাহাদ তাদের এমন পথে নিয়ে গেল, যেটি খুবই দুর্গম। ওপথে আর কোনো মানুষের চলাচলের সম্ভাবনা নেই এবং লুকানোর জন্যও বেশ নিরাপদ জায়গা আছে। এপথে সেই নিম্নভূমির দূরত্বও কম, যেখানে বেদুইনদের অনুষ্ঠানটি পালিত হবে।

চাঁদের তৃতীয় রাতে তারা সেই জায়গাটায় পৌঁছে গেল, যেখানে বেদুইনরা অনুষ্ঠান পালনের জন্য সমবেত হয়েছে। ওখানে তারা কারও চোখে পড়বার মতো অবস্থা

ছিল না। কারণ, দেখার মতো যারা আছে, তারা সবাই অনুষ্ঠান উপভোগে নিমগ্ন। আরও একটা কারণ হলো, জায়গাটা নিচু এবং তার পাড় বেশ উঁচু। তারা লুকানোর জায়গা থেকে অনুষ্ঠানস্থলে পায়ে হেঁটে গেল। যদি উটে চড়ে যেত, তাহলে উট নীরবতা ভেঙে ফেলতে পারত। তিন তারিখের চাঁদ উপরে উঠে ফিরে গেছে। ফলে রাত অন্ধকার হয়ে গেছে।

মাসউদ ইবনে সুহাইল মক্কি দুটা মশার হাতে করে শুধু মাথাটা পাড়ের উপর জাগিয়ে তুলে সমাবেশটা দেখল। সে নিশ্চিত হলো, একজন মানুষও তাকে দেখতে পায়নি। সময়টা ছিল তখন, যখন মেয়েগুলোর নাচ শুরু হয়েছে। মাসউদ মশালদুটোর লাঠিগুলো পাড়ের উপর পরম আরামের সাথে পুতে দিল। মশালগুলোর কাপড় তেলে ভিজিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাসউদ শাদা চোগা পরিহিত ছিল। তার মাথায় পাগড়ি। পাগড়ির উপর শাদা রুমাল। ফাহাদ তাকে বলেছিল, তুমি মশালদুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে-কথাগুলো বলার জন্য তোমাকে শেখানো হয়েছে, সেগুলো তখন বলবে, যখন ষাড়টার ঘাড় কাটা হয়ে যাবে। ফাহাদ কোনো একসময় এই অনুষ্ঠানটা দেখেছিল। তাই ঠিক-ঠিক নির্দেশনা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল।

সবাই পালাক্রমে উপরে উঠে বেদুইনদের তামাশাটা দেখল। তাদের সঙ্গে আইনিও ছিল, তিরন্দাজও ছিল। আইনি উপরে বর্ণিত পোশাকে ও অবয়বে ছিল। মেয়েদের নাচের পর পুরুষদের নাচ শুরু হলো। দুজন বেদুইন যখন ষাড়ের ঘাড়টা কাটার জন্য তার ডানে ও বাঁয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তখন ফাহাদ মাসউদকে বলল, তুমি মশালদুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাও এবং সেই কথাগুলো বলো, যেগুলো বলতে তোমাকে শেখানো হয়েছে।

মাসউদ পাড়ের উপর উঠে দাঁড়াল। আইনিও তার পিঠের সঙ্গে লেপটে দাঁড়িয়ে গেল এমনভাবে যে, তাকে দেখা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। মাসউদ তার অভিনয়টা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করল এবং মশালগুলো জ্বলে উঠল। মশালগুলো মূলত তিরন্দাজ লোকটি জ্বালিয়েছিল। তা এভাবে যে, তার কাছে সলিতাওয়ালা তির ছিল। পাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দুটা তিরে পালাক্রমে আগুন ধরাল এবং ধনুকটা টেনে ধরল। ধনুক সামান্য টান দিতেই তির ছুটে গিয়ে মশালের মাথায় গিয়ে বিদ্ধ হলো এবং সঙ্গে-সঙ্গে মশালে আগুন জ্বলে উঠল। এটা তিরন্দাজ সাথীর কৃতিত্ব ছিল।

তারপর মাসউদ ধীরে-ধীরে পাড়ের ভিতর দিককার ঢালুতে নামতে শুরু করলে আইনি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। মনে হচ্ছিল, মেয়েটা মাসউদের অস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে আসছে। এটা ছিল প্রদীপের কম্পমান আগুন ও দৃষ্টির ধোঁকা। আসল

ব্যাপার হলো, বেদুইনরা কুসংস্কারের পূজারি ছিল। আর কুসংস্কারপূজারিদের জন্য অভিশাপ হলো, এমন মানুষ বাস্তবতার প্রতি তাকায়ই না।

তারপর মাসউদ উলটো পায়ে পাড়ের উপরে উঠে গেল আর আইনি– যে কিনা তার আড়ালে লুকিয়ে ছিল– তার পিঠের সঙ্গে লেগে বাইরের দিকে সরে গেল। মাসউদও তার সঙ্গে গেল। এভাবে তারা বেদুইনদের কুসংস্কারপূজা, পশ্চাদপদতা ও সরলতাকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কাজে লাগাল এবং সবার উপর এমনকি তাদের ধর্মীয় নেতারও উপর এমন রহস্যময় প্রভাব সৃষ্টি করে দিল যে, তাদের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগল না, এটা কোনো প্রতারণাও হতে পারে, যার কোনো বাস্তবতা নেই। সাধারণ জনতা, ধর্মনেতা ও গোত্রপতিরা মেনে নিল, এরা আসমানি সৃষ্টি ছিল।

গোয়েন্দাদের এই দলটি মরুভূমিতে সেই জায়গাটায় ফিরে গেল, যেখানে এরা প্রথমে লুকিয়েছিল। মাসউদ ও ফাহাদ নাটকের পোশাক বদল করে সামরিক পোশাক পরে নিল।

* * *

পরদিন বেদুইনদের ধর্মনেতা এবং আরও চার-পাঁচজন নেতা নিম্নাঞ্চলের পাড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারা অধীর আগ্রহে তিন উষ্ট্রারোহীর অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। গত রাতে আসমানি হুর বলেছিল, তিনজন লোক তোমাদের কাছে উটে চড়ে আসবে। বহুসংখ্যক বেদুইন দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে সেই উষ্ট্রারোহীর পথপানে তাকিয়ে আছে।

অবশেষে অনেক দূর থেকে তিনজন উষ্ট্রারোহী আসতে দেখা গেল। ওরা এদিকেই আসছে। সাথে-সাথে শোর উঠে গেল– 'ওই তো আসছে। ওই তো ওরা আসছে। ওরা এসে পড়েছে। এরা ওরাই হবে।'

বেদুইনরা এই উষ্ট্রারোহীদেরও আসমানি সৃষ্টি মনে করছে।

এই উষ্ট্রারোহী তিনজন মাসউদ, হাদিদ ও ফাহাদ। তারা দেখল, বেদুইনরা তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা উটের গতি বাড়িয়ে দিল এবং দেখতে-না-দেখতেই বেদুইনদের কাছে পৌঁছে গেল। তারা উট বসিয়ে না নেমে দাঁড়ানো উট থেকেই লাফিয়ে নামল। বেদুইনদের ধর্মনেতা ও গোত্রপতিরা তাদের স্বাগত জানাতে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল। তারা পরম আগ্রহের সাথে আগত উষ্ট্রারোহীদের সাদর সম্ভাষণ জানাল।

'আমরা তোমাদেরই অপেক্ষায় ছিলাম'– ধর্মনেতা বললেন– 'আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তোমরা তারা-ই, যাদের খোদায়ী পয়গাম গত রাতে আমরা এক আসামানি হুরের

কাছ থেকে লাভ করেছি। তারা-ই কি তোমাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন? তারা তোমাদের লক্ষণ বলেছেন, তোমরা উটে চড়ে আসবে।'

'আমরা জানি না, তোমরা কী পয়গাম লাভ করেছ'– মাসউদ বলল– 'আমাদেরকে আমাদের সেনাপতি পাঠিয়েছেন। তিনি স্বপ্নে খোদার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পেয়েছেন, এই মরুভূমিতে একটি সৃষ্টি বাস করে, যাদের জিজ্ঞাসা করার মতো কেউ নেই। তুমি যাও; তাদের খবর নাও। তাদের ভালো-মন্দ ও লাভ-ক্ষতির ভার নিজের মাথায় তুলে নাও। সেনাপতি স্বপ্নে তোমাদের যে-আলামত দেখেছেন, তা তিনি আমাদের বলেছেন আর আমরা তোমাদের কাছে চলে এসেছি। এই জায়গাটা ঠিক সেরকম, যেমনটা আমাদের সিপাহসালার স্বপ্নে দেখেছেন এবং তোমাদের আকার-গঠনও হুবহু তেমনই।'

গত রাতে বেদুইনরা কী সব দেখেছে এবং কীভাবে তাদের কাছে খোদার পয়গাম পৌঁছেছে এক প্রবীণ নেতা সব এদের বিস্তারিত শোনাল।

'গত রাতে তোমরা কী দেখেছ, তার কিছুই আমাদের জানা নেই'– মাসউদ বলল– 'আমরা শুধু এটুকু জানি, আমাদের সেনাপতি খোদায়ী বার্তা লাভ করেছেন। তা যদি তোমরাও পেয়ে থাক, পেতে পার। এর কিছুই আমাদের জানা নেই। আসুন, আমরা কোথাও বসে কথা বলি।'

'কাছেই এক জায়গায় ধর্মনেতার তাঁবু ছিল, যেটি চামড়া দ্বারা তৈরী এবং এতখানি প্রশস্ত যে, একসঙ্গে কয়েকজন মানুষ তাতে বসতে পারবে। নেতা এই তিনজনকে এবং অন্যান্য নেতাদেরও তাঁবুতে নিয়ে বসালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সেনাপতি কোথায়?

মাসউদ তাদের সেনাপতির অবস্থান জানাল এবং বলল, তাঁর বাহিনী ইতিমধ্যেই আরিশ নগরী জয় করে ফেলেছেন। এখন তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি একস্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান নিয়ে আছেন।

'তোমরা কি মুসলমান?' এক নেতা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ'– মাসউদ উত্তর দিল– 'আমরা মুসলমান। তা মুসলমানদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী?'

বেদুইনদের এই প্রবীণ নেতা যে-উত্তর দিয়েছিল, তা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল হাকাম লিখেছেন, প্রবীণ নেতা উত্তর দিল– 'আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই! মুসলমানদের মাঝে না জানি কী শক্তি আছে যে, তারা অল্প কজন সৈনিক বিশাল-বিশাল বাহিনীকে রণাঙ্গন ছেড়ে পালাতে বাধ্য করছে! তারা যেদিকেই মুখ করছে, জয় তাদের পদচুম্বন করছে!'

'এতখানি অবাক হওয়ার দরকার নেই'– মাসউদ বলল– 'এটি খোদায়ী শক্তি, যা শুধু তাদেরই দান করা হয়, যাদের অন্তরে মানুষের ভালবাসা থাকে, যারা দুর্বলের গায়ে হাত তোলে না, অপরের ধর্মে ও বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করে না, অসহায়কে নিজেদের গোলাম বানায় না।'

বেদুইনদের ধর্মনেতা বোধহয় খোদায়ী শক্তির আরও ব্যাখ্যা জানতে চাচ্ছিলেন। বিষয়টি তিনি খোলাসা করে বুঝতে চাচ্ছিলেন। এদিক থেকে মাসউদই বেশিরভাগ কথা বলছিল। কারণ, সে তিন সদস্যের এই দলটির আমির। মাসউদ তার দুই সাথী ফাহাদ ও হাদিদের প্রতিনিধিত্ব করছিল। সে আরবের দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করে বলল, হাজার-হাজার মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করার উপক্রম হয়েছিল। কিছু লোক মারাও গিয়েছিল। কিন্তু আমীরুল মুমিনীনের চেষ্টায় ও ব্যবস্থাপনায় মানুষ এই দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। তারপর মাসউদ মহামারির আলোচনা তুলল। বলল, রহস্যময় এই রোগে পঁচিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারাল এবং মুসলমানদের অর্ধেক সৈন্য তাতে ধ্বংস হয়ে গেল।

'তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো'– মাসউদ বিস্তারিত শুনিয়ে বলল– 'মহামারি চলাকালে যদি হেরাকল শামের উপর আক্রমণ করে বসতেন, তাহলে মুসলমানদের বাদ বাকি এই মুষ্টিমেয় সৈন্যকে পরাজিত করে অনায়াসেই তিনি শাম পুনর্দখল করতে পারতেন। কিন্তু তার সাহসই হলো না। আমাদের সেনাপতি এই ভয়াবহ মহামারি থেকে রক্ষা পেতে মদিনা পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা-ই করলেন না। তিনি বাহিনীর সঙ্গেই থাকলেন। মহামারিতে আক্রান্ত হলেন এবং অবশেষে এই রোগে মারা গেলেন।'

মাসউদ মূলত তাদের মাথায় বুঝ ঢোকাতে চাচ্ছিল, মুসলমানদের মাঝে সাম্য ও মানবপ্রেম আছে। আর এই গুণগুলো যেহেতু আল্লাহর প্রিয়, তাই তিনি মুসলমানদের সেই শক্তি দান করেছেন, যাকে আমরা খোদায়ী শক্তি বলি। এই শক্তির বলেই মুসলমানরা দুর্ভিক্ষকে পরাজিত করেছে এবং পরে মহামারিকেও জয় করেছে। তারা সাহস হারায়নি। আর আজ তারা মিশরে ঢুকে পড়েছে এবং আরিশের মতো নগরীটা জয় করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'আর বলতে হবে না'– বেদুইনদের ধর্মনেতা বললেন– 'এবার বলো, আমাদের জন্য কী বার্তা নিয়ে এসেছ? বলো, আমাদের কী করতে হবে?'

'তোমাদের জন্য আমরা যে-বার্তা নিয়ে এসেছি, তা খুবই স্পষ্ট ও কল্যাণকর'– মাসউদ বলল– তোমাদের সবগুলো গোত্রের যেসব পুরুষ যুদ্ধ করতে সক্ষম, তাদের সবাইকে আমাদের সিপাহসালারের কাছে পাঠিয়ে দাও এবং সেনাপতিত্ব বরণ করে নাও। আমরা সম্রাট হেরাকলও কোনো এক সময় তোমাদের এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন; কিন্তু তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছ।'

'তোমরা ঠিকই শুনেছ'– ধর্মনেতা বললেন– 'কিন্তু তোমাদের কথাবার্তা শুনে এবং এর আগেও আমরা মুসলমানদের সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছি, তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, তোমাদের মাঝে ও হেরোকল-এর মাঝে বিস্তর ব্যবধান আছে। হেরোকলকে আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ, তিনি আমাদের ধর্মকে পর্যন্ত নিজের রাজত্বের অধীনে নিয়ে গেছেন এবং তার আকার-অবয়বই পালটে গিয়েছেন। যারা তার বানানো ধর্মকে মেনে নেয়নি, তাদের তিনি হত্যা করেছেন। আমাদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, তোমাদের যুবকদের আমার বাহিনীতে শামিল করে দাও। কিন্তু তোমরা কোনো হুমকি বা ভয়-ভীতি নিয়ে আসনি। সেজন্য আমরা তোমাদের কথা শুনতে প্রস্তুত আছি। তোমাদের আমরা নিরাশ হয়ে যেতে দেব না।'

যদি যুক্তি-প্রমাণের জোরে তাদের সঙ্গে কথা বলা হতো এবং বিতর্কের অবতারণা করা হতো, তাহলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই বেদুইনরা কোনোদিনও তাদের কথা শুনত না। তারা গত রাতের সেই বার্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল, যার সম্পর্কে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সত্যিই এই বার্তা খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। তারা কোনো উচ্চবাচ্চ করল না। কথা কাটবারও চেষ্টা করল না। কয়েকটা জরুরি কথা জেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিল, আমাদের যুবকদের আমরা অনতিবিলম্বেই মুসলিম সিপাহসালারের আনুগত্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মাসউদ তাদের বলল, তোমাদের জওয়ানরা এত পরিমাণ গনিমত লাভ করবে যে, সবগুলো গোত্র সম্পদে লাল হয়ে যাবে। তাদের আরও অবহিত করা হলো, মুসলমানদের কাছে এমন কোনো নিয়ম নেই যে, বাহিনীতে যাদের পদমর্যাদা বড়, গনিমতের অংশ তাদের বেশি দেওয়া হয় আর সাধারণ সৈনিকদের নামমাত্র কিছু দেওয়া হয়। মাসউদ তাদের আরও বলল, যদি খোদার পক্ষ থেকে তোমরা সরাসরি কোনো বার্তা পেয়ে যাও, তাহলে খবরদার! তার অন্যথা করো না। নাহয় তোমাদের গবাদিগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমাদের শিশুরা রহস্যময় কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে যাবে। ফলে তোমাদের বংশধারা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

কয়েকটা জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মাসউদ, ফাহাদ ও হাদিদ ওখান থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এল।

* * *

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এরা তিনজন ছাউনিতে ফিরে এল এবং সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে পরম আনন্দের সঙ্গে সুসংবাদ শোনাল, মরু-অঞ্চলের বেদুইনরা আমাদের বাহিনীতে যোগ দিতে আসছে।

আমর ইবনে আস (রাযি.) চরম এক পেরেশানির মধ্যে সময় পার করছিলেন। এই সুসংবাদ তাঁকে আশ্বস্ত করে তুলল এবং তিনি মাসউদ ও তার সাথীদের

মোবারকবাদ জানালেন, তোমরা অনেক বড় কাজ করে এসেছ। কিন্তু কাজটা এরা কীভাবে আঞ্জাম দিল এবং কী করে সফলতা অর্জন করল, তার বিবরণ শোনার পর তাঁর উজ্জ্বল মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। তাঁর ওষ্ঠাধর থেকে হাসির রেখা উবে গেল।

'যুদ্ধে শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার বৈধতা আছে'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'কিন্তু এই ধোঁকা যুদ্ধের মাঠে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের দেওয়া হয়। একে সমরকৌশল বলা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া প্রশংসনীয় কাজ নয়। আমাকে তোমরা এক পেরেশানি থেকে মুক্তি দিয়েছ বটে; তার সঙ্গে আমার কাঁধে তোমরা আরেকটা বোঝা এনে চাপিয়ে দিয়েছ। জানি না, আমি এর থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব কিনা।'

'মহামান্য সিপাহসালার!'– হাদিদ বলল– 'এই বোঝা থেকেও আমরা আপনাকে মুক্ত করব। এখন তো এটা আর হতে পারে না যে, আমরা আবার বেদুইনদের কাছে যাব এবং তাদের বলব, তোমরা আমাদের বাহিনীতে এসো না। আপনিই বলুন, আমরা যদি ইসলামের আইন অমান্য করে থাকি, তাহলে এর প্রতিকার কীভাবে করব।'

'সেকথা আমি আমার সালার ও তাদের অধীন দায়িত্বশীলদের বলে দেব'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'বেদইনদের যখন তোমরা ধোঁকা দিয়ে এনেছ, তখন তাদের অধিকারের প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। তাদের ধর্ম ও বোধ-বিশ্বাসে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা যাবে না এবং তাদের মূর্খ বা পশ্চাদপদ মনে করা যাবে না। গনিমতের ভাগে তারা পুরোপুরি অংশ পাবে। লোকগুলো যদি অবাধ্যও হয়, আমাদেরকে তাদের এই অবাধ্যতারও মূল্যায়ন করতে হবে। এই অবাধ্যতাকে তারা তাদের জাতীয় ঐতিহ্য জ্ঞান করে। ঐতিহ্য লালনে তাদের সহযোগিতা করতে হবে।'

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর সব কজন সালারকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদেরকে বেদুইনদের সম্পর্কে বিস্তারিত শোনালেন। পরে আদেশ জারি করলেন, ওদেরকে আপন মুজাহিদদেরও চেয়ে বেশি মর্যাদা দিতে হবে। তিনি বললেন, ইসলাম কুসংস্কারের বিরোধী এজন্য যে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে খুব সহজে ধোঁকা দেওয়া যায়। এক আল্লাহর ধারণা সেই কুসংস্কারকে নির্মূল করে দেয়। আমর ইবনে আস (রাযি.) আরও বললেন, আমরা এই পশ্চাদপদ ও কুসংস্কাচ্ছন্ন বেদুইন সম্প্রদায়টাকে ইসলামে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। তবে তা এখনই নয়।

'চেষ্টার দরকার হবে না মাননীয় সিপাহসালার!'– এক সালার বললেন– 'আমাদের কাছে যখন তারা মর্যাদা পাবে, মূল্যায়ন পাবে, যখন তারা আমাদের সদাচরণ দেখবে, তখন আপনা থেকেই তারা ইসলামে চলে আসবে।'

আমর ইবনে আস (রাযি.) সালারদের সঙ্গে মতবিনিময় করে বেদুইনদের কাজে লাগানোর কৌশল ঠিক করে নিলেন।

* * *

বেদুইনদের বাহিনী আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে সেদিনই চলে এসেছিল নাকি কদিন পরে এসেছে, এমন কোনো তথ্য ইতিহাসে লেখা নেই। তবে তারা এসেছিল। কতজন? কোনো-কোনো ঐতিহাসিক সংখ্যাটা লিখেছেন দু-হাজার। আবার কেউ লিখেছেন, প্রায় তিন হাজার।

এই সংখ্যাটা যদি দশ-বারো হাজার হতো, তাহলে আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর মতো বিচক্ষণ সেনানায়ক অবশ্যই খুশি হতেন না। ইসলামি বাহিনীর সিপাহসালারদের মাঝে একটি মৌলিক গুণ ছিল, তাঁরা সংখ্যার আধিক্যে বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের মূলনীতি ছিল, সংখ্যা কম হোক; কিন্তু তাদের মাঝে চেতনা ও শৃঙ্খলা থাকতে হবে। এটি তাঁদের কাছে পরীক্ষিত বিষয় ছিল। তাঁরা গোটা বিশ্বজগতকে বিস্ময়ের ঘোরে ফেলে দিয়েছিলেন এবং আজ অবধি ইতিহাস তাঁদের সাফল্যের কীর্তিগাথা শোনাচ্ছে।

সৈন্যাধিক্যের বহু উপমাও সেকালে ছিল। ইরানের কেসরার বাহিনীর সংখ্যা প্রতিটি রণাঙ্গনে এক লাখ বিশ হাজারের নিচে নামত না। কিন্তু ইসলামের মাত্র চল্লিশ হাজার মুজাহিদ এই বাহিনীকে প্রতিটি রণাঙ্গনে পরাজিত করেছে এবং কেসরার রাজত্বের নাম-চিহ্ন মুছে দিয়েছে। শামে হেরাকর-এর বাহিনীর সংখ্যা প্রতিটি লড়াইয়ে লাখের উপরে থাকত। কিন্তু মাত্র পাঁচ-দশ হাজারের মুজাহিদ বাহিনী শামের মতো বিশাল রাজ্য থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। হেরাকল-এর অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য মুজাহিদদের তরবারি ও বর্শার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে এবং রোমানদের লাশগুলো মুজাহিদদের পদতলে পিষ্ট হয়েছে। আমর ইবনে আস (রাযি.) বেদুইনদের বাহিনীটা দেখে অবশ্যই খুশি হয়ে থাকবেন। কিন্তু সবার আগে তিনি দেখলেন, লোকগুলোর মাঝে দক্ষতা ও শৃঙ্খলা কতখানি। এমন নয় তো আবার যে, স্বভাবগতভাবেই এরা অবাধ্য এবং মাঠে নেমে কমান্ডারদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের মতো করে যুদ্ধ শুরু করে দেয়।

আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল রসদ। এই প্রয়োজন তাঁকে খানিক বিচলিত করে রেখেছিল। গোয়েন্দারা তাঁকে তথ্য দিয়েছে, রোমান বাহিনী প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে গেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য যাতে গ্রামের লোকেরা

মুসলমানদের কোনো খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে না পারে। সৈন্য পাঠিয়ে গ্রাম থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়ে আনাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, এই অভিযানে গ্রামে-গ্রামে লড়াই বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাঁর বাহিনীতে এত সংখ্যক সৈন্যও নেই যে, তিনি এই ঝুঁকিটা বরণ করে নিতে পারেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) সালারদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, এ কাজে বেদুইনদের ব্যবহার করা হবে। বেদুইনদের এমন একজন নেতাও এসেছে, যার এখনও যুদ্ধ করার বয়স আছে। আমর ইবনে আস (রাযি.) তাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের জন্য তাদেরই মধ্য থেকে একজন করে কমান্ডার নিযুক্ত করে দিলেন আর সেই কমান্ডারের সঙ্গে নিজেদের একজন করে লোক দিয়ে দিলেন।

আমর ইবনে আস (রাযি.) বেদুইন নেতাদের নিজের পাশে বসিয়ে জরুরি কিছু নির্দেশনা দিলেন। বললেন, অভিযানে অগ্রসরমান একটি বাহিনীর জন্য রসদ অতীব প্রয়োজন। যদি খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব দেখা দেয়, তাহলে বাহিনী লড়াই করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং দুশমন এই দুর্বলতা থেকে পুরোপুরি স্বার্থ উদ্ধার করে নেয়। এজাতীয় আরও কিছু কথা বলে আমর ইবনে আস (রাযি.) নেতাদের বলে দিলেন, রসদ সংগ্রহ করা তোমাদের কাজ। আর রসদ মানে তরিতরকারি আর মুসলমানদের জন্য হালাল গবাদি পশু।

এই কাজটা সম্ভবত বেদুইনদের স্বভাবের অনুকূল ছিল। তাদের নেতারা এই দায়িত্বটা খুশিমনে বরণ করে নিল এবং আমর ইবনে আসকে নিশ্চয়তা দিল, আপনার মুজাহিদ বাহিনীকে আমরা রসদের অভাব টেরই পেতে দেব না।

'কিন্তু একটা বিষয় মাথায় বসিয়ে নাও'– আমর ইবনে আস (রাযি.) বললেন– 'তরিতরকারি ও গবাদি পশু আনার অর্থ হলো, শুধু এই জিনিসগুলো সংগ্রহ করবে– অন্য কোনো লুটমার হবে না, কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাবে না। এমন ছোট-ছোট গ্রাম নয়– আমরা বড়-বড় অনেক শহর-নগরী জয় করতে বের হয়েছি। আসল ধনভাণ্ডার আমরা সেসব অঞ্চল থেকে অর্জন করব, যেখান থেকে তোমরা পুরোপুরি ভাগ পাবে। আরও একটা কথা মাথায় রেখো; প্রতিটি গ্রামে রোমান বাহিনী বিদ্যমান রয়েছে। তারা তোমাদের মোকাবেলা করবে। একটা রোমান সৈন্যকেও জীবিত ছাড়বে না। কিন্তু কোনো গ্রামবাসীর গায়ে হাত তোলা যাবে না।

একটা সুবিধা এও পাওয়া গেল যে, এই বেদুইনরা প্রতিটি গ্রাম সম্পর্কে অবহিত ছিল। তরিতরকারি ও গবাদি পশু কোন-কোন গ্রামে পাওয়া যায়, তা তাদের জানা ছিল। যেসব বেদুইনের কাছে ঘোড়া ছিল না, তাদের ঘোড়া দেওয়া হলো। কাউকে-কাউকে উট দেওয়া হলো। তাদের পুরোটা বাহিনী পল্লী অঞ্চলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর রসদ-বিষয়ক সমস্যার সমাধান হয়নি বটে; কিন্তু তার ব্যবস্থা একটা হয়েছে। আশা তৈরি হয়েছে, বাহিনীকে না খেয়ে থাকতে হবে না। তিনি রওনার আদেশ জারি করে দিলেন। তিনি জানতেন, অগ্রযাত্রায় যত বেশি বিলম্ব হবে, দুশমন তত বেশি প্রস্তুতির সুযোগ পেয়ে যাবে। পাশাপাশি এই সতর্কতাও জরুরি ছিল যে, বাহিনীতে কোনো প্রকার দুর্বলতা বা ঘাটতি যেন রয়ে না যায়। অগ্রযাত্রার গতি মন্থরই রাখা হলো। কারণ, রসদের ব্যাপারটা এখনও পর্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়ে গেছে।

সারা দিনের সফরের পর রাতে অস্থায়ী ছাউনি স্থাপন করা হলো। ফজর নামাযের পরপর বাহিনী আবারও রওনা হলো। মরু-অঞ্চল নিঃশেষ হয়ে আসছে। কোথাও-কোথাও সবুজ ঘাস-বন ও গাছগাছালি চোখে পড়তে শুরু করল।

এই দিনটাও কেটে গেল। বাহিনী এমন একটা জায়গায় গিয়ে উপনীত হলো, যেখানে মরুভূমির লক্ষণ-আলামত শেষে হয়ে গেছে এবং সবুজের সমারোহ শুরু হয়েছে। আরও একটুখানি পথ অতিক্রম করার পর একটা কূপ পাওয়া গেল। সেখান থেকে মুজাহিদরা মশক ভরে-ভরে পানি নিয়ে নিল এবং উট-ঘোড়াগুলোকেও পান করাল। এভাবে সমস্যা ধীরে-ধীরে কমতে শুরু করল।

মধ্যরাতে হঠাৎ সান্ত্রীরা বাহিনীকে জাগাতে শুরু করল এবং হইচই পড়ে গেল। রাতের আঁধারে এমন কিছু শব্দ শোনা গেল, যেন শত্রুবাহিনী আক্রমণের জন্য ছুটে আসছে। মুজাহিদরা খুব দ্রুততার সঙ্গে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আমর ইবনে আস তাঁর বাহিনীকে মোকাবেলার বিন্যাসে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হামলার আশঙ্কা সব সময়ই বিদ্যমান ছিল। দেশটা তো শত্রুদের। দুশমন যেকোনো সময় যেকোনো চালই চালতে পারে।

ঘোড়ার এই তুফানটা কাছাকাছি এলে এমন কিছু শোর-শব্দ ও ধ্বনি কানে এল, যেগুলো রোমান বাহিনীর হতে পারে না। সিপাহসালার বাতি জ্বালাতে আদেশ দিলেন। দেখতে-না-দেখতেই অনেকগুলো প্রদীপ জ্বলে উঠল। পরক্ষণে আগত ঘোড়াগুলো আরও কাছাকাছি এলে তখন খবর হলো, এরা বেদুইনদের দুটা বাহিনী।

বেদুইনদের প্রতিটি বাহিনীকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যখন ফিরে আসবে, তখন মূল বাহিনীকে পরবর্তী কোনো ছাউনিতে পাবে। সেজন্য এই দুটা বাহিনী পিছনের ছাউনির দিকে না গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে।

এই বাহিনীদুটোর কয়েকজন বেদুইন তাদের সঙ্গে নেই। তারা পিছনে রসদের সঙ্গে আসছে। এই রসদগুলো তারা কোনো একটা পল্লী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছে। রসদ যখন এল, তখন মুসলিম বাহিনী আনন্দে তাকবির ধ্বনি দিয়ে উঠল। অনেকগুলো গাভি, ভেড়া, বকরি, উট ও ষাড়। তরিতরকারির বস্তাগুলো ষাড় আর

উটগুলোর পিঠে বোঝাই করা। কয়েকটা গাড়িও আছে, যেগুলো কতগুলো গাভি টেনে এনেছে।

মাত্র চার-পাঁচটা গ্রামের উপর বেদুইনরা ঝটিকা আক্রমণ চালালে রোমান বাহিনী সজাগ হয়ে গেল। কিন্তু মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ তারা পেল না। বেদুইনরা তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলল। তারপর এলাকাবাসীদের বলল, তোমরা আপনা থেকেই তরিতরকারি ও গবাদি পশু সংগ্রহ করে দাও; আমরা তোমাদের কোনো কষ্ট দেব না। গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ করবে কী; বরং বিপুল পরিমাণ তরিতরকারি ও গবাদি সংগ্রহ করে তাদের হাতে তুলে দিল। গ্রামবাসীদের আগেই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল, তোমাদের ঘর-বাড়ি লুট করা হবে না এবং নারীদের প্রতি হাত বাড়ানো হবে না।

প্রতিটি বাহিনীর সঙ্গে একজন করে মুসলিম কমান্ডার ছিল। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর আদেশ অনুসারে পল্লীবাসীদের বলে দেওয়া হলো, এসব জিনিসপত্র বেদুইনরা নিজেদের জন্য নিচ্ছে না; বরং মুসলিম বাহিনীর জন্য সংগ্রহ করছে। কমান্ডাররা তাদের স্পষ্ট করে দিল, মুসলমানরা মিশর জয় করতে এসেছে। এই অভিযানে যদি তারা সফল হয়, তাহলে তোমাদের থেকে যে-সম্পদ নেওয়া হলো, তার ́পুরোপুরি বিনিময় দেওয়া হবে। তোমরা যদি রোমান বাহিনীকে সাহায্য কর আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও, তাহলে শত্রু মনে করে তোমাদের সঙ্গে সেই আচরণ করা হবে, যেমনটা বিজিত শত্রুদের সঙ্গে করা হয়।

ফরমা এখন আর বেশি দূরে নয়। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর রসদ-সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। বেদুইনদের অন্যান্য বাহিনীগুলোও তরিতরকারি ও গবাদি পশু আনছে। এত পরিমাণ রসদ সঞ্চিত হয়ে গেল যে, দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত আর রসদের ভাবনা ভাবতে হবে না। বেদুইনরা আরও একটা সমস্যার সমাধান করে দিল। তাহলো, তারা প্রমাণিত করে দেখিয়েছে, তারা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। যদি সঠিক নির্দেশনা দিয়ে তাদের পরিচালনা করা যায়, তাহলে ভালো-মন্দ সব পরিস্থিতিতে তারা নির্ভরযোগ্যই থাকবে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) এই ছাউনি থেকেও রওনা হলেন এবং আরও একটা ছাউনি ফেললেন। আরিশ থেকে ফরমা পর্যন্ত দূরত্ব মাত্র সত্তর মাইল। এই সফরে এতগুলো বিরতি দেওয়ার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। মুসলিম বাহিনী তো অতিশয় দ্রুতই অগ্রযাত্রা করে থাকে। কিন্তু এই অভিযানে আমর ইবনে আস জেনে-বুঝেই বেশি-বেশি বিরতি নিচ্ছেন। এটা তার শেষ বিরতি। এখান থেকেই তাঁকে সোজা ফরমা পৌঁছে যেতে হবে এবং এই ঐতিহাসিক নগরীটা অবরোধে নিয়ে নিতে হবে।

এই শেষ ছাউনিতে আমর ইবনে আস (রাযি.) বাহিনীকে নতুন করে বিন্যস্ত করলেন এবং সালারদের দায়িত্বগুলো নতুনভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে বেদুইনদের সবগুলো বাহিনী ফিরে এসেছে।

আমর ইবনে আস (রাযি.) সালারদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, বেদুইনদের বর্তমান বাহিনীটা ভেঙে দিবেন এবং তাদেরকে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে দিবেন, যাতে তাদের আলাদা কোনো বাহিনী না থাকে। কারণ, যত যা কিছুই হোক তারা অমুসলিম। ফলে যেকোনো সময় তারা রোমানদের সঙ্গে চলে যেতে পারে। অবশেষে তা-ই করা হলো। বেদুইন বাহিনীটাকে ভেঙে মুসলিম বাহিনীতে ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

লড়াই শুরু করার আগে ইসলামের সৈনিকদের উত্তেজিত করে তোলার জন্য আগুনঝরা ভাষণ দিতে হবে এমন প্রয়োজন খুব কমই অনুভব করা হতো। কিন্তু মাঝে-মধ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যেত যে, মুজাহিদদের মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ত, যে-বিজয় তোমরা অর্জন করতে যাচ্ছ, তাতে সফলতা লাভ করা সহজ কাজ নয়, দুশমন তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং তোমাদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। আর না জানি তারা প্রতিরক্ষার কত কী আয়োজন করে রেখেছে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) আবশ্যক মনে করলেন, বাহিনীকে সাবধান করে দেবেন, তারা কেমন ঝুঁকির মধ্যে যাচ্ছে। তিনি গোটা বাহিনীকে– যাদের মাঝে বেদুইন যোদ্ধারাও ছিল– এক জায়গায় সমবেত করলেন এবং তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। ইতিহাসে তার সেই ভাষণের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ তার কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ লিপিবদ্ধ করেছেন।

এলফার্ড বাটলার লিখেছেন, আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর বাহিনীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন–

'আমরা মিশরগামী সেই পথে যাচ্ছি, যেটি একটি ঐতিহাসিক ও প্রাচীনতম পথ। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে এ-পথেই মিশর এসেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.). হযরত ইউসুফ (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) এ-পথেই মিশর পৌঁছেছিলেন। হযরত মুসা (আ.)-এর গোটা পরিবার ফেরাউনের জাদুকরদের থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং এবং তাদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলে মিশর থেকে আরব বিশ্বে এ-পথেই এসেছিলেন। এই সেই নীলনদ, যে হযরত মুসা (আ.) ও বনী ইসরাইলদের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল এবং তাদের ধাওয়া করতে আসা ফেরাউন রামেসিস দ্বিতীয় যখন তাতে উঠে গিয়েছিল, তখন নীল তার রাস্তা বিলীন করে দিয়ে তাকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছিল। এটি একটি পবিত্র ও বরকতময় পথ। এটি আমাদের নবীদের পথ। মনে করো না, আমরা

কোনো দেশ জয় করতে এসেছি। এটি আমাদের নিজেদের ভূখণ্ড। এটি আমাদেরই দেশ। এ দেশে শুধু আল্লাহ শাসন চলবে আর এই শাসন তোমরা প্রতিষ্ঠা করবে ইনশাআল্লাহ।...

'এ-পথের পবিত্রতার অনুমান এভাবে করো যে, যেসব মুসলমান মিশর ও আফ্রিকা থেকে হজে যায়, তারা এ-পথেই যায়। এই পথটি শুধু মুসলমানদেরই জন্য নয়– খ্রিস্টানদের জন্যও পবিত্র। খ্রিস্টানরা এ-পথেই বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়া-আসা করে। এটি হযরত ঈসা (আ.)-এর পথ। কিন্তু একজন রাজা মিশরে খ্রিস্টবাদের চেহারাটা বিকৃত করে ফেলেছেন এবং তিনি নিজের মতো করে একটা খ্রিস্টবাদ তৈরি করে দিয়েছেন আর ধর্মের প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতার খাতিরে প্রকৃত খ্রিস্টবাদের হাজারো অনুসারীকে হত্যা করেছেন। আমরা সেই নির্যাযিত-নিপীড়িত খ্রিস্টানদের হেরাকল-এর সরকারি খ্রিস্টবাদ, তার বর্বরতা ও নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর এই ভাষণে খ্রিস্টবাদের প্রসঙ্গ টেনে আনা সম্ভবত এজন্য জরুরি মনে করেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে বেদুইনদের যে-বাহিনীটা ছিল, তারা নিঃসন্দেহে কুসংস্কারের পূজারি ছিল বটে; কিন্তু মৌলিকভাবে ছিল তারা খ্রিস্টান। তাদের রক্তে জোশ তৈরি করা এবং রোমানদের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করে তোলা জরুরি ছিল। বাস্তবতাও এটিই ছিল যে, আমর ইবনে আস (রাযি.) যখন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)কে মিশর-অভিযানের যৌক্তিকতা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন তিনি বিশেষভাবে খ্রিস্টানদের উপর হেরাকল-এর নিপীড়ন, হত্যাযজ্ঞ ও লুটমারের কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, খ্রিস্টানরা আহলে কিতাব। কোনো রাজা কিংবা কোনো সম্প্রদায় যদি আহলে কিতাবের উপর নিপীড়ন চালায় আর তাদের জিজ্ঞাসা ও সহায়তা করার মতো যদি কেউ না থাকে, তখন তাদের উদ্ধারে এগিয়ে যাওয়া মুসলমানদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

আমর ইবনে আস (রাযি.) খুবই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সেনানায়ক ছিলেন। তিনি বুঝতেন, প্রকৃত খ্রিস্টবাদের প্রধান যাজক বিনয়ামিন আমাদের পক্ষে যদিও যুদ্ধের ময়দানে কার্যকরভাবে অবতীর্ণ না হন, পরদার আড়াল থেকে অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

তারপর আমর ইবনে আস বাহিনীকে ফরমার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিলেন। দুর্গবদ্ধ এই নগরীটা কোনো খোলা জায়গায় নয়– একটা পাথুরে কিসিমের পাহাড়ের উপর। নগরীটা শুধু নিরাপত্তা প্রাচীর দ্বারা-ই বেষ্টিত নয়– বরং বড় একটা দুর্গ ছাড়াও আশেপাশে ছোট-ছোট অনেকগুলো দুর্গ বিদ্যমান। তিনি আরও বললেন, ফরমায় রোমানদের যে-বাহিনীটা আছে, তাদের সংখ্যা তোমাদের চেয়ে তিন থেকে

চার গুণ বেশি। আরও বললেন, আমাদের কাছে অবরোধের পর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জাম নেই। এই শঙ্কার ব্যাপারেও তিনি বাহিনীকে অবহিত করলেন যে, রোমানরা অবরোধের পেছন থেকেও আক্রমণ চালাতে পারে। খ্যাতনামা মুসলিম ঐতিহাসিক মুকরীযি ও ইবনে আবুদল হাকাম লিখেছেন, এই সবগুলো বিষয় শুনিয়ে আমর ইবনে আস (রাযি.) বাহিনীর উদ্দেশে এবার বললেন–

'মুজাহিদীনে ইসলাম! ইসলামের সৈনিকগণ! এমনটা ভেবো না, আমরা সংখ্যায় কম এবং আমাদের সরঞ্জামও অপ্রতুল। কেন? আমরা কি প্রতিটি রণাঙ্গনেই অল্প ছিলাম না? তোমরা কি শামে এই রোমানদেরই এক-এক লাখ সৈন্যকে নিজেরা সংখ্যায় এরূপ অল্প হওয়া সত্ত্বেও একের-পর-এক পরাজয় দান করনি? এই রোমান বাহিনীকেই কি শামে তোমরা কচুকাটা করনি? ওখান থেকে এদের বিতাড়িত করনি? তোমাদের সেই ভয়ে আজও তারা থরথর করে কাঁপছে। তোমাদের ভীতি আজও তাদের চেপে ধেরে রেখেছে। প্রতিটি রণাঙ্গনে আমরা শুধু এজন্য জয়লাভ করেছি যে, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মহান আল্লাহ্ এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, যারা আমার ও আমার রাসূলের আনুগত্য করল এবং আমার পথে জিহাদ করল, সংখ্যায় তারা যতই কম হোক, তাদের মাঝে যতই দুর্বলতা থাকুক, আমি তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করব। তোমরা শত্রুকে সন্ত্রস্ত করে তোলো– নিজেরা শত্রু দ্বারা ভীত হয়ো না। এই ফরমা নগরীটা যদি আমরা দখল করে নিতে পারি, তাহলে ধরে নাও, দুশমনের উপর আমরা আরেকবার বিজয়ী হলাম। আর তার ফলে মিশর ইসলামি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

* * *

আরিশ দখল করেই আমর ইবনে আস (রাযি.) বিনয়ামিনের সঙ্গে কথা বলতে দুজন গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর আগেও দুজন গোয়েন্দা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এসেছে। এটা সে-সময়কার ঘটনা, যখন মিশর-অভিযানে সবে আলাপ-আলোচনা চলছিল। আমীরুল মুমিনীন তখনও আমর ইবনে আসকে এই অভিযানের অনুমতি দেননি। আরিশজয়ের পর আমর ইবনে আস শেষবারের মতো বিনয়ামিনের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া জরুরি মনে করলেন।

গোয়েন্দাদ্বয় বিনয়ামিনের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসেছে। আমর ইবনে আস বিনয়ামিনকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, রোমান বাহিনীতে মিশরের যে-কিবতি খ্রিস্টানরা আছে, তারা যেন আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে আর সাধারণ কিবতিরা যেন কোনোভাবেই রোমান বাহিনীকে সহযোগিতা না দেয়। সম্ভব হলে যেন তারা হেরাকল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

বিনয়ামিন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী মানুষ ছিলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর এই গোয়েন্দাদ্বয়কে তিনি মৌখিক বার্তা দিয়ে বিদায় দিলেন। তিনি বললেন, আমি জনতাকে বিদ্রোহের জন্য উসকানি দেব না। কারণ, এখনও বলা যাচ্ছে না, এই লড়াইয়ে জিতবে কে। হেরাকল জিতবে, নাকি আমর ইবনে আস। কিবতিরা যদি বিদ্রোহ করে আর খোদা না করুন যদি মুসলমানরা পরাজিত হয়ে যায়, তাহলে হেরাকল একজন কিবতি খ্রিস্টানকেও জ্যান্ত রাখবে না। তাদের নারী-শিশুদেরও তিনি হত্যা করে ফেলবেন। তাছাড়া জনতাকে উত্তেজিত করে তুলবার কোনো আবশ্যকাতাও নেই। এমনিতেই তারা ক্ষ্যাপা। হেরাকল একজন কিবতি খ্রিস্টানকেও তার পক্ষে পাবে না। তার হিংস্রতার কথা কিবতিরা কোনোদিনও ভুলবে না। তারা তাদের ছেলেদের হেরাকল-এর বাহিনীতে যেতে দেবে না। হেরাকল যদি বাধ্য করে, তাহলে কিবতিদের যুবক ছেলেরা লোকালয় ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যাবে।

বিনয়ামিন আরও বললেন, যেসব কিবতি খ্রিস্টান হেরাকল-এর বাহিনীতে আছে, তাদেরও কিছু বলা অনাবশ্যক। রোমানদের বিরুদ্ধে তারা এতই ক্ষিপ্ত যে, প্রাণহানিকর কোনো লড়াইয়ে তারা অংশই নেবে না।

মোটকথা, বিনয়ামিন আমর ইবনে আসকে যে-বার্তাটি পাঠালেন, তার সারমর্ম ছিল, কিবতিদের দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানদের পক্ষে এবং সম্রাট হেরাকল ও তার বাহিনীর একেবারেই বিপক্ষে। আর এর জন্য হেরাকলকে অপরিমেয় ক্ষতির শিকার হতে হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

এই উত্তরে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) আশ্বস্ত হয়ে গেলেন।

দুজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ইতিহাসের ছোট-ছোট কতগুলো ঘটনা বিশ্লেষণের সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারা এসকান্দারিয়ার একটি মিটিং-এর কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানকার উপস্থিতিদের একজন ছিলেন মুকাওকিস, একজন সেনাপতি আতরাবুন আর অপরজন হেরাকল-এর সরকারি খ্রিস্টবাদের প্রধান বিশপ কায়রাস। মুকাওকিস বললেন, আমি ফরমার প্রতিরক্ষা এতখানিই শক্ত ও মজবুত করে দিয়েছি যে, তাকে জয় করা মুসলমানদের সাধ্যের অতীত। আমাদের ফরমা নগরী মুসলমানরা নিতে পারবে না। কিন্তু কিবতি খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আমার খানিক উদ্বেগ আছে।

'প্রধান বিশপ!'– মুকাওকিস কায়রাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন– 'আপনি কি খ্রিস্টানদের মাঝে সেই জযবা সৃষ্টি করতে পারেন না, যেমনটি মুসলমানদের মাঝে আছে?'

'না; পারি না'– কায়রাস সাফ-সাফ উত্তর দিলেন– 'আপনি কি জানেন না, কিবতি খ্রিস্টানরা আমাকে হেরাকল-এর কসাই বলে ডাকে? আমার হাত তাদের যে-রক্ত

ঝরিয়েছে, তার ক্ষমা আমি কোনোদিনও পাব না। কিবতি খ্রিস্টানরা কোনোকালেও আমাকে ক্ষমা করবে না। নিহত ব্যক্তির স্বজনদের কাছে ঘাতকের করুণার আশা না রাখা-ই উচিত। আমি তাদের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি।'

তিনজনের মাঝে বেশ কিছু সময় মতবিনিময় হতে থাকল। মুকাওকিস ও আতরাবুন কায়রাসকে বারবারই বলছিলেন, আপনি বিভিন্ন শহরে যান এবং জনতাকে গির্জায় দাওয়াত করে এনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলুন। কিন্তু কায়রাস সম্মত হচ্ছিলেন না। তিনি বলছিলেন, জনগণ নয়– আমাকে বিশপ বানিয়েছেন হেরাকল। জনগণ আমাকে সরকারি জল্লাদ হিসেবে চেনে। তারা আমাকে ধর্মনেতা মানে না।'

শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, মুকাওকিস আগামী কাল জনতা ও সেনাবাহিনীকে রেসক্রস ময়দানে সমবেত করে ভাষণ দিবেন। জনগণ যদি এই ভাষণকে স্বাগত জানায়, বরণ করে নেয়, তাহলে অন্যান্য বড়-বড় শহরেও সমাবেশের আয়োজন করে তিনি ভাষণ দান করবেন।

'আমি ভাষণ-বক্তৃতার আবশ্যকতা বুঝি না'– আতরাবুন বলল– 'বাহিনীটা আমি যেভাবে প্রস্তুত করেছি, তাতে আশা করা যায়, তারা ঠিকঠাকভাবে লড়াই করবে। তবে আমি মুসলমানদেরও জানি। জীবনের বাজি লাগিয়ে লড়াই করার মতো মানুষ তারা। আমাদের বাহিনীর ব্যাপক প্রাণহানি ঘটবে। শাম থেকে আমি এই অভিজ্ঞতা-ই অর্জন করেছি। সংখ্যার ঘাটতি পূরণ করার জন্য আমাদের অতিরিক্ত জওয়ানের প্রয়োজন হবে। তার একটা পন্থা হলো, খুবই অনলবর্ষী ও আবেগময় বক্তৃতার মাধ্যমে জনতাকে বাহিনীতে ভর্তি হতে উৎসাহিত করতে হবে।'

* * *

এসকান্দারিয়া নগরী ও তার আশপাশের পল্লী অঞ্চলগুলোতে যত দূর পর্যন্ত অশ্বারোহী হরকরার পৌঁছা সম্ভব ছিল, তত দূর পর্যন্ত আগামী কাল অমুক সময় মিশরের শাসনকর্তা মুকাওকিস ভাষণ দান করবেন এবং জনতার উদ্দেশে অত্যন্ত জরুরি কিছু কথা বলবেন। গ্রামীণ জনতা দলে-দলে সমাবেশস্থলে পৌঁছতে লাগল। শাসনকর্তা মুকাওকিসের ভাষণ সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। এর আগে কখনও তিনি এমনটি করেননি। প্রকাশ্য জনসভায় এটিই তার প্রথম বক্তৃতা। পল্লী অঞ্চলের মানুষ এখনও জানেই না, মুসলমানরা মিশরে ঢুকে পড়েছে এবং তারা আরিশ নগরীটাও দখল করে নিয়েছে। তারপর এখন তারা তীব্রগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

একজন রাষ্ট্রনায়ক ভাষণ দিবেন। তার জন্যই এই সমাবেশের আয়োজন। কাজেই আয়োজনটা সম্পন্ন হতে সময় লাগল না। রেসক্রসে একটা মঞ্চ তৈরি করা হলো।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সেনাবাহিনীর সদস্যরা ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলো। চারদিক থেকে জনতাও এসে-এসে ভিড় জমাতে লাগল। দেখতে-না-দেখতে বিশাল ময়দানটা কানায়-কানায় ভরে গেল। এখন আর তাতে দাঁড়াবারও জায়গা নেই।

মুকাওকিস রাজশটকে চড়ে রাজকীয় ধারায় ময়দানে এসে পৌঁছলেন এবং মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিরাপত্তা বাহিনীর অশ্বারোহী সৈনিকরা তার সামনে, ডানে, বাঁয়ে ও পিছনে একই বিন্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সে-সময় প্রয়োজন ছিল এবং পরিস্থিতির দাবিও এটিই ছিল যে, মুকাওকিস রাজকীয় ধারা পরিহার করে মুসলমানদের মতো একজন সাধারণ মানুষের মতো এসে মঞ্চে দাঁড়াতেন এবং বোঝাতেন, আমি তোমাদেরই একজন। কিন্তু রাজত্বের নেশা এমনই ছিল যে, একটা মুহূর্তের জন্যও তা বর্জন করা সম্ভব ছিল না। মুকাওকিস প্রথমে তার সেনাবাহিনীর উপর এবং পরে বিশাল জনসমুদ্রের উপর চোখ বোলালেন। তাতে রাজত্বের নেশা তার আরও তীব্র হয়ে উঠল।

মিশরের সম্রাট ছিলেন হেরাকল। মুকাওকিস ছিলেন তার স্থলাভিষিক্ত, যাকে ভাইসরয় বলা যায়। কিন্তু মুকাওকিস জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন, তিনি হেরাকল-এর চেয়ে কোনো অংশেই কম নন।

'বীর রোমান সৈনিকগণ! আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মিশরবাসীগণ!'– মুকাওকিস ফুসফুসের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে সুউচ্চ কণ্ঠে বললেন– 'মুসলমানরা এবার তোমাদের ঘরে এসে পৌঁছেছে। তারা এই সুধারণা নিয়ে এসেছে যে, তোমাদেরকে এখানেও পরাজিত করবে। ইতিমধ্যে তারা আমাদের আরিশ নগরীটা দখল করে নিয়েছে। এই নগরী তারা যুদ্ধ করে কব্জা করেনি। বরং আমরা-ই তাদের সেই সুযোগটা তৈরি করে দিয়েছি যে, ঠিক আছে নিয়ে নাও। এটা ছিল তাদের ফাঁদে ফেলার জন্য আমাদের কৌশল, যাতে তারা একজনও এ দেশে থেকে নিরাপদে ফিরে যেতে না পারে। এবার তারা ফরমার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। মৃত্যু তাদের দ্রুতগতিতে আমাদের পাতা ফাঁদে নিয়ে আসছে।'

তারপর তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলানদের বিরুদ্ধে আচ্ছামতো বিষ উদগীরণ করলেন এবং খ্রিস্টানদের জগতের সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী বাহিনী বলে অভিহিত করে বললেন, পৃথিবীতে একটিমাত্র ধর্মের শাসন চলবে। আর সেটি হলো খ্রিস্টবাদ।

'কিন্তু এটা তখন সম্ভব হবে, যখন তোমরা খ্রিস্টবাদের সুরক্ষায় জীবনের বাজি লাগিয়ে মাঠে নেমে আসবে'– 'আজ দেশ ও ধর্ম কুরবানি দাবি করছে। শামের মতো যদি তোমরা মিশরকেও মুসলমানদের দিয়ে দাও, তাহলে খ্রিস্টবাদের এখানেই পতন ঘটবে আর এদেশে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

তোমরাও মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে যাবে। সেই লোকগুলো খুবই ভীরু ও আত্মমর্যাদাহীন ছিল, যারা শামের মতো বৃহৎ দেশটাকে মুসলমানদের নাপাক পায়ে নিক্ষেপ করে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু তোমরা মিশরিরা কাপুরুষ হতে পার না। আমি জানি, তোমাদের তরবারি মুসলমানদের রক্তের পিপাসু। মুসলমানরা আসছে। তোমরা তোমদের তরবারিগুলোর পিপাসা নিবারণ করে নাও। তোমরা শামের পরাজয়ের বদলা মন খুলে নিয়ে নাও।'

মুকাওকিসের ভাষণ ক্রমে জোরদার হতে চলল। তারপর তা আবেগময়তার রূপ ধারণ করল। কিন্তু তিনি দেখলেন,শ্রোতারা কোনোই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে না। তাদের মাঝে জোশ-আবেগের লেশও দেখা যাচ্ছে না। এরূপ ভাষণ-বক্তৃতার সময় জনতা মুহুর্মুহু স্লোগান তুলে আসমান-জমিন এক করে ফেলে। আবেগের আতিশয্যে গগনবিদারী ধ্বনি তোলে, অমুক তুমি এগিয়ে চলো; আমরা আছি তোমার সাথে। দিয়েছি তো রক্ত; আরও দেব রক্ত ইত্যাদি। কিন্তু মিশরের রেসক্রসের এই শ্রোতারা যেন কাঠের পুতুল। নীরবতা তাদের ঝাপটে ধরে রেখেছে।

মুকাওকিস শেষমেশ বললেন, শামে আমাদের সম্রাট হেরাকল যে-ভুলটা করেছেন, তাহলো, তিনি ভেবেছিলেন, মুসলমানরা সংখ্যায় নগণ্য; কাজেই আমরা অতি অনায়াসে তাদের পরাজিত করে ফেলব। কিন্তু ফল বেরিয়েছে তার সম্পূর্ণ উলটো। মুকাওকিস তার কয়েকটা কারণ ব্যাখ্যা করলেন এবং যে-বাহিনীটা শামে পরাজিত হয়েছে, তাদের সমালোচনা করলেন, তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেন। পরে বললেন, আমি একটি নতুন বাহিনী গঠন করতে চাই। এর জন্য আমার একদল চেতনাসম্পন্ন দুঃসাহসী যুবক দরকার। তিনি আরও অধিক আগুনঝরা, আবেগময় ও জোরালো কথা বলে যুবা-তরুণদের উত্তেজিত করে তুলতে চেষ্টা করলেন যে, তোমরা এখনই ফৌজে শামিল হয়ে যাও।

মুকাওকিস সম্ভবত মানবীয় স্বভাবের এই দিকটা উপেক্ষা করছিলেন যে, জোরপূর্বক মানুষের উপর শাসন চালানো যায়; কিন্তু বল প্রয়োগ করে তাদের থেকে কুরবানি আদায় করা যায় না। মুকাওকিস দেখলেন, তার অনলবর্ষী ভাষণেরও জবাবেও এই বিশাল জনসমুদ্রে কোনোই ঢেউ-তরঙ্গ জাগছে না। এবারও জনতা একদম নীরব। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। সেনাপতি আতরাবুন মুকাওকিসের পাশে দাঁড়ানো। তিনি মুকাওকিসকে ইশারা করলেন, এবার থেমে যান; ভাষণ শেষ করে দিন। মুকাওকিস ইঙ্গিতটা বুঝেও ভাষণ অব্যাহত রাখলেন এবং আরেকবার খ্রিস্টবাদের নাম উচ্চারণ করলেন।

'শুধু একটা কথার উত্তর দিন'– সামনে থেকে একব্যক্তি দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে বলল– 'আপনি কোন খ্রিস্টবাদের কথা বলছেন? সম্রাট হেরাকল ও কায়রাসের? নাকি প্রধান যাজক বিনয়ামিনের?

মুকাওকিস থমকে গেলেন। তার ভাষণ বন্ধ হয়ে গেল। প্রশ্নটা তাকে হতভম্ব করে দিল। কিন্তু রাজপরিবারের সন্তান বলে কথা। তার মাথায় রাগ চড়ে গেল; কিন্তু ক্ষোভটা কাউকে বুঝতে দিলেন না। পাশে থেকে আতরাবুন তাকে বললেন, কিবতিদের মতিগতি ভয়াবহ মনে হচ্ছে!

'দেখো তো লোকটা কে?'– মুকাওকিস আদেশের সুরে বললেন– 'তার এই অবমাননাকর প্রশ্নে আমার চেয়ে বেশি সম্রাট হেরাকল ও তোমাদের মানহানি ঘটেছে। গ্রেফতার করে লোকটাকে শাস্তি দিতে হবে।'

'না'– আতরাবুন বললেন– 'আপনার সঙ্গে আমিও একমত যে, লোকটাকে ধরে শিক্ষামূলক সাজা দেওয়া দরকার। কিন্তু পরিস্থিতির দাবি হলো, এ মুহূর্তে আমাদেরকে সহনশীলতা ও কোমলতার পরিচয় দিতে হবে। কঠোরতার পথে হাঁটতে গেলে কিবতিরা আমাদের অবাধ্য ও বিদ্রোহী হয়ে যাবে।'

মুকাওকিস ও আতরাবুন চরম ক্ষোভ, লজ্জা ও অপমানের গ্লানি মাথায় নিয়ে ওখান থেকে ফিরে এলেন। মুকাওকিস তাৎক্ষণিকভাবে দুটি কাজ করলেন। এক হলো, জরুরি বার্তা দিয়ে একজন দূত সম্রাট হেরাকল-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন যে, মুসলমানরা ফরমার সন্নিকটে চলে এসেছে আর কিবতি খ্রিস্টানদের ভাব-গতি বিরোধদমূলক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ মুহূর্তে আমি কী করব সিদ্ধান্ত দিন।

মুকাওকিস অপর যে-কাজটি করলেন, তাহলো, তিনি দ্রুত সেই বাহিনীটিকে ফরমার উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিলেন, যাদের মাঝে রোমান সৈন্য বেশি আর কিবতি খ্রিস্টান কম কিংবা না থাকার মতো ছিল। তিনি এই বাহিনীকে আদেশ দিলেন, যত দ্রুত সম্ভব তোমরা ফরমা পৌঁছে যাও আর ওখানে যে-বাহিনীটা বিদ্যমান, তাতে কিবতি খ্রিস্টানদের ইউনিটও আছে। তাদেরকে এসকান্দারিয়া পাঠিয়ে দাও· মুকাওকিস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন, ফরমায় যদি কিবতি খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি হয়, তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীটা তারা এমনিতেই মুসলমানদের হাতে তুলে দেবে।

সম্রাট হেরাকল বাজিন্তিয়ায় ছিলেন। বাজিন্তিয়ার অবস্থান অনেক দূরে ছিল। দূতের যাওয়া ও ফিরে আসায় কয়েক দিন সময়ের প্রয়োজন ছিল। এদিকে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) ফরমার অনেক কাছাকাছি চলে এসেছেন।

* * *

লক্ষ্যে পৌঁছতে মুসলিম বাহিনীর আরও কয়েক দিন সময় ব্যয় হয়ে গেল। এই ফাঁকে এসকান্দারিয়া থেকে মুকাওকিসের পাঠানো রোমান বাহিনীও ফরমা পৌঁছে গেল। এসেই তারা ফরমার বাহিনী থেকে কিবতি খ্রিস্টানদের বের করে দিল। এভাবে ফরমার প্রতিরক্ষা আরও মজবুত হয়ে গেল।

মুজাহিদরা ফরমাকে অবরোধে নিয়ে নিল। কিন্তু নগরীর অবস্থান পাহাড়ের উপর হওয়ার কারণে নগরীর আশপাশের জায়গা ছিল সংকীর্ণ। ফলে নগরীর প্রাচীর ও দুর্গ থেকে আসা তির সহজেই মুসলমানদের ঘায়েল করতে লাগল। নগরীর জন্য খোদ পাহাড়টা-ই একটা প্রাকৃতিক সুরক্ষা ছিল।

মুসলিম বাহিনী তাদের ঐতিহ্যগত বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার এমন বহিঃপ্রকাশ বেশ কয়েকবারই করল যে, তারা দৌড়ে ফটকের কাছে চলে গেল এবং ফটক ভাঙার চেষ্টা করল। কিন্তু সফল হতে পারেনি। কারণ, ফটক ছিল খুবই মজবুত আর উপর থেকে তিরবৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। কয়েকজন মুজাহিদ ফটকের সামনে শহীদ হয়ে গেল। বেশ কজন আহতও হলো। এই বাহিনীর কাছে অবরোধের পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ছিল না। মিনজানিক ছিল না। দড়ি ছিল না। দড়ির সিঁড়ি ছিল না। দুর্গজয়ে তো মুসলমানদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তারা পাঁচিলের উপর উঠে যেত এবং জীবনের বাজি লাগিয়ে সাফল্য ছিনিয়ে আনত। কিন্তু এই অভিযানে তাঁদের কাছে এমন কোনো সরঞ্জাম ছিল না।

মুকাওকিস আগেই তার প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোকে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের তাড়াবার ও হত্যা করার জন্য তোমরা এক-একটি বা দুই-দুটি ইউনিট বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আক্রমণ চালাবে এবং দুর্গে ফিরে আসবে।

এক-দুজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, অবরোধ এক মাস স্থায়ী ছিল। কেউ-কেউ দুমাসের কথাও লিখেছেন। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্যটা কেউই লিখেননি। তবে আলামতে মনে হচ্ছে, অবরোধ বেশি দীর্ঘ হয়নি। কারণ, দুর্গের সৈন্যরা বাইরে বেরিয়ে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল। মুসলমানদের জন্য সমস্যাটা ছিল, পাহাড়ের উপরে যুদ্ধ করার জন্য জায়গা এতখানি সংকীর্ণ ছিল যে, সালারের পক্ষে পজিশন বদল করা এবং কৌশল অবলম্বন করার মতো কোনো অবস্থা ছিল না। ভিতর থেকে যখন তাদের উপর আক্রমণ আসছিল, তখন তারা পিছনে সরে যাচ্ছিল। পাহাড়ের ঢালু তাদের পা জমাতে দিচ্ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে তারা পাহাড় থেকে নেমে আসত। রোমান সৈন্যরা নিচে নামছিল না। আক্রমণ চালিয়ে তারা উপর থেকেই দ্রুতবেগে দুর্গের ভিতরে চলে যেত এবং ফটক বন্ধ হয়ে যেত।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর এ ধরনের যুদ্ধ লড়ার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে তিনি একটা পরিকল্পনা তৈরি করে নিলেন। বাহিনীর একটা অংশকে এই পরিকল্পনায় যুক্ত করে নিলেন এবং ভিতর থেকে আক্রমণ এলে কী করতে হবে তাদের বুঝিয়ে দিলেন।

একদিন দুর্গের এক দিককার দুটি ফটক খুলে গেল। রোমান বাহিনী অপ্রতিরোধ্য স্রোতের মতো তীব্র গতিতে বাইরে বেরিয়ে এল এবং সেই দিক থেকেই মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমর ইবনে আস যে-সালারকে এই পরিকল্পনাটা দিয়েছিলেন, তিনি নগরীর এক পার্শ্বে ছিলেন। তিনি দ্রুতগতিতে নড়ে উঠলেন এবং নিজের বাহিনীটা নিয়ে প্রাচীরের কাছে চলে এলেন। লক্ষ তার ফটকগুলো কব্জা করা। কিন্তু রোমানদের বের হওয়ার গতি ছিল খুবই তীব্র। তারা দেখে ফেলল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু তারপরও মুসলমানরা তাদের আটকে দিল। এবার রোমানদের যে-বাহিনীটা আক্রমণের জন্য বের হলো, সংখ্যায় তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি ছিল।

মুসলমানদের এই বাহিনীটি জমে মোকাবেলা করল। তাদের সংখ্যা রোমানদের চেয়ে অনেক কম ছিল। কিন্তু তারপরও তারা অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করল। অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেল। রোমানরাও প্রাণ হারাল অসংখ্য। কিন্তু সংখ্যায় বেশি হওয়ায় তারা মুসলমানদের পরাস্ত করে দুর্গে ঢুকে গেল এবং ফটকগুলো বন্ধ করে দিল।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা আরও কমে গেল। নগরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এমনই সুদৃঢ় ছিল যে, নগরীর বাইরে যে-গাছগুলো ছিল, সেগুলো সব কেটে ফেলল, যাতে অবরোধকারীরা গাছে চড়ে প্রাচীরের উপর তির ছুড়তে না পারে। আমর ইবনে আস ও তাঁর সালারদের জন্য এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল, যে-অবস্থায় বড়-বড় সেনাপতিরাও নিরাশ হয়ে যান। কিন্তু সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর সালারদের বললেন, নিরাশার মতো পাপ যেন না করা হয়। ইনশাআল্লাহ জয় আমাদেরই হবে। তিনি আরও বললেন, এখানে যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে দরবারে খেলাফতে আমাদের কোনোই মূল্য থাকবে না। তিনি তাঁর সালারদের আরও একটা পরিকল্পনা দিয়ে বললেন, এই পরিকল্পনায় সম্ভাবনা আছে, আমাদের অর্ধেক সৈন্য এখানেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জয় সুনিশ্চিত।

ইতিহাস বিস্ময় প্রকাশ করেছে, এমন গুরুত্বপূর্ণ নগরীটার প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলোর কমান্ড করতে না মুকাওকিস এসেছিলেন, না আতরাবুন। ইতিহাসে সেই সেনাপতির নাম খুঁজে পাওয়া যায় না, যে এই যুদ্ধে রোমান বাহিনীর কমান্ডার ছিল। তা যে-ই ছিল, সে মুকাওকিসের নির্দেশনা অনুযায়ী কমান্ড করছিল। পুরো নির্দেশনা ও পরিকল্পনা তাকে অবরোধের আগেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই পরিকল্পনা অনুসারেই সে দুর্গ থেকে বাইরে বের হয়ে বেশি-বেশি আক্রমণ করেছিল। এবার পরিকল্পনার সর্বশেষ পর্বটি বাস্তবায়নের পালা। রোমান সেনাপতি তার অর্ধেকেরও বেশি সৈন্য আক্রমণের জন্য বিভিন্ন ফটকে বাইরে বের করিয়ে দিল। আগেকার সাফল্যগুলোতে এরা খুবই উৎফুল্ল ছিল। এবারও চোখে সুনিশ্চিত সফলতা-ই দেখছিল। সংখ্যাও এবার আগের তুলনায় বেশি। ফলে এবার তারা পূর্বাপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী হয়ে উঠল।

এই বিপুলসংখ্যক সৈন্য অবরোধের উপর আক্রমণ চালালে আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর সালারদের যে-পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, মুজাহিদরা সেই অনুপাতে লড়াই করার পরিবর্তে পাহাড়ের উপর থেকে এমনভাবে নামতে শুরু করল, যেন তারা ভয়ে পালাচ্ছে। রোমানরা আগেকার সাফল্যগুলোর নেশায় চুর হয়ে তাঁদের পিছনে এল। এই পরিকল্পনাটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর কয়েকটি ইউনিটকে রিজার্ভ রেখেছিলেন।

যেইমাত্র রোমান সৈনিকরা পাহাড়ের ঢালে নেমে এল, অমনি মুজাহিদদের রিজার্ভ ইউনিটগুলো তৎপর হয়ে উঠল এবং তাদের পিছনে; মানে প্রাচীর আর রোমান সৈন্যদের মধ্যখানে পৌঁছে গেল এবং রোমার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা ইউনিট; মানে অল্প কজন মুজাহিদ ফটক অতিক্রম করে দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। ওদিককার রোমান সৈনিকরা মুজাহিদদের ফাঁদে চলে এল। এবার পাহাড় থেকে নেমে আসা মুজাহিদরা পুনরায় পাহাড়ে উঠতে শুরু করল এবং তাঁরাও রোমান সৈনিকদের কচুকাটা করতে লাগল। তাঁদের আক্রমণে হতাহত হয়ে রোমান সৈনিকরা নিচে গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়তে লাগল।

এই চাল নগরীর শুধু একদিকেই চালা হয়নি; বরং অপর আরেক দিকেও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেলে মুজাহিদরা ওখানেও রোমান সৈনিকদের পিছনে চলে গিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কিছু মুজাহিদ দুর্গের ভিতরে ঢুকে গেল।

এমন পরিস্থিতির জন্য রোমানরা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তারা প্রথম দিককার সফলতাগুলোকে মাথায় রেখে এবারও নিশ্চিত সাফল্যের স্বপ্নে বিভোর ছিল। দুর্গের ভিতরে ঢুকে-পড়া-মুজাহিদদের লড়তে হলো বটে; কিন্তু তাঁরা অন্যান্য ফটকগুলোও খুলে দিল। ওদিকে রোমানদের বেশিরভাগ সৈনিক নগরীর বাইরে মুজাহিদদের তরবারির আঘাতে কর্তিত হচ্ছে।

দৈহিক ক্ষতি মুজাহিদদেরও হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিজন মুজাহিদ এই যুদ্ধকে নিজের ব্যক্তিগত লড়াই মনে করে লড়ছিল। নিহতদের বেশিরভাগ হলো বেদুইনদের। তার কারণ ছিল, তারা এমন যুদ্ধ লড়ায় অভ্যস্ত ছিল না। এমন লড়াই তারা কখনও লড়েনি। তারপরও তারা রোমানদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করল।

নগরীটা যখন বিজিত হলো, তখন তার ভিতরে ও বাইরে এত পরিমাণ রক্ত ছিল, যেন রক্তের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দুর্গ ও বুরুজ এত সংখ্যক ছিল যে, জায়গাটা গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সন্দেহ জাগল, রোমান বাহিনীর সেনাপতি ও তার অধীন অফিসারগণ হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে। অনুসন্ধানে সন্দেহটা সঠিকই প্রমাণিত হলো। রোমান সেনাপতিকে একটা বুরুজের এক কোণে গুঁটিশুঁটি মেরে বসা অবস্থায় পাওয়া গেল। তাকে গ্রেফতার করা হলো।

ফরমার বিজয় সম্পন্ন হয়ে গেল। মুজাহিদরা মালে গনিমত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত হলো। ঐতিহাসিক বাটলার এবং আরও দুজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, ইতিহাস সব সময় বিস্মিত থাকবে, এই স্পল্প কজন মুসলমান এমন মজবুত দুর্গটা শেষ পর্যন্ত কীভাবে জয় করেছিল!

পাঁচ

ফরমার বিজয়কে অমুসলিম ঐতিহাসিকরা বিস্ময়কর বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ঈমানদার লোকদের জন্য তাতে বিস্ময়ের কোনো ব্যাপারই ছিল না। ইসলামের ইতিহাস এমন বহু অলৌকিক বিজয়ের ঘটনায় ভরপুর। মুসলিম সেনাপতিদের অন্তরে এমন কোনো লোভ ছিল না যে, তারা রোমান সেনাপতিদের প্রাসাদগুলো থেকে হিরা-মাণিক্যের ভাণ্ডার ও অন্যান্য গনিমতের সম্পদ লাভ করে বিত্তশালী হয়ে যাবেন এবং বিলাসিতার জীবন যাপন করবেন। সাধারণ মুজাহিদদের অন্তরেও এমন কোনো বাসনা ছিল না। তাঁরা এসব অভিযানকে 'আল্লাহর পথে জিহাদ' জ্ঞান করেই জীবনের বাজি লাগিয়েছিলেন। প্রত্যয় তাঁদের ব্যক্তিগত নয়– দীনি ও জাতীয় ছিল।

এর চেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা আর কী হতে পারে যে, মুসলমানরা ইরান ও রোমের মতো বৃহৎ সামরিক শক্তিগুলোকে– ইতিহাস যাদের অজেয় বলে আখ্যায়িত করেছিল– দুমড়ে-মুচড়ে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলেছিল এবং সেই অঞ্চলগুলোতে আজও ইসলামের পতাকা অতিশয় গর্ব ও মর্যাদার সাথে পতপত করে উড়ছে।

ফরমার বিজয় অমুসলিম ঐতিহাসিকদের জন্য বিস্ময়কর ছিল। ফলে তারা এর কতগুলো হেতু খুঁজে বের করেছেন এবং সেগুলোকে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই দিয়েছেন। যেমন– তারা লিখেছেন, এমন স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের পক্ষে এত বিশাল ও শক্তিধর বাহিনী থেকে ফরমার দুর্গবদ্ধ নগরীটা নিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তারপরও তারা এজন্য নিতে পারল যে, রোমান বাহিনীতে যে-কিবতি খ্রিস্টানরা ছিল, বিনয়ামিনের আদেশে তারা যুদ্ধই করেনি। তাদের কিছু সৈন্য আপন বাহিনীর শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং লুটপাট করেছিল। তারা আরেকটা কারণ দেখিয়েছেন যে, হেরাকল-এর সরকারি খ্রিস্টবাদের বিশপ কায়রাস তলে-তলে হেরাকল-এর বিরোধী হয়ে গিয়েছিল এবং তিনিও মুসলিম সেনাপতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নিয়েছিলেন। সর্বোপরি সমস্ত মিশরি বেদুইন মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিল।

কিন্তু তাদেরই লিখিত ইতিহাস তাদের এই মনগড়া মূল্যায়নকে অসত্য, অবাস্তব ও কাল্পনিক বলে প্রমাণিত করে। এটুকু সত্য যে, বিনয়ামিন কিবতি খ্রিস্টানদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তারা যেন গা লাগিয়ে যুদ্ধ না করে। ইতিহাসে পরিসংখ্যানও পাওয়া যায় যে, রোমান বাহিনীতে কিবতি খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। তারা যদি বিদ্রোহী হয়েও যেত, তবু তাতে সামরিক দিক থেকে রোমানদের তেমন কোনো ক্ষতি হতো না।

বাকি থাকল হেরাকল-এর প্রধান বিশপ কায়রাসের ব্যাপারটা। এ ক্ষেত্রে সত্য ও সঠিক তথ্য হলো, সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগই হয়নি। না আমর ইবনে আস-এর আশা ছিল, কায়রাসকেও তিনি তাঁর সমর্থন ও সহযোগী বানিয়ে নিবেন। কায়রাস ও হেরাকল-এর মাঝে অন্য কোনো ব্যাপারে বিরোধ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু মিশরের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তারা একমত ছিলেন।

একথাটা সঠিক যে, বেদুইনরা মুসলমানদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল এবং সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.) তাদের অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজে লাগিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধটা তারা ঠিকভাবে লড়তে পারেনি। তারা যুদ্ধবাজ ছিল বটে; কিন্তু সুসংগঠিত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে লড়াই করার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। একারণেই ফরমার লড়াইয়ে তাদের ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছিল।

* * *

একথাটাও সত্য যে, ফরমার লড়াইয়ে রোমান বাহিনীতে বেশিরভাগ সৈন্য তারা ছিল, যারা শাম থেকে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছিল। তাদের অনেকে আহতও হয়েছিল। তাদের উপর মুসলমানদের যে-আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল, তা তখনও পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। মুকাওকিস নতুন বাহিনী গঠন করে নিয়েছিলেন বটে; কিন্তু পুরাতন সৈন্যরা নতুন সৈন্যদের মাথায় বুঝ ঢেলে দিয়েছিল, মুসলমান জীবনের মায়া ত্যাগ করে বীরের মতো লড়াই করে এবং নিজেদের জীবনগুলো কুরবান করে দেয়। কোনো পরিস্থিতিতেই তারা পিছনে হটে না। পুরাতন সৈন্যরা নতুন সৈন্যদের মাথায় একথাও ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে, মুসলিম বাহিনীর প্রতিজন সদস্য যুদ্ধকে যার-যার নিজের কাজ মনে করে লড়াই করে।

এই আতঙ্ক ছাড়াও রোমান বাহিনী মুসলমানদের সদাচার ও সচ্চরিত্র দ্বারাও প্রভাবিত ছিল। বিশেষ করে বেসামরিক খ্রিস্টানরা মুসলমানদের চরিত্র ও সদাচার দ্বারা খুবই প্রভাবিত ছিল। তারা বলত, মুসলমানরা লড়াই করে জালেমের মতো। কিন্তু বিজয়ের পর পদানত মানুষগুলোর জন্য তারা রহমতের ফেরেশতা হয়ে যায়। তাদের এই মন্তব্য অমুসলিম ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাসেও পাওয়া যায় যে,

মুসলমানরা শুধু দেহকেই কুপোকাত করে না- হৃদয়কেও জয় করে নেয় এবং বিজিত লোকগুলোকে নিজেদের অনুরক্ত বানিয়ে নেয়। তারা নিরস্ত্র, নারী ও দুর্বলদের উপর হাত তোলে না, নাগিরকের সম্পদ লুট করে না, নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করে না।

একথাটা সঠিক নয় যে, রোমানদের মাঝে জাতীয় চেতনা ও মর্যাদাবোধ ছিল না। সবই ছিল। তাদের খুন করেছে তো রাজত্বের নেশা খুন করেছে। এখানে এক রোমান মেয়ের একটা ঘটনা উঠে আসছে, যার দ্বারা অনুমিত হয় রোমান বাহিনীতে জাতীয় চেতনা ও মর্যাদাবোধ কতখনি বিদ্যমান ছিল। মেয়েটার নাম নুশিয়া। এক সেনাপতির কন্যা ছিল, যে কিনা ফরমার রোমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন কমান্ডার ছিল। ইতিহাসে এই সেনাপতির নাম পাওয়া যায় না।

এই সেনাপতি সম্রাট হেরাকল-এর রাজপরিবারের সদস্য ছিল। নুশিয়ার বয়স তখন বাইশ কি তেইশ বছর। এখনও বিয়ে হয়নি। সেনাবাহিনীরই এক রোমান কর্মকর্তার সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হয়েছিল। এই কর্মকর্তাও রাজপরিবারের সন্তান। এরা সবাই নুশিয়াকে সংক্ষেপে নুশি বলে ডাকত।

এই উপাখ্যানটি আমরা পিছনে সেই সময়টায় নিয়ে যাচ্ছি, যখন মুসলমানরা ফমরাম দুর্গে প্রবেশ করছিল এবং দুর্গের ভিতরে-বাইরে সমানভাবে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছিল। এটি ফরমার চূড়ান্ত লড়াই ছিল। নুশির সেনাপতি পিতা তখন পাঁচিলের উপরে দাঁড়িয়ে ঘোরতর এই যুদ্ধটা অবলোকন করছিল। তার নিশ্চিত অনুমিত হয়ে থাকবে, মুসলমানরা ফরমা জয় করে ফেলেছে এবং তার বাহিনী পরাজয়ের যুদ্ধ লড়ছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি এরূপ ছিল যে, রোমান বাহিনী এখন দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্য নয়- নিজেদের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত লড়াই করছে। তারা শোচনীয়রূপে কাটা পড়ছিল।

সেনাপতি পাঁচিলের উপর থেকে প্রথমে বাইরের দিকে তাকাল। তারপর ভিতরের দিকে তাকাতে লাগল। তার এক অধীন এসে তার পাশে দাঁড়াল এবং বলল, ভালো হতো যদি মুসলমানদের ভিতরে আসতে দেওয়া হতো আর আমাদের বাহিনী বাইরে থাকত। তারা বাইরে থেকে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে তাদের নিঃশেষ করে দিত। লোকটি বলল, মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। ফলে তাদের কুপোকাত করা এমন কঠিন কিছু নয়, যাকে আমরা অসম্ভব বলতে পারি।

'আমি শাম থেকে এসেছি' – রোমান সেনাপতি পরাজিত কণ্ঠে মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে বলল- 'আমি মুসলমানদের লড়তে দেখেছি। নিজেও তাদের সঙ্গে লড়েছি। তুমি এদের গুটিকতক বলছ। সংখ্যার এই স্বল্পতা-ই তাদের আসল শক্তি। এই পরিস্থিতিতে কি তুমি তোমার বাহিনীকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে? তুমি কি

দেখছ না, আমাদের বাহিনী জীবন বাঁচাতে লড়াই করছে? তারা যুদ্ধও করছে আবার পালাবার পথও খুঁজছে। বেদুইনরা গাদ্দারি করে ফেলেছে।'

'তাহলে আমাদের জন্য আদেশ কী?' অধীন অফিসার জানতে চাইল।

'আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য অনুমতি আছে'– সেনাপতি বলল– 'লড়তে চাইলে লড়ো; ভাগতে চাইলে ভাগো।'

'আমাকে এমন কাপুরুষ মনে করবেন না সেনাপতি!'– অফিসার বলল– 'আপনি পালাতে বললেই আমি পালিয়ে যাব নাকি! শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।'

অফিসার ভিতরের পরিস্থিতিটা দেখল এবং ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কাছের সৈনিকদের হুঙ্কার দিয়ে আদেশ দিল, মুসলমানরা ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তোমরা এখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে ভিতরের দিকে ফিরে যাও এবং মুসলমানদের তিরের নিশানা বানাও। রোমান বাহিনীর যে-সৈনিকেরই কানে আওয়াজটা পৌঁছল, সে-ই মোড় ঘুরিয়ে নগরীর ভিতরে মুসলমানদের উপর তির ছুড়তে শুরু করল।

নগরীতে হুলুস্থুল পড়ে গেছে। মানুষ যার-যার ঘর থেকে বের হয়ে পালাতে শুরু করেছে। সৈনিকরা অনেকে লড়ছে। অনেকে আবার বেসামরিক লোকদের মাঝে ঢুকে গিয়ে পালাবার পথ খুঁজছে। মুসলমানরা ঘোষণা করছে, কোনো নাগরিক আপন বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে পালাবে না। তোমরা আপন-আপন ঘরে থাকো। কোনো মুসলমান কোনো নাগরিকের ঘরে ঢুকবে না। কোনো লুটপাট হবে না। কোনো নারীর গায়ে হাত তোলা হবে না।

'এই হতভাগা মুসলমানরা আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে'– অফিসার সেনাপতিকে উদ্দেশ করে বলল– এরা জানে, পলায়নকারী জনতা সোনা-চাঁদি ও অর্থ-কড়ি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি তাদের এসবের উপর।'

'না; ধোঁকা দিচ্ছে না'– সেনাপতি বলল– 'এটিই এই মুসলমানদের গুণ। বিজিত অঞ্চলে তারা কারও ঘরে ঢোকে না। তারা কোনো নারীর গায়ে হাত তোলে না। এই গুণটি যদি আমাদের সৈন্যদের মাঝে থাকত, তাহলে আমরা না শাম থেকে বিতাড়িত হতাম, না আজ এমন দুর্গবদ্ধ শক্ত নগরীটা তাদের হাতে তুলে দিতে হতো। আমাদের সৈনিকরা তো নিজেদেরই লোকদের ঘরে ঢুকে লুটপাট শুরু করে, আপন বোন-কন্যাদেরই সম্ভ্রম বিনষ্ট করে।'

ইতিমধ্যে মুজাহিদরা পাঁচিলের উপরে উঠে এল এবং সেই তিরন্দাজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, যারা নিচে নগরীর ভিতরকার মুজাহিদদের উপর তির ছুড়ছিল। সেনাপতি একদিকে কেটে পড়ল। তার পোশাকই পরিষ্কার বলে দিচ্ছিল, এই লোকটা সেনাপতি। তার আশা ছিল না, সে জীবন নিয়ে পাঁচিলের উপর থেকে

নেমে যেতে পারবে। পারেও যদি নামবে মুসলমানদের বন্দি হিসেবে। কিন্তু পাঁচিলের উপর তার বাহিনীর মাঝে যে-বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হলো, তাকে কাজে লাগিয়ে সে নুয়ে-নুয়ে পাঁচিল থেকে নেমে যেতে সক্ষম হলো।

নিচেও সেই একই রক্তক্ষয় ও ছুটোছুটির অবস্থা বিরাজ করছিল। সেনাপতি চোখে সরষে ফুল দেখতে শুরু করল। নিজেকে বাঁচানো অসম্ভব বলে মনে হলো। কিন্তু ভাগ্যটা তার ভালো ছিল যে, কাছেই একটা গলি ছিল। সে গলিটায় ঢুকে পড়ল এবং শুরুতেই যে-ঘরটা পেল, তার দরজায় হাত রাখল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। সে সজোরে করাঘাত করল। কিন্তু দরজা খুলল না। ঘরের অধিবাসীরা বোধহয় ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমান এসে পড়েছে। এখন ঘরে ঢুকে তারা আমাদের সঙ্গে সেই আচরণ করবে, যেমনটা কোনো বিজয়ী বাহিনী বিজিত অঞ্চলের নাগরিকদের সঙ্গে করে থাকে। সেনাপতি নিজের নাম উল্লেখ করে বলল, তাড়াতাড়ি দরজা খোলো।

দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে গেল, যার মধ্য দিয়ে সেনাপতি একটা চোখ দেখতে পেল। সেনাপতি দরজাটা সজোরে ধাক্কা দিয়ে পুরোপুরি খুলে ফেলল এবং ভিতরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। দরজার একটা পাল্লা খুলে যে-লোকটা উঁকি মেরেছিল, সে ছিল একজন পুরুষ লোক। সেনাপতিকে সে চিনে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, যুদ্ধের পরিস্থিতি কী সেনাপতি?

সেনাপতি যুদ্ধের পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে কাঁপা গলায় বলল, এক্ষুনি আমাকে একটা কাপড় দাও। লোকটা সেনাপতির অবস্থা দেখেই বুঝে ফেলল যুদ্ধের পরিস্থিতি কেমন। ভালো হলে তো বাহিনীর সেনাপতি এমন ভীত, এমন সন্ত্রস্ত হয়ে একজন সাধারণ নাগরিকের ঘরে এসে ঢুকতেন না। কিন্তু তারপরও লোকটা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল।

'শোননি আমার কথা?'– সেনাপতি আদেশের সুরে ও প্রভাবদীপ্ত কণ্ঠে বলল– 'তোমার চোগাটা আমাকে দাও। আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমাদের সেনাপতি। জলদি করো।'

'আমি আপনাকে চিনি'– লোকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল– 'কিন্তু একজন গরিব মানুষের পোশাক পরলে আপনাকে কে চিনবে?'

পরিস্থিতি যেমনই হোক লোকটা সেনাপতি বটে। আবার রাজপরিবারের সদস্যও। সর্বোপরি তাড়া আছে প্রচণ্ড। তাই এই লোকটার তাচ্ছিল্যমাখা কথার উত্তর কথা দ্বারা না দিয়ে এক টানে তরবারিটা বের করে ফেলল এবং আদেশটা পুনর্ব্যক্ত করল। ভিতর থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এল। সম্ভবত লোকটার স্ত্রী। বলল, ইনি যা চাচ্ছেন তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। তুমিও যেমন মানুষ।

সেনাপতি গৃহকর্তার প্রদত্ত কাপড়গুলো নিজের পরিহিত পোশাকের উপরই চড়িয়ে নিল। একটা গরিবানা চোগাও পরে নিল, যেটা তার কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ছিল। অতি সাধারণ একটা ময়লা চাদরও ছিল, যার কিয়দংশ মাথায় পেঁচিয়ে নিল, কিয়দংশ ঝুলিয়ে নিল। লোকটা এখনর সেনাপতি নয়– একজন হতদরিদ্র মানুষ। বারান্দা অতিক্রম করে বাইরে বেরুবার সময় টেরা-বাঁকা একটা লাঠির উপর তার চোখ পড়ল। সে লাঠিটা তুলে নিল এবং খানিক বাঁকা হয়ে লাঠিটায় ভর করে হাঁটতে শুরু করল। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং মোড় ঘুরিয়ে তাকাল।

'এত ভয় করো না'– সেনাপতি গৃহকর্তা ও তার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বলল– 'দরজা খোলা থাকলেও কোনো ভয় নেই। মুসলমান বিজিত অঞ্চলের নাগরিকদের ঘরে ঢোকে না এবং কোনো লুটপাট করে না।'

'তুমি যাও'– গৃহকর্তা বলল– 'আমাদের ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। আমি তোমার সেনাপতিত্বে নয়– তোমার তরবারিতে ভয় পেয়েছিলাম। আমাদের কন্যাদের ভাবনা না হয় না-ই ভাবতে; আপন কন্যার চিন্তায় হলেও তোমার উচিত ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া। প্রয়োজনে লড়তে-লড়তে জীবন বিলিয়ে দেওয়া। যাও; এবার কেউ তোমাকে চিনবে না।'

যদি পালাবার তাড়া না থাকত, তাহলে সেনাপতি একজন অতি সাধারণ মানুষের এই গোস্তাখি ক্ষমা করত না। মাথাটা তার দেহ থেকে আলাদা করে ফেলত। কিন্তু রোষকষায়িত লোচনে একবার তাকিয়ে দেখল শুধু আর বেরিয়ে গেল। তরবারির একটা কোপ মারার সময়টুকুও ব্যয় করা সমীচীন মনে করল না এই রোমান সেনাপাতি।

* * *

রোমান বাহিনীর এই সেনাপতি লঠিতে ভর করে খানিক ঝুঁকে ধীরে-ধীরে চলে যাচ্ছিল। দেখল, নগরীর অলি-গলি হয়ে তার বাহিনীর সৈনিকরা প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছে। কয়েকজন মুসলমানও তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল এবং সে তাদের রক্তমাখা তরবারিগুলো দেখল। চার-পাঁচবার এমনও হয়েছে যে, গলির মোড় নিতে বিভিন্ন ঘর থেকে পলায়মান কতক লোক তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে পালিয়ে গেছে।

দু-তিনজন মুসলমান তার চোখে পড়ল, যারা অত্যন্ত উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করে ফিরছিল, নগরীর অধিবাসীরা! তোমরা আপন ঘর-দোর ছেড়ে পলায়ন করো না। লুটমারের জন্য তোমাদের ঘরে কেউ প্রবেশ করবে না। এক মুসলমান বলছিল, কেউ ঘর থেকে বের হয়ো না; খুবই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। অন্যথায় ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারাবে। কিন্তু তারপরও নাগরিকদের মাঝে ছুটোছুটি-হুড়োহুড়ি

চলছিল। কিছু লোক ঘরের দরজাগুলো ভিতর থেকে বন্ধ করে চুপচাপ ঘরে বসে রইল।

সেনাপতি প্রচণ্ড তাড়ার মধ্যে ছিল। কিন্তু দ্রুত হাঁটছিল না পাছে কেউ তাকে চিনে ফেলে। ধীরপায়ে এমনভাবে হাঁটছিল, যেন মানুষ তাকে বৃদ্ধ, দুর্বল ও রুগ্ন মনে করে এড়িয়ে যায়। তার বাড়িটা নগরী থেকে খানিক দূরে আলাদা। ওটা ঘর নয়– একটা রাজপ্রাসাদ। ও পর্যন্ত পৌঁছতে তার অনেক সময় ব্যয় হয়ে গেল। মনে আশঙ্কা ছিল, তার পরিবারের লোকজন যদি যথাসময়ে বেরিয়ে না যায়, তাহলে ধরা পড়ে যাবে। বেশি ভাবনা তার অবিবাহিতা যুবতী ও রূপসী মেয়েটার জন্য।

বাড়ির কাছাকাছি চলে এলে সেনাপতি এমন কিছু লক্ষণ দেখতে পেল, যেন তার পরিবারের লোকেরা পালিয়ে গেছে। কয়েকজন মুসলমান প্রাসাদের এরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করছে। কয়েকজন প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে গেছে। সেনাপতি প্রাসাদের বহিঃফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং অনুতাপদগ্ধ চোখে প্রাসাদটা দেখতে লাগল, যেখানে সে রাজপরিবারের একজন সেনাপতি হিসেবে বাস করত। কিন্তু সেই প্রাসাদের দরজা-জানালাগুলোও তার শত্রু হয়ে গেছে। একজন মুসলমান প্রাসাদের ভিতর থেকে বের হলো এবং উচ্চ আওয়াজে বলল, সবাই পালিয়েছে। প্রাসাদ একদম শূন্য। সেনাপতি ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সে নিশ্চিন্ত হলো, তার পরিবারের লোকজন সবাই বেরিয়ে গেছে।

ওখানেই দাঁড়িয়ে-দঁড়িয়ে সেনাপতি প্রাসাদটা দেখতে থাকল। কল্পনা করা যেতে পারে, তখন কেমন বিষাক্ত সাপ, কেমন বিষাক্ত নাগ তার বুকটার উপর দংশন করছিল। এই নগরীর সে শাসক ও সেনাপতিই ছিল না শুধু– রাজা ছিল। এখানকার মানুষের ভাগ্য একা তার হাতে ছিল। এই প্রাসাদে সে যে-বিলাসবহুল জীবন যাপন করেছিলাম, তার স্মৃতিও তার মনে পড়ে গেল। প্রাসাদের সম্মুখে অতি মনোরম ও সুদর্শন একটা বাগান ছিল। সেই বাগানে আর এই প্রাসাদে সে নিষ্কলুষ তরুণী-যুবতীদের সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত করেছিল। আজ আপন অবিবাহিতা যুবতী কন্যার ভাবনা তাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে, মেয়েটা পরিবারের লোকদের সঙ্গে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, নাকি কোনো বিজেতার হাতে পড়ে গেছে!

'সিপাহসালার আসছেন।' সেনাপতি পিছন দিক থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল।

সেনাপতি পিছনের দিকে মোড় ঘুরিয়ে তাকাল। মুসলিম বাহিনীর বিজয়ী সিপাহসালার আমর ইবনে আস আসছেন। তাঁর পিছনে কয়েকজন অশ্বারোহী রক্ষীসেনা। রোমান সেনাপতি আরেকবার প্রাসাদটার পানে তাকাল। এখানে তো তার রক্ষীবাহিনীর একটা ইউনিট চৌকস নয়নে সারাক্ষণ বিদ্যমান থাকত। কিন্তু এখন তাদের চিহ্নও নেই।

সেনাপতি ওখান থেকে সরে দাঁড়ানোর বা পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা-ই করল না। আমর ইবনে আস তার নিকটে পৌছে গেছেন সেনাপতি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে কৌশল অবলম্বন করল। আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর ঘোড়া যখন তার কাছে চলে এল, তখন সে অবনত হয়ে নিজের মাথায় হাত রাখল। সিপাহসালার ও তাঁর রক্ষীরা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেলেন এবং প্রাসাদে গিয়ে ঢুকলেন।

'এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কী চিন্তা করছ?' রোমান সেনাপতির কানে মৃদু একটা আওয়াজ ঢুকল।

হঠাৎ চকিত হয়ে সেনাপতি মোড় ঘুরিয়ে ওদিকে তাকাল। এক বৃদ্ধা তার পাশে দাঁড়িয়ে। মহিলাকে চিনে না সেনাপতি। তার কোনো এক চাকরের মা, যে কিনা তাকে এই গরিবানা ছদ্মবেশেও চিনে ফেলেছে। মহিলা সেনাপতিকে জানাল, তোমার প্রাসাদের সব কজন সদস্য সে-সময়ই বেরিয়ে গেছে, যখন তারা সংবাদ পেয়েছিল, মুসলমানরা খোলা ফটক দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করছে। নগরীর দুটা ফটক বিশেষভাবে ক্ষুদ্র বানানো হয়েছিল এবং খুবই মজবুত ছিল। এই দুটি ফটকের চাবি শাহী রক্ষী বাহিনীর কমান্ডারের কাছে থাকত। বাহিনীর প্রবেশ বা বের হওয়ার কাজে এই ফটকদুটো ব্যবহার হতো না। এই দুটো ফটক কখনও খোলা হয়নি। এগুলো রাজপরিবারের জন্য বরাদ্দ ছিল, যে প্রয়োজনের সময় শুধু তারা-ই এগুলো ব্যবহার করবে। কিন্তু সেই যে তৈরির পর তালা ঝুলানো হলো, আর কখনও খোলা হয়নি– খোলার প্রয়োজন হয়নি। প্রথমবারের মতো প্রয়োজনটা এই এখন দেখা দিল। বৃদ্ধা সেনাপতিকে জানাল, মুসলমানরা যখন নগরীতে প্রবেশ করছিল, তখন এই দুটো ফটকের একটা খুলে দেওয়া হলো আর তোমার পরিবারের সকল সদস্য এপথে বেরিয়ে গেল। এদিকটায় কোনো লড়াই ছিল না।

'আর আমার মেয়ে?'

'সেও সঙ্গেই গেছে'– বৃদ্ধা উত্তর দিল– 'তোমার মেয়ের হবু স্বামী এসেছিল। সে-ই সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। তুমিও চলে যাও। পাছে এমন না হয় যে, কেউ আপনাকে চিনে ফেলল। তারপর মুসলমানরা আপনাকে গ্রেফতার করে ফেলল।'

'সঙ্গে করে কিছু মালামালও তারা নিয়েছে কি?'

'কিছুই নয়'– বৃদ্ধা উত্তর দিল– 'এতটুকু সুযোগও ছিল না যে, শুধু মূল্যবান জিনিসগুলো জড়ো করে নিতে পারে।'

সেনাপতি আবারও প্রাসাদের দিকে তাকাল। এবার মনে হলো, একটা তির এসে তার বুকটায় গেঁথে গেছে। এই প্রাসাদে কী পরিমাণ হিরা-মাণিক্যের ভাণ্ডার ছিল তা তো সেনাপতির জানা।

'আপনাকে বড় বেশি বিচলিত দেখাচ্ছে'– বৃদ্ধা বলল– 'আপনার জীবন নিরাপদ হোক। পরিবারের সব কজন সদস্য বেরিয়ে গেছে। আপনিও চলে যান এবং প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে আসুন। এই নগরীর উপর আক্রমণ করুন। এটি আপনারই থাকবে।'

সেনাপতির ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বৃদ্ধার এই কথাটা তার খুব ভালো লাগল। কারণ, সে জানত, মুসলমানরা যে-নগরী জয় করে, তাকে পুনর্দখল করা প্রায় অসম্ভব। সে ওখান থেকে সরে গেল এবং প্রাসাদের উপর শেষবারের মতো দৃষ্টি ফেলে চলে গেল।

সেনাপতির জানা ছিল তার পরিবার কোথায় গেছে। প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে আরও একটা নগরী ছিল, সেযুগে তার নাম ছিল বিলবিস। তারা কোন পথে গিয়ে থাকবে, তাও তার জানা ছিল। তারা যে-ফটকে বেরিয়েছে, ওদিক থেকে আক্রমণের কোনো আশঙ্কা ছিল না। কারণ, প্রচীরের সাথেই পাহাড়ের ঢালু ছিল লাগোয়া, যার উপর যে-রাস্তাটা ছিল, সেটা খুবই সরু; এত চিকন যে, একজন মানুষ কিংবা একটা ঘোড়া এপথে চড়তে বা নামতে পারে। ওদিকে কোনো লড়াই ছিল না। একদম নীরবতা বিরাজ করছিল। সেনাপতি নিচে নেমে গেল। আহত হয়ে পড়ে-যাওয়া রোমান অশ্বারোহীদের ঘোড়াগুলো ছুটতে-ছুটতে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। সেনাপতি দেখল, তিন-চারটা ঘোড়া ওই পাহাড়টার নিচে চলে গেছে, যার উপর ফরমা নগরীর অবস্থান। সে একটা ঘোড়া ধরে নিল এবং তার পিঠে চড়ে চাবুক কষল।

এই পুরোটা অঞ্চল ছিল সবুজ-শ্যামল। কোথাও-কোথাও ঘন বনও ছিল এবং ছোট-বড় পাহাড়ও ছিল। ওখানে গিয়ে মানুষ-ঘোড়া সবাই হারিয়ে যেত।

* * *

রোমান সেনাপতি অনেকখানি পথ অতিক্রম করে ঘোড়া থামিয়ে দিল। গায়ে গরিবানা যে-কাপড়গুলো সামরিক উর্দির উপর জড়িয়ে রেখেছিল, সেগুলো খুলে ফেলে দিল এবং সামনের এগিয়ে গেল। এখন আর তার ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই। অঞ্চলটা যদি সমতল হতো, তাহলে এতক্ষণে আরও অনেক দূর চলে যেত। কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে তাকে একটু পরপরই ডানে-বাঁয়ে মোড় নিতে হচ্ছিল। ফলে সময় লাগছিল বেশি আর পথ কাটছিল কম। ইতিমধ্যে সূর্যও ডুবে গেছে।

পিছনে ফরমায় তার প্রাসাদ থেকে গনিমতের সমস্ত সম্পদ খুঁজে বের করে জড়ো করা হলো। হিরা-মাণিক্যের বিশাল এক ভাণ্ডার। অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম, কাপড়-চোপড় ইত্যাদিও মহামূল্যবান। মুজাহিদরা পলায়নপর নাগরিদের মাঝে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। বেদুইনদের উপর বিশেষভাবে নজর রাখা হলো, তারা যেন কোনো নাগরিকের ঘরে প্রবেশ না করে। কোন-কোন

জিনিস গনিমতের সম্পদ বলে গণ্য করা হয় এবং সেগুলো কোথায়-কোথায় থাকে তাদের বলে দেওয়া হয়েছে।

রোমান সেনাপতি সূর্যাস্তের পরও থামল না। ঘোড়া তার বেশ তীব্র গতিতেই এগিয়ে চলছে। তার আশা ছিল, পরিবারের লোকদের সে পথেই পেয়ে যাবে। এই আশা তার পূর্ণ হয়েছে। একটা জায়গায় গিয়ে তাদের পেয়েই গেল। জায়গাটা বেশ সুন্দর ও আরামদায়ক। তার পরিবারের লোকেরা সেখানে কিছু সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি দিয়েছিল। সবাই তারা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল। জায়গাটা ফরমা থেকে দশ-এগারো মাইল দূরে।

রোমান সেনাপতি তার পরিবারের লোকদের সঙ্গে মিলিত হলো। সবার আগে সে কন্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, নুশি কোথায়? কাফেলায় সে নুশিকে দেখতে পাচ্ছিল না।

'পাগল হয়ে গেছে'– সেনাপতির স্ত্রী উত্তর দিল– 'পাগল-পাগল অবস্থায় কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

শুনে প্রথমটায় সেনাপতি বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। পরিবারের সকল সদস্যের উপরও নীরবতা ছেয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সেনাপতি গর্জে উঠে বলল, আমাকে সঠিক কথাটা বলো; কিছুই লুকোনোর চেষ্টা করো না। তারপর সে মেয়ের হবু স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করল, ও কোথায়? বৃদ্ধা সেনাপতিকে বলেছিল, নুশির হবু স্বামী এসেছিল এবং সে-ই সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

নুশির ব্যাপারে বলা আবশ্যক, মেয়েটা শাহি মর্যাদাবোধ সম্পর্কে অনেক আবেগময়ী ও অনুভূতিপ্রবণ ছিল। সেনাপতির এই একটা মেয়েই যৌবনে পদার্পণ করেছিল। দুটা ছেলে ছিল তখনও ছোট। কন্যা নুশিকে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য সেনাপতি একজন ওস্তাদ ঠিক করে দিয়েছিল, যে তাকে শাহসওয়ার বানিয়ে দিয়েছিল। তারপর তরবারিচালনা, বর্শাবাজি ও তিরন্দাজির এমন প্রশিক্ষণ দিল যে, মেয়েটা একজন অভিজ্ঞ সৈনিকের মতো শত্রুর মোকাবেলায় মাঠে নামার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছিল। নুশি টগবগে যুবতী ও অতিশয় রূপসী মেয়ে। কিন্তু নিজের মধ্যে সে পুরুষালি নানা গুণ সৃষ্টি করে নিয়েছিল। তার প্রকৃতি যুদ্ধবাজ পুরুষদের মতো হয়ে গিয়েছিল। নুশি পিতাকে প্রায়ই বলত, আমি শামকে রোমান সাম্রাজ্যে যুক্ত না করে মরব না।

নুশির ওস্তাদ তার হৃদয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন ঘৃণা ভরে দিয়েছিল যে, মুসলমান নামটা শোনামাত্রই সে এই ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে শুরু করত। তার সেনাপতি পিতার দোমুখো নীতির অবস্থাটা ছিল, একদিকে সে মুসলমানদের সচ্চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করত অপরদিকে নিজের সন্তানদের হৃদয়ে মুসলমানদের ব্যাপারে এমন ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যেন এর চেয়ে হীন ও ঘৃণ্য জাতি

আরেকটা হতে পারে না। মুসলমানরা যখন রোমানদের থেকে শাম ছিনিয়ে নিয়ে তাদের মিশর তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন নুশির আবেগের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল, যেন এখন মুসলমান যাকেই সামনে পাবে, তাকেই হত্যা করে ফেলবে। এবার সেই মুসলমানরা তাকে তার গোটা পরিবারসহ ফরমা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করল। তারা তাদের প্রাসাদ ও মহামূল্যবান হিরা-মাণিক্যের বিশাল একটা স্তূপ ওখানে রেখে পালিয়ে এল।

সেনাপতিকে জানানো হলো, ফরমা থেকে বের হওয়ার পরই নুশি বিগড়ে গিয়েছিল। বলছিল, এই অল্প কজন মুসলমান কোনো দিনও ফরমা জয় করতে পারত না। এই সাফল্য তাদের স্রেফ এজন অর্জিত হয়েছে যে, বেদুইনরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই তথ্যটা সে মুসলমানদের ফরমা আক্রমণের আগেই জেনেছিল। কিন্তু ব্যাপারটাকে সে গুরুত্ব দেয়নি। এখন তার হবু স্বামী তাকে বলল, বেদুইনরা যদি মুসলমানদের সাথে না থাকত, একজন মুসলমানও জীবন নিয়ে পালাতে পারত না।

নুশির মা সেনাপতিকে যা শোনাল, তার সারমর্ম হলো, প্রাসাদের মধ্যবয়সী এক চাকর ছিল মিশরি বেদুইন ও খ্রিস্টান। নুশির এই বেদুইনটাকে এত ভালো লাগত যে, লোকটাকে সে তার বিশেষ ব্যক্তিগত বিশ্বস্ত চাকর বানিয়ে নিয়েছিল। এই বেদুইন চাকরের এক যুবক ছেলে বেদুইনদের সেই বাহিনীতে চলে গিয়েছিল, যারা মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছিল। বেদুইনরা কীভাবে মসুলমানদের সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়েছিল, এই ছেলেটা তার পিতাকে তার বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়েছে। সে বলেছে, আসমান থেকে ফেরেশতা নেমে এসেছিল এবং তারা বেদুইনদের খোদার বার্তা পৌঁছিয়েছিল।

পুত্র যোগ দিল গিয়ে মুসলমানদের সাথে। কিন্তু পিতা ছিল কট্টর খ্রিস্টান আর মুসলমানদের তেমন শত্রু, যেমন শত্রু মুসলমানরা নুশির। দুজন সমচিন্তার মানুষ ছিল। ফলে এই চাকরটা নুশির খুবই ভালো লাগত।

এবার মুসলমানরা যখন ফরমাও জয় করে নিল, তখন সেই পৌঢ় চাকর নুশিকে জানাল, বেদুইনরা যদি আপন জাতি ও ধর্মের সঙ্গে গাদ্দারি না করত, তাহলে মুসলমানরা আমাদের এমন মজবুত দুর্গবদ্ধ নগরীটা জয় করতে পারত না। নুশি আগুনের মতো জ্বলে উঠল আর চাকর তার জ্বলন্ত আগুনে তেল ছিটিয়ে দিল।

এই পরিবারটা যখন ফরমা থেকে বের হলো, তখন নুশি বেদুইন চাকরকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে চলো। চাকরও নুশিকে খুব স্নেহ করত। ফলে নুশির আব্দার সে রক্ষা না করে পারল না। সে নুশির সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। তারপর নুশির সঙ্গে সেও নিখোঁজ হয়ে গেছে।

স্ত্রীর মুখে এসব কথা শুনে রোমান সেনাপতি বলে উঠল, এই বেদুইনটাও গাদ্দারি করে গেল। একথা বলে সেনাপতি বোঝাতে চেয়েছিল, বেদুইন চাকর তার মেয়েকে ফুঁসলিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। মুসলমানদের কাছে গিয়ে মেয়েটাকে সেনাপতির হাতে তুলে দিবে আর তার বিনিময়ে গনিমতের ভাগ নিবে।

সেনাপতির এই সন্দেহটা ছিল নিছক অনুমাননির্ভর। প্রকৃত যে-তথ্যটা পরে জানা গেছে, তা হলো, মেয়েটা ফরমা থেকে বের হওয়া অবধিই বলতে শুরু করেছিল, আমি সেই বেদুইনদের কাছে যাব, যারা এখনও মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেয়নি এবং তাদের নেতাদের বলব, আপনারা যে করে হোক গাদ্দার বেদুইনদের ফিরিয়ে আনুন। এটা কোনো সহজ মিশন ছিল না। নুশি বোধহয় নিজেকে রাজপরিবারের কন্যা আর বেদুইনদের নিজের প্রজা মনে আদেশ চালাতে চাচ্ছিল। কিন্তু পরে সহস্য উন্মোচিত হয়েছিল, বেদুইন চাকর তাকে বলেছিল, আমি তোমাকে এমন এক বেদুইনের কাছে নিয়ে যাব যার হাতে অদৃশ্য শক্তি আছে এবং সে যা চায়, তা-ই করতে পারে। আবার রহস্যময় ব্যাধিও সে সারিয়ে তুলতে জানে।

বেদুইন চাকর নুশিকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল, এই জাদুকর বেদুইন যদি আদেশ দিয়ে দেয় কিংবা ভয় দেখিয়ে দেয়, তাহলে আর কোনো বেদুইন মুসলমানদের বাহিনীতে গিয়ে যোগ দিবে না এবং ইতিমধ্যে যারা যোগ দিয়েছে, তারাও ফিরে আসবে।

নুশির মা সেনাপতিকে আরও জানাল, নুশির আবেগ ও চেতনাগত অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। ফরমা থেকে খানিক দূরে এসে একটু পরপরই ঘোড়া থামিয়ে বলতে লাগল, আমি যাচ্ছি। আমরা তাকে জোর করে সামনের দিতে নিয়ে আসতাম আর সে আবারও দাঁড়িয়ে গিয়ে একই কথা বলত। এলাকাটা এমন ছিল যে, পাথর ও টিলা-টিপির কারণে কয়েক পা পরপরই ডানে-বাঁয়ে মোড় নিতে হতো। আর এতই সংকীর্ণ যে, ঘোড়াগুলো একটার পেছনে একটা সারিবদ্ধভাবে চালাতে হতো। নুশির চেষ্টা ছিল, ও সবার পেছনে থাকবে।

বেশ কিছু দূর পথ অগ্রসর হওয়ার পর এমন একটা জায়গা এল যে, পেছনের আরোহী সামনের আরোহীর কোনো খবর রাখতে পারছিল না। কাফেলা আসল রাস্তা থেকে সরে দুর্গম পথে অতিক্রম যাচ্ছিল, যাতে মুসলমানরা ধাওয়া করে এসে আমাদের ধরতে না পারে। খানিক প্রশস্ত একটা জায়গায় এসে দেখা গেল, নুশি আমাদের কাফেলার সঙ্গে নেই। বেদুইন চাকরটাও নেই।

নুশির হবু স্বামী বলল, আমি ওর পেছনে-পেছনে যাচ্ছি। সে আরও বলল, আপনারা আমার অপেক্ষা করবেন না। সবাই সামনের দিকে এগিয়ে যান। এভাবে সেনাপতির পরিবার বিলবিসের দিকে এগুতে থাকল আর নুশির হবু স্বামী নুশির খোঁজে তার পিছনে চলে গেল।

সেনাপতি ক্ষোভে লাল হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি এক্ষুনি ওকে ধাওয়া করব। কিন্তু স্ত্রী তাকে ধরে ফেলে বলল, সময় অনেক কেটে গেছে। এখন তাদের পেছনে যাওয়া বোকাবি ছাড়া কিছু হবে না।

'না; ওদিকে যাওয়া আমার ঠিক হবে না'– সেনাপতি সুর বদলে ফেলল– 'আমাকে এক্ষুনি বিলবিস পৌঁছে যাওয়া দরকার। অন্যথায় ওখানে রাষ্ট্র হয়ে যাবে, আমি পরাজিত হয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে গেছি। নুশির ব্যাপারে মনটা আমার দুরুদুরু করছে, পাছে ও মুসলমানদের হতে পড়ে যায় কিনা আর কোনো আরব বেদুইন তাকে স্ত্রী বা দাসি বানিয়ে ফেলে কিনা। তা ছাড়া মিশরি বেদুইন নিজেই মেয়েটাকে দখল করে রাখতে পারে এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

'আমি তোমাকে ভুল বলিনি'– সেনাপতির স্ত্রী বলল– 'মেয়েটা তোমার পাগল হয়ে গেছে। ও এসেও পড়ে যদি মাথাটা ওর ঠিক হবে না। আমি ওকে বলছিলাম, আবেগকে যারা বিবেকের উপর জয়ী করে দেয়, তারা ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যায়। কিন্তু আমি দেখলাম, মেয়েটা আবেগের রঙেই ভাবছে– বিবেককে একটুও কাজে লাগাচ্ছে না। ওর এই চাকরটা আর ওস্তাদও ওকে আবেগময় গল্প-কাহিনী শোনাত আর আমরা মনে করতাম মেয়েটার মাঝে জাতীয় মর্যাদাবোধ ও সামরিক চেতনা জাগ্রত হচ্ছে, যা কিনা রোম সাম্রাজ্যকে মজবুত করে তুলবে। কিন্তু ব্যাপারটা যে ওকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে, তা ঘুণাক্ষরেও কখনও ভাবিনি।

* * *

বেদুইন চাকর সৎ ছিল, নাকি অসৎ সে ভিন্ন ব্যাপার। তার জানা ছিল, বেদুইনদের এলাকা কোনটা এবং নুশিকে যার কাছে নিয়ে যাচ্ছে, সে কোথায় থাকে। পথপ্রদর্শন হিসেবে লোকটা বেশ দক্ষ ছিল। কারণ, সে নিজেও বেদুইন ছিল এবং নিজের এলাকা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল।

বেদুইনদের এলাকা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এক তো ছিল সেই অঞ্চল, যেখানে বেদুইনরা মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছিল। অরেকটা অঞ্চল ছিল ফরমা থেকে খানিক দূরে আলাদা একস্থানে, যেটি শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ ছিল। এখানেও বেদুইনরা বাস করত।

এই সবুজ-শ্যামল এলাকার বেদুইনরা মরু বেদুইনদের থেকে; মানে যারা মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়েছিল, তাদের চেয়ে খানিক ভিন্ন ছিল। ছিল এরাও কুসংস্কারবাদী; কিন্তু এদের বোধ-বিশ্বাস অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম ছিল। এরাও ভিন্ন ফেরকার খ্রিস্টান ছিল।

আসল সমস্যাটা ছিল, বেদুইন চাকর বুদ্ধিমান বা দূরদর্শী লোক ছিল না। নুশির আনুগত্যের সুবাদে সে তার সঙ্গ দিচ্ছিল। নুশিকে সে মুসলিমবিরোধী কাহিনী

শোনাতে পারত; কিন্তু কোনো বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ দেওয়ার যোগ্যতা ছিল না। অপরদিকে নুশি ছিল আবেগতাড়িতা। মেয়েটা যদি পুরোপুরি পাগল নাও হয়ে থাকে, আধাপাগল হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বয়সটাও ছিল তার যৌবনের। এটা মস্তিষ্কের উপর আবেগ-অথবা বিজয়ী হওয়ারই বয়স।

সূর্যটা যখন মাথার উপর উঠে এল, তখন নুশি তার বেদুইন চাকরের সঙ্গে বেদুইনদের এলাকায় প্রবেশ করল।

এ সময়ে তারা পিছনে ধাবমান ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পেল। দুজনে পিছনের দিকে ফিরে তাকাল। এক অশ্বারোহী প্রবল বেগে তাদেরই দিকে ছুটে আসছে। ওখানে বন খুব ঘন ছিল। কিন্তু এমন কোনো পাথর টিলা বা আড়াল ছিল না, যার পিছনে লুকানো যায়। অশ্বারোহী তাদের দেখেও ফেলেছিল। নুশি চাকরকে বলল, লোকটা যে-ই হোক ওকে বলো না, আমরা কোথায় যাচ্ছি। যদি সমস্যা মনে করি, তাহলে দুজনে মিলে ওকে হত্যা করে ফেলব। আমাদের সঙ্গে তরবারিও আছে, খঞ্জরও আছে।

অশ্বারোহী নিকটে এসে পড়ল। নুশি তার ডাক শুনতে পেল।

'নুশি!'– অশ্বারোহী ডাকল– 'থেমে যাও; আমি তোমার পেছনে এসেছি।'

নুশি ঘোড়া থামাল এবং পিছনের দিকে ফিরে তাকাল। তার হবু স্বামী আসছে।

'কোথায় যাচ্ছ নুশি!' নুশির হবু স্বামী জিজ্ঞেস করল।

'হেরাকল-এর আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে'– নুশি উত্তর দিল– 'যদি না জাগে, তাহলে রোমের মর্যাদাকে চিরতরে দাফন করে আসব।'

হবু স্বামী– যার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না– নুশির এতটুকু কথাতেই বুঝে ফেলল, মেয়েটা মানসিকভাবে ঠিক নেই। সে নিজের ঘোড়াটা নুশির ঘোড়ার সামনে নিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল আর বলল, আমার সঙ্গে ফিরে চলো।

'আমার পথে বাধা সৃষ্টি করো না'– নুশি তরবারিটা বের করে বলল– 'তোমার কাছেও আমি আশা রাখি, আমাকে তুমি সঙ্গ দেবে। কিন্তু তা না করে তুমি আমার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছ। এমন হলে তোমাকে আমি মুসলমানদের চেয়েও ঘৃণ্য শত্রু মনে করব। সরে যাও; পথ ছাড়ো।'

'তোমাকে আমি আমার ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলছি'– হবু স্বামী বলল– 'আমি তোমার উপর জবরদস্তি করব না। আমিও রোমান। আমি মরে যাইনি।'

'আমার অন্তরে তুমি ছাড়া কেউ নেই'– নুশি বলল– 'কিন্তু এই হৃদয় থেকে রোম সাম্রাজ্যের ভালবাসা আমি বের করতে পারব ন। আমার প্রথম ভালবাসা রোম। তারপর তুমি। যদি আমার সঙ্গ দিতে সম্মত হও, তাহলে আমার সঙ্গে আসো। নাহয় আমার হাতে তুমি প্রাণ হারাবে।'

'শেষ পর্যন্ত আমাকে মরতেই হবে'– নুশির হবু স্বামী বলল– 'কিন্তু আমি রোমের খাতিরে কোনো মুসলমানের হাতে মৃত্যুবরণ করা বেশি পছন্দ করব। আমি জানি, তুমি বেদুইন-নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ। কিন্তু এটা কোনো নারীর কাজ নয়। এটা সেনাপতি পর্যায়ের ব্যাপার। এই বেদুইনরা অল্পবয়স্কা মনে করে তোমাকে পাত্তা দেবে না।'

'তুমি কোন পুরুষদের কথা বলছ?'– নুশি তাচ্ছিল্যের সুরে বলল– 'হেরাকলের? মুকাওকিসের? সেই আতরাবুনের, নিজেকে জগতের সবচেয়ে বড় বীর ও বিচক্ষণ সেনাপতি মনে করে? কোথাও এরা সবাই? সবাই আপন-আপন জায়গায় বিলাসিতায় ডুবে আছে আর আমার বাবাকে সামনে রেখেছে। আব্বাজান মুকাওকিস ও আতরাবুনকে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তিন-চার হাজার বেদুইন মুসলমানদের সাথে গিয়ে যোগ দিয়েছে এবং তারা তরিতরকারি ও গবাদি পশু সংগ্রহ করে মুসলমানদের সরবরাহ করছে। কিন্তু কেউ এর প্রতিকারের চিন্তা করলেন না। এবার এই কাজটা আমি করব।'

'ফরমা পর্যন্তই রোম সাম্রাজ্যের ইতি নয় নুশি!'– নুশির হবু স্বামী বলল– 'এটিই শেষ দুর্গ, যেটি মুসলমানরা জয় করেছে। আর নয়। সামনে তাদের জন্য মৃত্যু ছাড়া কিছু নেই। আমাদের গোয়েন্দারা খুব কাছে থেকে তাদের অবলোকন করছে। তারা পিছন থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছে না। ফরমায় তাদের জানি ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। বেদুইনরা বেশিরভাগ প্রাণ হারিয়েছে। তাদের শক্তি কমে যাচ্ছে। পিছন থেকে সাহায্য আসার পথ আরও দীর্ঘ হয়ে গেছে। সাহায্য যদি আসেও, পথেই তাদের গতিরোধ করে নিঃশেষ যদি নাও করতে পারি দুর্বল অবশ্যই করে দেব। সেই ব্যবস্থা আমরা করে রেখেছি।'

'তুমি যদি সেনাপতি হতে, তাহলে হয়ত আমি তোমার কথাগুলো আমলে নিতাম'– নুশি বলল– 'তুমি নিম্নপদের একজন দায়িত্বশীল। শোনা কথাগুলোই কেবল আমাকে শোনাচ্ছ। কিন্তু উচ্চপর্যায়ে আমি এমন কোনো তৎপরতা দেখতে পাচ্ছি না। আমি মুসলমানদের থেকে ওই মিশরি বেদুইনদের সরিয়ে আনতে চাই। যদি না পারি, তাহলে এখনও হাজারো বেদুইন আছে, যারা না আমাদের সঙ্গে আছে, না মুসলমানদের সঙ্গে। তাদের আমি আমার দলে ভিড়িয়ে নিতে চাই। তাদের দ্বারা আমি একটা বাহিনী গঠন করব এবং পরে মুসলমানদের পথ আটকাব। এটা আমার প্রত্যয়। এর জন্য আমি তোমার ভালবাসাকে অতি সহজেই জলাঞ্জলি দিতে পারব।'

সে-যুগের ইতিহাস যদি একটু গভীর মনে অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে এই রোমান মেয়েটার এই প্রত্যয় বিস্ময়কর মনে হয় না। সেযুগে এমন কয়েকটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, কোনো-না-কোনো নারী যেগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছে এবং বড়-বড় বাহিনীর মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে। রোমানদের মাঝে সামরিক চেতনা বিদ্যমান ছিল এবং

নিঃসন্দেহে তারা যুদ্ধবাজ ছিল। তাদের মাঝে সবচেয়ে বড় দুর্বলতাটা ছিল, তাদের নেতৃত্বের উপর রাজত্ব গালেব ছিল। এই চরিত্রটা তাদের বাহিনীকে বুঝ দিয়ে রেখেছিল, তারা রাজা ও সেনাপতিদের দাসানুদাস কিংবা বেতনভুগী কর্মচারী। এই বাহিনীতে জিহাদ নামের কোনো জযবা ছিল না। কিন্তু তার অর্থ এও ছিল না যে, এই বাহিনী লড়াই জানত না। রোমানরা প্রকৃতিগতভাবে লড়াকু ছিল এবং তাদের পিছনে বীরত্ব ও লড়াইয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাস ছিল।

তো সে-যুগে নারীরা একাধিক যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং সফলতা অর্জন করেছিল। এই ইতিহাসকে সামনে রাখলে নুশির ব্যাপারটা বিস্ময়কর মনে হয় না। কিন্তু তার মাঝে দুর্বলতা ছিল, মেয়েটার বয়স কম ছিল এবং তার বিবেকের উপর আবেগ জয়ী ছিল। আরেকটা সমস্যা ছিল, মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী ও খুবই মনোহারিণী ছিল। বেদুইনদের উপর আস্থা রাখা যাচ্ছিল না, তারা নুশির জযবা দ্বারা প্রভাবিত হয়, নাকি রূপ দ্বারা। রূপ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মাঝে অনেক বড় শঙ্কা লুকায়িত ছিল।

* * *

নুশির হবু স্বামী দেখল, মেয়েটাকে জোর খাটিয়েও পিছনে নেওয়া যাচ্ছে না, কোনো যুক্তি-প্রমাণও সে মেনে নিতে সম্মত হচ্ছে না। আবার মেয়েটাকে একলাও ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এমন একটা রূপসী যুবতী মেয়েকে বেদুইনদের কাছে যেতে দেবে তাতেও তার মন সরছে না। কিছুক্ষণ ভাবনার জগতে ঘুরপাক খেয়ে নুশির বেদুইন চাকরকে জিজ্ঞেস করল, একে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

'আমার উপর দায় চাপানো ঠিক হবে না'– ভয়ে আড়ষ্ট মধ্যবয়সী চাকর ভৃত্যসুলভ কণ্ঠে বলল– 'শাহজাদির সঙ্গে আপনি নিজে কথা বলে দেখেছেন। তিনি আপনার কথা মান্য করার পরিবর্তে তরবারি বের করে হাতে নিয়েছেন। আপনি-ই চিন্তা করুন, তার সঙ্গে না এসে পারা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা।'

নুশির হবু স্বামী চাকরকে ধমক দিয়ে বলল, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, নুশিকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ।

'হামুনের কাছে।' চাকর উত্তর দিল।

'হামুন কে?'

'সবাই তাকে জাদুকর বলে'– চাকর উত্তর দিল– 'লোকটা জাদুকর হতেও পারে, না-ও হতে পারে। এটা আমার জানবার বিষয় নয়। আমি জানি, তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যার উপর ভিত্তি করে তিনি সেসকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, যা অন্য কারও কাছে পাওয়া যায় না। চাই প্রশ্নটা ভবিষ্যত সম্পর্কেই হোক। তার এই অদৃশ্য শক্তির কারণে প্রতিজন বেদুইন তার প্রতিটি কথা মান্য

করে। শুধু একজন মানুষ আছেন, যিনি হামুনকে দেখতে পারেন না। গোত্রপতিদের কেউ হামুনের অনুসারী, কেউ ধর্মনেতার ভক্ত। একে আমি সেই হামুনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ভালোই হলো, আপনিও এসে পড়েছেন। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন এবং নিজে হামুনের সঙ্গে কথা বলুন।'

'হামুন কী করবে?' নুশির হবু স্বামী জানতে চাইল।

'বিষয়টা আমি শাহজাদিকে আগেই বলেছি'– চাকর বলল– 'সবার আগে সে দেখবে, শাহজাদির মনোবাঞ্ছা পূরণ হওয়ার মতো কিনা। যদি না হয়, তাহলে তিনি পরিষ্কার বলে দেবেন আর শাহজাদি ওখান থেকে ফিরে আসবেন।'

'আমি আশাবাদী, তিনি আমার কাজ সমাধা করে দেবেন'– নুশি বলল– 'যদি তার কাছে সত্যিই জাদু থাকে, তাহলে তিনি অবশ্যই আমার বাসনা পুরা করে দেবেন।

নুশির হবু স্বামী মধ্যবয়সী ভৃত্যকে আরও কিছু প্রশ্নোত্তর করল। তার কাছে লোকটার কথাবার্তা কাঁচা-কাঁচা মনে হলো এবং অনুভব করল, লোকটা কুসংস্কারবাদী আর নুশির উক্ত জাদুধকরের কাছে না যাওয়া উচিত। হতে পারে, লোকটা ভেলকিবাজ ও প্রতারক। বেদুইনদের মাঝে এমন কিছু লোক ছিল, যারা মূলত ভেলকিবাজ ছিল এবং মানুষ তাদের খোদার দূত বলে বিশ্বাস করত। নুশির হবু স্বামী তাকে আবারও বোঝাতে চেষ্টা করল, নিজের জাতীয় চেতনাকে তুমি এভাবে লাঞ্ছিত করো না এবং ফিরে চলো। কিন্তু নুশি কোনোমতেই তার বাগে আসছিল না।

নুশির হবু স্বামী আবারও তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল এবং ঘোড়াটাকে পিছনের দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করল। নুশি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ল এবং তরবারি উঁচু করে ধরে হুঙ্কার দিল, তুমি নেমে আসো। নুশির হবু স্বামী ঘোড়া থেকে নেমে এল; কিন্তু সে তরবারি বের করল না। এ তো হতে পারে না যে, সে তরবারি বের করে নুশির মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে। সে নুশির কাছে গিয়ে দাঁড়ালে নুশি তরবারিটা সজোরে ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে আগাটা হবু স্বামীর বুকের উপর রাখল।

'তরবারি বের করো'– নুশি বলল– 'আমার থেকে দূরে সরে যাও।'

'এই তরবারিটা আমার বুকে গেঁথে দাও'– নুশির হবু স্বামী বলল– 'তারপর তুমি যেখানে খুশি চলে যাও। আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।'

বেদুইন চাকর দুজনের মধ্যখানে এসে দাঁড়াল। নুশি তাকে ধমকাতে শুরু করল, মধ্যখান থেকে সরে যাও। কিন্তু তার তো সরবার জো নেই। নাহয় মেয়েটা লোকটাকে খুন করে ফেলে কিনা কে বলবে। নুশি তার হবু স্বামীকে হুঙ্কার দিয়ে চলছে। কিন্তু সে খাপ থেকে তরবারি বের করছে না। ভৃত্য একদিকে সরে গিয়ে হঠাৎ খপ করে নুশির তরবারিধারী হাতের কনুইটা ধরে ফেলল। নুশি নিজেকে

ছাড়াতে চেষ্টা শুরু করলে এবার হবু স্বামী তাকে কাবুতে নিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল। সে পিছনে গিয়ে নুশির কোমরটা ঝাঁপটে ধরল। নুশি নিজেকে ছাড়াতে ছটফট শুরু করে দিল।

'ছেড়ে দাও ওকে।' একটা আওয়াজ গর্জে উঠল।

হঠাৎ তিনজন নিথর হয়ে গেল এবং যে যেখানে ছিল থমকে গেল। তারপর আস্তে-আস্তে সোজা হয়ে সেদিকে তাকাল, যেদিক থেকে আওয়াজটা এসেছিল।

* * *

লোকটা একজন অশ্বারোহী। ক্লিনশেভ চেহারা। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্যবান ও উঁচা-লম্বা। গায়ের পোশাক ও বেদুইন নেতাদের মতো। প্রভাবদীপ্ত চেহারা।

লোকটার ব্যক্তিত্ব নুশি ও তার হবু স্বামীর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করল যে, নুশি তরবারিটা নামিয়ে ফেলল এবং খানিক বিস্ময়ের সাথে তাকাতে লাগল। একই প্রতিক্রিয়া নিয়ে নুশির হবু স্বামীও চুপচাপ লোকটাকে দেখতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, এদের দুজনেরই উপর লোকটার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বেদইন বেচারা তো ভৃত্য মানুষ। তাই সে আলাদা সরে একজায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

অশ্বারোহী তাদের নিকটে চলে এল এবং তাদের চারদিকটা চুপচাপ ঘুরে তাদের দেখতে লাগল। অবশেষে সে ঘোড়া থামিয়ে নুশিকে জিজ্ঞেস করল, কে তুমি?

নুশি যেন আচম্বিত সজাগ হয়ে গেল। সে গর্বের সুরে বলল, আমি একজনর সেনাপতির কন্যা এবং সম্রাট হেরাকল-এর রাজপরিবারের সন্তান। ইনি বাহিনীর একজন অফিসার এবং আমার হবু স্বামী। আর এ আমর ভৃত্য।'

'তোমাদের ব্যাপার-স্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আমার অধিকার না থাকাই উচিত'– লোকটা ঘোড়া থামিয়ে বলল– 'কিন্তু আমি তো ব্যাপারটা অন্য রকম দেখেছি। সেজন্য আমি হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হচ্ছি। তোমরা এখন আমার অঞ্চলে আছ। আমার দায়িত্ব হলো, কেউ বিপদগ্রস্ত হলে আমি তাকে সাহায্য করব। শোনো মেয়ে! তুমি রাজাপরিবারের সদস্যা হও আর কোনো গরিবের কন্যা হও তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এরা দুজন তোমার উপর জবরদস্তি করছিল। তোমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি?'

'হয়তবা তুমি আমার কোনো সাহায্য করতে পারবে' নুশি বলল– 'এরা আমার উপর অমন কোনো জবরদস্তি করছিল না, যেমনটা আপনি মনে করছেন। আমাকে এরা আমার পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছেন। আমার এরা শত্রু নয়।'

'আগে আমার কথার উত্তর দাও'– 'নুশির হবু স্বামী বলল– 'তুমি কে? তোমাকে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে। আমি তোমার এই চেতনার মূল্যায়ন করছি যে, তুমি এই মেয়েটার সাহায্যে থেমে গেছ।'

'এস; আমরা একজায়গায় বসি এবং আরামের সাথে কথা বলি।' লোকটি বলল।

এরা তিনজন আর আগন্তুক লোকটি তাদের ঘোড়াগুলোকে মুক্ত ছেড়ে দিয়ে একটা গাছের তলায় গিয়ে বসল।

'আমার নাম সাইলিনুশ'– আগন্তুক বলল– 'মূলত আমি মিশরি বেদুইন আর খ্রিস্টবাদ আমার ধর্ম। গোত্রের অধিপতি নই বটে; তবে সবগুলো গোত্রের সব কজন নেতা আমাকে সম্মান করে, যেন আমি নেতাদের নেতা।'

'আপনি কার অনুগত?'– নুশি জিজ্ঞেস করল– বেদুইনদের, নাকি রোমসম্রাটের?'

'রোমসম্রাটকে আমি আমার রাজা মানি'– সাইলিনুশ উত্তর দিল– 'এটা মনে করো না, তুমি রাজপরিবারের সন্তান বলে আমি তোমাদের ভয়ে একথা বলেছি। আমি রোমসম্রাট হেরাকল-এর অফাদার এবং তার খ্রিস্টধর্মের অনুসারী।'

'আমি বিশ্বাস করলাম না'– নুশি বলল– 'তুমি যদি রোমসম্রাটের অফাদার হতে, তাহলে তোমাদের গোত্রের প্রতিটি যুবক তাঁর বাহিনীর সৈনিক হতো। তোমার কি জানা আছে, মুসলমানরা আরিশের পর ফরমাও দখল করে নিয়েছে? তোমাকে আমি আরও তথ্য দিচ্ছি, ফরমার ফৌজের কমান্ড আমার পিতার হাতে ছিল। আমি আমার পিতা ও হবু স্বামীকে কাপুরুষ মনে করি।'

'আমি আমার অফাদারির কথা বলেছি'– সাইলিনুশ বলল– 'বেদুইন গোত্রগুলোর আলাদা-আলাদা চিন্তা, ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। বেশ কিছুদিন আগেই তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তোমরা বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যাও। কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানাল। ওরা স্বাধীনচেতা মানুষ। কারও আদেশ-নিষেধ ওরা মানে না। ওদের বাগে আনতে হলে তোমাকে ওদের ভায়ে-ভায়ে কথা বলতে হবে। নিজের প্রজা মনে করে যদি ওদের সঙ্গে গরু-ছাগলের মতো হাঁকাতে চেষ্টা কর, তাহলে ওরা তোমাদের পেছনে হাঁটবে না।'

'তোমার কি জানা আছে'– নুশি জিজ্ঞেস করল– 'সাড়ে তিন থেকে চার হাজারের মতো বেদুইন মুসলমানদের বাহিনীতে গিয়ে যোগ দিয়েছে?...'

'আমার জানা আছে'– সাইলিনুশ নুশির কথা কেটে বলল– 'এমন একজন মানুষ তৈরি করো, যে মুসলমানদের মতো কথা বলতে জানে এবং তার চলনবলনও মুসলমানদের অনুরূপ। আগে বলো, তুমি কী বলতে চাও। তারপর বলো, তোমার হবু স্বামী কথা বলছে না কেন?'

'বলবে'– নুশি বলল– 'আগে শুনে নাও আমি কী চাই। আমি বেদুইনদের একটা বাহিনী গঠন করতে চাই। আমার এই ভৃত্য আমাকে সঙ্গে করে এনেছে। এও বেদুইনদের কোনো একটা গোত্রের সদস্য। এ আমাকে জাদুকর হামুনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, বেদুইনরা তার কথা শোনে। এ ব্যাপারে আমাকে তুমি কোনো সাহায্য করতে পার কি?

'আমি হামুনকে জানি'– সাইলিনুশ বলল– 'বল যদি আমিও তোমার সঙ্গে যাব। এজন্য যাব যে, আমার অফাদারি রোমানদের সঙ্গে।'

নুশি সাইলিনুশের সঙ্গে সেই কথাগুলো বলল, যেগুলো সে তার পরিবারের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে এবং পরে তার হবু স্বামী ও বেদুইন ভৃত্যের সঙ্গে বলেছিল। এই ভৃত্যকে সঙ্গে করে পরিবারের লোকদের থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে কীভাবে এদিকে এল তাও সে ব্যক্ত করল। তার হবু স্বামী কীভাবে তাকে ধাওয়া করল এবং এখানে এসে কীভাবে তাকে পেয়ে গেল তারও বিবরণ দিল।

'এরা আমাকে পাগল মনে করছে'– নুশি বলল– 'এই বেচারা তো আমার ভৃত্য। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে। কিন্তু হবু স্বামী আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে। রোমসাম্রাজ্যের জন্য আমি আমার প্রেম-ভালবাসা-ই নয়– জীবনও বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি চিন্তা করো সাইলিনুশ! শামের মতো রাজ্যটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। মুসলমানরা মিশরের দ্বিতীয় বৃহৎ নগীর ফরমাও আমাদের থেকে নিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় যতক্ষণ-না আমরা চেতনার তীব্রতায় পাগল না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত এই মুসলমানদের– যারা মূলত আরবের বেদুইন– 'পেছনে হটাতে পারব না। ওদের থেকে আমাদের শামও পুনরুদ্ধার করতে হবে।'

'শাবাশ!'– সাইলিনুশ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বলল– 'তোমার এই চেতনার মূল্যায়ন কেবল আমি-ই করতে পারব। আমি আশা করি, বেদুইনদের একটা বাহিনী তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু আগে হামুনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'আগে আমি জবরদস্তির বিষয়টা পরিষ্কার করব'– নুশি বলল– 'আমার জাতীয় চেতনার তীব্রতার অবস্থা হলো, আমি তরবারি বের করে নিয়েছিলাম। তুমি যদি এসে না পড়তে, তাহলে হয় আমার হবু স্বামীকে আমি হত্যা করে ফেলতাম, নাহয় তার হাতে আমি খুন হয়ে যেতাম। এরা দুজন আমার থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিতে ঝাঁপটাঝাঁপটি করছিল আর ইতিমধ্যেই তুমি এসে পড়েছ।'

'দেখো শাহজাদি!'– সাইলিনুশ বলল– 'তোমার উপর তার এই জবরদস্তি ভুল ছিল না। যে-কাজের নিমিত্ত তুমি এসেছ, এটি একা তোমার কাজ নয়। তোমার বয়স, তোমার রূপ এমন যে, আমাদের যেকোনো ধর্মনেতারও মন খারাপ হয়ে যেতে পারে। গোত্রের অধিপতিরা আকাশ থেকে নেমে আসা ফেরেশতা নন। এবার তোমার হবু স্বামীও এসে পড়েছে; আমিও এসে পড়েছি। যাচ্ছিলাম তো আমি অন্য

কোথাও। কিন্তু আমার মাঝেও সেই জযবা আছে, যেটি তোমাকে পাগল বানিয়ে রেখেছে। তোমাকে আমি সঙ্গ দেব।'

'কাজ দুটি'– নুশি বলল– 'এক হলো, এই বেদুইনদের রোমান বাহিনীতে যুক্ত করতে হবে। আরেক হলো, যেসব বেদুইন মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছে, মুসলমানদের প্রতি বিরূপ ধারণা তৈরি করে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'এই দ্বিতীয় কাজটা সহজ নয়'– সাইলিনুশ বলল– 'এর জন্য আমাদের কিছু লোককে ওখানে পাঠাতে হবে। গিয়ে তারা বলবে, আমরা মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিতে এসেছি এবং আমরা মুসলমানদের চরিত্রে খুবই প্রভাবিত। তারপর এরা তলে-তলে এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে, যার ফলে বেদুইনরা মুসলমানদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে।'

তারপর সাইলিনুশ এমন জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা বলতে লাগল যে, তাতে নুশি ও তার হবু স্বামী পুরোপুরি প্রভাবিত হয়ে গেল। এবার নুশির হবু স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করল এবং সাইলিনুশের সাথে যেতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

'তুমি বাহিনীর একজন অফিসার এবং রাজপরিবারের সদস্য'– সাইলিনুশ নুশির হবু স্বামীকে বলল– 'এমন কিছু বিষয় তোমার জানা থাকবে, যা বাহিনীর বড়-বড় অফিসারেরও জানা থাকে না। তোমার কাছ থেকে আমি কিছু তথ্য জানতে চাই। আমার অবাক লাগছে যে, আরিশের পর মুসলমানরা ফরমার মতো মজবুত দুর্গটাও জয় করে নিল! অথচ এই দুর্গ সমর্কে সবাই বলত, কোনো শক্তি-ই একে পদানত করতে পারবে না। কারণ, এর অবস্থান পাহাড়ের উপর এবং বেশ কয়েকটা দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। আমি আরও শুনেছি, মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। যদি তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার বেদুইন তাদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েও থাকে, তারপরও রোমান সৈন্য এত বেশি যে, মুসলমানদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীটা রোমান বাহিনীর ছায়ার মধ্যেই হারিয়ে যাওয়ার কথা। ব্যাপারটা আসলে কী? রোমানরা কী কারণে পরাজিত হলো?'

'এই পরাজয়ের একটা কারণ হলো'– নুশির হবু স্বামী বলল– 'মুকাওকিস ও আতরাবুন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, মুসলমানদের আরও সামনে আসতে দেব। তাতে তারা আশম্বিত হয়ে উঠবে, মিশর জয় করা কোনো কঠিন কাজ হবে না। এভাবে আমরা তাদের ফাঁদে ঢুকিয়ে ফেলব।'

নুশির হবু স্বামী সেই সবগুলো কারণ ব্যক্ত করল, যেগুলো ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। সে আরও জানাল, রোমান বাহিনীকে একটা দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তারা কিবতি খ্রিস্টানদের উপার চোখ রাখবে। কারণ, আশঙ্কা ছিল, তারা বিদ্রোহ করবে। এভাবে রোমান বাহিনী সমগ্র মিশরে ছড়িয়ে পড়েছিল, যা কিনা এই বাহিনীর জন্য একটা দুর্বলতা তৈরি করে দিল।

'সামনে আরেকটা বৃহৎ নগরী আছে বিলবিস'– 'সাইলিনুশ বলল– 'এই নগরীর প্রতিরক্ষাও কি দুর্বলই রাখা হবে, যাতে মুসলমানরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে আসে?'

'বোধহয় না'– নুশির হবু স্বামী উত্তর দিল– 'আমি যতটুকু জানি, বিলবিস মুসলমানদের জন্য একটা ফাঁদ হবে, যেখানে এসে তারা আর বেরুতে পারবে না। ওখানে মুকাওকিস কিংবা আতরাবুন বাহিনীর নেতৃত্ব হাতে তুলে নিবেন। মুসলমানরা পিছন থেকে সাহায্য পাচ্ছে না। অবশ্য আমি এর কারণ বলতে পারব না। আমরা মদিনা পর্যন্ত গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছে, যারা ওখানকার যাবতীয় খবরাখবর ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত করবে।'

নুশির হব স্বামী সাইলিনুশ দ্বারা এত অধিক প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল যে, অনেক ভিতরকার বহু সামরিক তথ্যও সে তাকে বলে দিল। সাইলিনুশ এমন একটা ভাব ধরেছিল, যেন সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি সে ভালোই বোঝে।

এটা-ওটা নানা কথা শুনে অবশেষে সাইলিনুশ বলল, এবার চলো; আমরা হামুনের কাছে যাই। এখন আর তাদের বেদুইন ভৃত্যের প্রয়োজন নেই বটে; কিন্তু হামুনের আস্তানা সঠিকভাবে তারই জানা ছিল। ফলে তাকেও রেখে দেওয়া হলো।

* * *

হামুনের আস্তানায় পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পশুচর্মের তৈরী সুপরিসর একটা তাঁবু। সাধারণত কোনো তাঁবুর পরিধি এত প্রশস্ত হয় না। তাঁবুর বাইরে একজন লোক বসা, যার বয়স চল্লিশের মতো। গাঢ় কালচে গাত্রবর্ণ। লাল-লাল চোখ। দাঁতগুলো হলদেটে। মুখাবয়ব বিরক্তিকর ও অপয়া-অপয়া ভাব। মাথার চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো। মাথার উপর অত্যন্ত ময়লা ও কুশ্রী একটা কাপড় জড়ানো। দুজন লোক সামনে বসে তার পা টিপছে। এই লোকটা-ই হামুন, বেদুইনরা যাকে পীর ও মুরশিদ বানিয়ে রেখেছে।

সাইলিনুশ, নুশি, নুশির হবু স্বামী ও বেদুইন ভৃত্য তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বেদইন ভৃত্য মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে সালাম করল। হামুন তাদের পানে এমনভাবে তাকাল, যেন সে নয়– এরা চারজন অতিশয় হীন ও ঘৃণ্য মানুষ।

'হামুন!'– সাইলিনুশ বলল– 'আমি তোমার জন্য অতিথি নিয়ে এসেছি। এরা কোনো সাধারণ মানুষ নয়। এরা রাজপরিবারের লোক। এই মেয়েটা শাহজাদি আর এ তার হবু স্বামী এবং রোমান বাহিনীর একজন অফিসার। আর এই লোকটা এদের ভৃত্য।'

হামুন হাত দ্বারা ইশারা করল, মাটিতে বসে পড়ো। তার ভাবগতিতে রাজপরিবারের বিন্দুমাত্রও সম্মানবোধ প্রতীয়মান হলো না। চারজন মাটিতে বসে পড়ল।

'রাজা হোক আর ভিখারী'– হামুন দোলায়মান কণ্ঠে বলল– 'এখানে এসে সবাই এক হয়ে যায়। হেরাকল সম্রাট। কিন্তু রোমান রাজত্বের রস মরুভূমির বালি চুষে নিয়েছে। কোথায় আছেন হেরাকল? শাহজাদিকে কেন পাঠালেন?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করুন হামুন!'– সাইলিনুশ বলল– 'আমরা জানতে এসেছি, রোমান রাজত্বকে তো মরুর বালিকণা চুষে খেয়ে ফেলেছে; যতটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও নীলনদে ডুবে যাবে না তো?'

বালির যে-ঝড়োহাওয়া আরব থেকে উঠে এসেছে, তার নীল পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে'– হামুন বলল– 'হেরাকল বাজিন্তিনিয়ায় বসে আদেশ চালাচ্ছেন। মুকাওকিস ও আতরাবুন এসকান্দারিয়ায় বসে নিজেদের ধ্বংসের তামাশা দেখছেন। এমতাবস্থায় এই ঝড় কে থামাবে?'

'তুমি থামাবে হামুন!'– সাইলিনুশ বলল– 'তোমার কাছে আমরা এই আর্জি নিয়েই এসেছি। এই যে তুমি বললে, সবাই দূরে বসে তামাশা দেখছে, এই শাহজাদিও বিষয়টা এমনই মনে করে এবং ব্যাপারটা এর হৃদয়কে পোড়াচ্ছে। এ নিজের মতো করে একটা বাহিনী তৈরি করতে চাচ্ছে, যাতে এই অঞ্চলের বেদুইনরা যোগ দেবে। তুমি একটু পরদার আড়ালে উঁকি দাও আর বলো, এর মাঝে শাহজাদির কামিয়াবি আছে কিনা। একটু বলো, রোম সাম্রাজ্যের জন্য এই কালো পরদাগুলোর অন্তরালে কী আছে।'

'যা আমি জানি, তা তোমরা জান না'– 'হামুন আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল– 'অনেক সময় এমনও হয়, আমি কোনো একটা বিষয় জানতে চাই; কিন্তু তথ্য আসে না। জমিনও কথা বলে না, আসমানও চুপ থাকে। কোনো-কোনো পরদা শাদা হয়। অপসারণ করে দেখি, তার পেছনকার গোটা পরিবেশ এবং প্রতিটা বস্তু কালো। আবার কোনো-কোনো পরদা কালো হয়। সরালে পেছনে ভোরের দুধশাদা উজ্জ্বলা দৃষ্টিগোচর হয়।... এবার ভেতরে চলো।'

হামুন উঠে দাঁড়াল এবং তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। সাইলিনুশ, নুশি ও নুশির হবু স্বামীও তার পিছনে-পিছনে তাঁবুতে ঢুকল। সবার পরে বেদুইন ভৃত্য অবনত মাথায় ভিতের ঢুকল এবং তার মনিবদের পিছনে মাটিতে বসে পড়ল। চারজন তাঁবুটা ভালোমতো দেখল। মনে হলো, অতিশয় রহস্যময় ও ভীতিকর একটা পরিবেশে এসে পড়েছে, এই জমিনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। অনুমিত হচ্ছিল, তাঁবুটা না জমিনে, না আসমানে। বরং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে শূন্যে ঝুলে আছে এবং এটা কোনো মানুষের আস্তানা নয়।

এটা হামুনের জগত। তাঁবুতে মানুষের পাঁচ-ছটা শুষ্ক মাথার খুলি ঝুলছে। একাংশে হামুন মাটিতে গদি বিছিয়ে নিজের বসার জাগয়া তৈরি করে রেখেছে। দুটা মানবখুলি আর তিন-চারটা বাহুর হাড় ওখানেও রাখা আছে। আছে আরও কিছু

সামানপত্র। সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর একটা কালো নাগ, যেটা একটা উন্মুক্ত টুকরি থেকে বের হচ্ছিল।

হামুন নিজের আসনে বসে পড়ল। টুকরি থেকে বের হওয়া নাগটা তার কোল বেয়ে অতিক্রম করতে লাগল। কিন্তু সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সে হঠাৎ ফণা মেলে ধরল এবং তার কোলে ঝুমতে লাগল। হামুনের ডান দিকে একটা কালো পরদা ঝুলছিল। সে একটা লাঠি দ্বারা পরদাটা সরিয়ে দিল। তাতে তার পিছন থেকে যে-বস্তুটা আত্মপ্রকাশ করল, সেটা দেখে নুশির মুখ থেকে একটা অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল। বস্তুটা মানবহাড়ের একটা পরিপূর্ণ কঙ্কাল।

'ভয় পেয়ো না শাহজাদি।'– হামুন বলল– 'একদিন তোমারও এই রূপবান শরীরটা এমনি অবস্থায় মানুষের সামনে উপস্থিত হবে আর দর্শকরা ভাববে, এ কে ছিল। তারপর তারা নিজেরাই উত্তর ঠিক করে নেবে, এ কোনো একজন মানুষই ছিল। এই কঙ্কালটা আমার ওস্তাদ আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁকে দিয়েছিলেন তাঁর গুরু।

ইনি একদিন রোমের রানি ছিলেন। মানবহত্যা এর নেশা ছিল। মানুষ খুন করিয়ে তাদের ছটফটানি, রক্তের প্রবাহ এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দৃশ্য অবলোকন করে আনন্দ উপভোগ করতেন। আরও একটা স্বভাব ছিল। একজন গোলামকে সারা রাত নিজের কাছে রাখতেন আর সকালে তার হাতে একটা খঞ্জর দিয়ে বলতেন, এর দ্বারা নিজের পেটটা এমনভাবে ছিঁড়ে ফেলো, যেন ভেতরের সব কিছু বাইরে বেরিয়ে আসে। গোলাম তার আদেশ তামিল করত আর ব্যাপারটা তার চিত্তবিনোদনের কারণ হতো। অবশেষে তাঁরই এক গোলামের হাতে তিনি শেষ পরিণতি লাভ করেছিলেন। রানি সারা রাত গোলামের সাথে মনোরঞ্জন করলেন। সকালে গোলামকে খঞ্জরটা দিয়ে বললেন, এটা দ্বারা তোমার পেটটা ছিঁড়ে ফেলো। গোলাম খঞ্জরটা তাতে নিল এবং রানিরই পেটটা ছিঁড়ে ফেলল। তার পেট থেকে সব কিছু বেরিয়ে এল। গোলাম তার ছটফটানি দেখে খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। রানি ছটফট করে মরে গেলে এবার গোলাম নিজের পেটটাও ছিঁড়ে ফেলল।

'সেই রানিকে আজ দেখে তোমরা দেখে নাও'– বলেই হামুন কঙ্কালটার দিকে ইশারা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল'– 'অনেক কষ্টে আমি এর আত্মার সন্ধান বের করেছি এবং মাঝে-মধ্যে এর আত্মাকে আমি তলব করি।'

হামুনের এই বক্তব্যের শ্রোতা তিনজন পুরুষ আর একটা যুবতী মেয়ে। বক্তব্যটা তাদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করল, যেন তাদের আত্মাগুলো দেহ থেকে বেরিয়ে গেছে আর তারা এক-একটা কঙ্কাল এখানে পড়ে আছে। এক তো ছিল কথাবার্তা এ রকম। দ্বিতীয়ত হামুনের বলার ধরন এমন ছিল যে, শ্রোতাদের উপর খুবই বিস্ময়কর প্রভাব সৃষ্টি করছিল।

'একটা কথা বলো হামুন।'– নুশি মনটাকে শক্ত করে জিজ্ঞাসা করল– 'এই রানির আত্মার সাথে তোমার কী-কী কথা হয়?'

'অনেক দীর্ঘ আলাপ হয়'– হামুন বলল– 'একটা আত্মার কথাবার্তা তোমাকে শোনাব এর যোগ্য আমি এখনও তোমাকে মনে করি না। তবে শোনাব অবশ্যই। আর সেই কথাগুলো তোমার কাজে আসবে। তুমি যদি রাজকন্যা হয়ে থাক, তাহলে রানি হতেও পার। এই রানির আত্মা আমাকে বলেছিল, তিনি এতই রূপসী ছিলেন যে, তার আদেশে যারা নিজেদের পেট বিদীর্ণ করত, তারা গর্ব বোধ করত, আমরা এই রানির হুকুম তামিল করছি। তিনি তোমারই মতো সুন্দরী ছিলেন বোধহয়। কোনো নারী যদি রানি হন আর তোমার মতো রূপসী হন, তাহলে নিজেকে দেবী জ্ঞান করে তিনি খোদাকে ভুলে যান। কিন্তু খোদা কখনও নিজের বান্দাকে ভোলেন না এবং প্রতিজন বান্দার সেই কর্মগুলোও প্রত্যক্ষ করেন, যেগুলো বান্দা নিজের থেকেও গোপন রাখবার চেষ্টা করে। আজকের হেরাকল কাল হাড়ের কঙ্কালে পরিণত হবে। কথা অনেক দীর্ঘ। এবার তোমরা নিজেদের কথা বলো।'

সাইলিনুশ হামুনকে নুশির বৃত্তান্ত শোনাল। তারপর তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, বলুন, ও সফল হবে কি হবে না আর যদি সফলতা দেখা না যায়, তাহলে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি করা যায় কিনা যে, সে সফলতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

* * *

এতক্ষণ পর্যন্ত এত লম্বা কালো নাগটা হামুনের ঘাড়ের পার্শ্বে লেপ্টে ছিল এবং তার মুখটা আরেক কাঁধের উপর ছিল। নাগ হামুনের ইশারায় মুখ তুলে ফণাটা ছড়িয়ে দিল, যা এতখানি চওড়া ছিল যতখানি চওড়া হামুনের চেহারা। এবার হামুনকে আরও ভয়ঙ্কর দেখা যেতে লাগল। নাগের বাকি অংশ হামুনের কোলে জড়ো হয়ে ছিল এবং কুণ্ডলি মারার মতো করে নড়াচড়া করছিল।

হামুন হাতটা লম্বা করে একটা লাঠি তুলে নিল, যেটা অন্ততপক্ষে দুফুট লম্বা আর আড়াই ইঞ্চি পুরু। তার গায়ে নানা রঙের কাপড় জড়ানো। একটার গায়ে নানা প্রজাতির পাখির রং-বেরঙের পালক বাঁধা। হামুন উপরের দিকে তাকাতে শুরু করলেন। খানিক পরই তার শরীরটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। সে লাঠিটা উপরে তুলে ধরল আর লাঠিটাও কাঁপতে শুরু করল। এই কম্পন বাড়তে থাকল আর হামুন ধীরে-ধীরে উঠতে লাগল।

হামুন যখন দাঁড়িয়ে গেল, তখন তার শরীরটা এত বেশি কাঁপতে লাগল, যেন লোকটা পড়ে যাবে এবং সম্ভবত মরে যাবে। তার মাথাটা কেবলই পিছনের দিকে যেতে থাকল আর তেমনিভাবেই তার পুরোটা মুখ আকাশমুখী হয়ে গেল। নাগ তার ঘাড়ের সঙ্গে লেপ্টেই থাকল।

হামুন অপর হাতে নাগটা ঘাড় থেকে সরাতে শুরু করল এবং তার শরীরটা আগের চেয়ে বেশি কাঁপতে লাগল। হামুন এমন কম্পমান হাত দ্বারা না জানি কীভাবে নাগটা ধরে ফেলল এবং তার পেছনকার একটা কালো কাপড়ে রেখে দিল। নাগটা কিছু সময় এদিক-ওদিক হেঁটে মাথা তুলল এবং ফণাটা ছড়িয়ে দিল।

'সরিয়ে দাও পরদা'– হামুন মুখটা আর বেশি উপরে তুলে অত্যন্ত উঁচু স্বরে বলল– 'দেখিয়ে দাও যা কিছু আছে। সরিয়ে দাও পরদা।'

তার শরীরটা আরও বেশি কাঁপতে শুরু করল। সেই সঙ্গে নিজের মাথাটা সে একবার ডানে, একবার বাঁয়ে, কখনও সামনে, কখনও পিছনে ছুড়তে লাগল। সে আর কী যেন বলল, যা কেউই বুঝল না; এমনকি কেউ ধরতে পারল না, এটা কোন ভাষা। এবার প্রতীয়মান হতে লাগল, এ যেন অন্য কোনো অদৃশ্য শক্তি, যে হামুনের দেহটাকে কব্জা করে নিয়েছে এবং এই শক্তি তার দেহটাকে ভেঙে-চুরে নিক্ষেপ করবে। দর্শকদের উপর ভীতি সঞ্চারিত হতে থাকল।

বেশ কিছু সময় পর হামুনের শরীরটা শান্ত হতে শুরু করল। একসময় পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেল।

হামুনের মুখাবয়ব এবং আরও কিছু আচরণের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। তার চোখে এমন কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল, যার ফলে মনে হচ্ছিল, সে দূরের কোনো বস্তু দেখার চেষ্টা করছে। কখনও সে লাঠিটা জোরে-জোরে নাড়াচ্ছে এবং তাকে বাতাসে এমনভাবে ছুড়ে মারছে, যেভাবে কোনো মানুষ বা পশুকে বেত্রাঘাত করা হয়। সে খুব দ্রুত পিছনের দিকে মোড় ঘোরাল। তার নাগ কালো কাপড়টার উপর এদিক-ওদিক হাঁটাহাঁটি করছিল।

হামুন লাঠিটা মাথার উপরে তুলল এবং এমনভাবে উপর থেকে নিচে মারল, যেন সে নাগটাকে প্রহার করতে চাচ্ছে। এবার হামুনের পিঠ লোকগুলোর দিকে। সে লাঠি দ্বারা সাপটাকে খোঁচা মারলে সাপ ফণা ছড়িয়ে দিল।

'বল তুই কী দেখেছিস?'– হামুন নাগটাকে জিজ্ঞেস করল– 'তাড়াতাড়ি বল। ঠিকঠিক বল।'

'সবই অন্ধকার।' এটা হামুনের কণ্ঠ ছিল না; বরং ছোট একটা বাচ্চার ছিল বা কোনো বৃদ্ধা নারীর।

সাইলিনুশ, নুশি, নুশির হবু স্বামী ও তাদের ভৃত্য বিস্মিত চোখে একজন অপরজনের দিকে তাকাল।

'আবার দেখ'– হামুন নাগকে বলল– 'আমি পরদা তুলে দিয়েছি। তুই যি দেখতে পাচ্ছিল, আমি তা দেখতে পাই না। তুই আবার দেখ।'

হামুন বারবার লাঠির যে-মাথায় রং-বেরঙের পালক বাঁধা ছিল, সেই মাথাটা নাগের ফণার কাছে নিয়ে জোরে-জোরে নাড়াতে লাগল এবং ততখানি জোরদারভাবে নাগ তার ফণাটা একবার ডানে, একবার বাঁয়ে নাড়াতে লাগল। কখনওবা পিছনে নিয়ে লাঠিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

'অন্ধকারে ধোঁয়াশার মতো একটা কিরণ দেখা যাচ্ছে'– আবারও উক্ত শিশু বা বৃদ্ধার কণ্ঠ শোনা গেল, যেটি আগে একবার শোনা গিয়েছিল।

হামুন আবারও বারদু-তিনেক নাগকে অনুরূপ প্রশ্ন করল এবং আগের মতো একই কণ্ঠে উত্তর পেল। এবার সে উঠে দাঁড়াল এবং লাঠিটা অত্যন্ত জোরে-জোরে শূন্যে মারতে লাগল। হামুন লাফাচ্ছিলও। তার এসব আচরণ পাগলের মতো ছিল।

হামুন দু-পায়ের পাতার উপর বসে পড়ল। এবার তার মুখ লোকগুলোর দিকে। সে মাথাটা নত করে ফেলল এবং বেশ কিছু সময় ওভাবেই থাকল। তারপর মাথা জাগাল এবং নুশির মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এবং অপলক চোখে তাকে দেখতে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নুশির মাথা থেকে একটা চুল তুলে নিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। তারপর কাছেই পড়ে-থাকা একটা মানবখুলি তুলে নিজের সামনে রাখল এবং মুখে বিড়বিড় করে কী যেন পড়ে নুশির চুলটার উপর ফুঁ মারল। তারপর চুলটা খুলির উপর রেখে দিল।

'তোমাকে দু-তিনটা দিন এখানে থাকতে হবে'– হামুন নুশিকে উদ্দেশ করে বলল– 'এক-দুদিন বেশিও থাকা লাগতে পারে। পুরোপুরি উত্তর পাচ্ছি না। তবে পেয়ে যাব। সফলতা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। আমি কিছু-না-কিছু করব। তোমাদের থাকার ব্যবস্থা আছে। অতিথিদের জন্য আমি তাঁবু খাটিয়ে রেখেছি। তোমরা পুরোপুরি আরাম পাবে। খাওয়ারও ভালো আয়োজন আছে। তবে রাজমহলে সুখ এখানে পাবে না। মাটিতে ঘুমাতে হবে। এবার যাও; বাইরে দুজন লোক আছে। তাদের বলো, তারা তোমাদের অতিথিদের তাঁবুতে নিয়ে যাবে।

হামুনের তাঁবুতে বড় একটা দিয়া জ্বলছিল, যার হলুদ ও কম্পমান আলোতে লোকটাকে আগের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর ও রহস্যময় দেখাচ্ছিল। তারা চারজন উঠে দাঁড়াল এবং তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে যে-দুজন লোক বসা ছিল, তারা এদের একদিকে নিয়ে গেল। মোটামুটি একশো পা দূরে একটা সবুজ টেকর ছিল, যার সন্নিকটে তিন-চারটা তাঁবু খাটানো ছিল। লোকগুলো জানাল, এগুলো মেহমানদের তাঁবু; আপনারা এগুলোকে নিজেদের ঠিকানা বানিয়ে নিন। বলেই তারা চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, আপনারা বসুন; আমরা আপনাদের জন্য খাবার নিয়ে আসছি।

* * *

পরদিন হামুন এই চারজনকে তার তাঁবুতে ডেকে পাঠাল এবং আবারও সেই আচরণগুলো করল, যেমনটা গতরাত করেছিল। সেরাতে তো সে একদমই পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং দর্শকদের মনে হয়েছিল, লোকটার বুঝি হুশ-জ্ঞান আর ফিরবেই না। এ অবস্থায় সে তার নাগকে নানা প্রশ্ন করল এবং একটা শিশু বা বৃদ্ধার কণ্ঠে সেসবের উত্তর পেল। একবার সে ক্ষুব্ধ হয়ে নাগের ঘাড়টা ধরে ফেলল এবং তার মুখটা নিজের মুখে পুরে জোরে-জোরে নাড়া দিয়েছিল। পরে নাগটা মুখ থেকে বের করে দিয়েছিল।

দু-আড়াই ঘণ্টা পর সে চারজনকে বলল, এবার তোমরা চলে যাও; সূর্যাস্তের পরে আবার এসো।

সন্ধ্যার তারা আবার হামুনের তাঁবুতে গেল। আজ তাঁবুতে দুটার বদলে চারটা প্রদীপ জ্বলছে। হামুন তাদের সেখানে বসাল, যেখানে আগেরবার বসিয়েছিল। সে নিজের তাদের সম্মুখে এলোপাতাড়ি বসে পড়ল। সেই লাঠিটা তার সন্নিকটে পড়ে আছে, যার গায়ে রং-বেরঙের কাপড় জড়ানো ছিল আর এক মাথায় পাখির রং-বেরঙের পালক বাঁধা ছিল। সে লাঠিটা তুলে হাতে নিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে সব কটা বাতি নিভে গেল।

হামুন অজ্ঞাত এক ভাষায় অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে কী যেন বলল এবং লঠি দ্বারা মাটিতে আঘাত করল। প্রথমে একটা বাতি জ্বলে উঠল। হামুন সেই একই ভাষায় আবারও কিছু বলল। এবার আরেকটা বাতি জ্বলে উঠল। এভাবে এক-এক করে বাকি দুটা প্রদীপও জ্বলে উঠল। তারপর হামুন আগের মতো আচরণ শুরু করল। কিন্তু এবারকার ধরন কিছুটা ব্যতিক্রম।

বলল, নুশি বসে থাকো আর বাকি তিনজন বাইরে বেরিয়ে যাও। তারা তিনজন বেরিয়ে গেল এবং তাঁবুর পরদা পড়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরই হামুন তিনজনকে ডাক দিল এবং ভিতরে যেতে বলল। তারা তিনজন ভিতরে ঢুকে গেল।

'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এই মেয়েটার'- হামুন বলল- 'আমি ইশারা পেয়ে গেছি। ওস্তাদের আত্মাও আমাকে বলেছে, এমন নয় যে, এই মেয়েটা যা কামনা করছে, তাতে সে তৎক্ষণাৎ সফল হয়ে যাবে। এই কাজটা আমি নিজের জিম্মায় নিয়ে নিয়েছি। এই জিম্মাদারি আমি আদায় করব। কিন্তু এই মেয়েটাকে আমার আমলে শামিল করে নিতে হবে। সেই কাজটা আমি তোমাদের উপস্থিতিতেও করতে পারি। কিন্তু করব না। কারণ, যদি তোমরা এসে সেই অবস্থায় দেখ, তাহলে বলবে, এ তো পাগল হয়ে গেছে। তারপর হতে পারে, এই হবু স্বামী তাকে টেনে বের করে

নিয়ে যাবে। কেউ যদি আমাদের এই কাজে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না বটে; কিন্তু নাগ আমাকে ও একে দংশন করবে। তারপর আমাদের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দুই পলকের বেশি সময় লাগবে না।'

'তোমার উপর আমাদের আস্থা আছে'– সাইলিনুশ বলল– 'আমাদের কেউই তোমার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু কাজটা হয়ে যাওয়া দরকার। এই মেয়েটা এবং এর এই হবু স্বামী রাজপরিবারের সদস্য। তুমি পুরস্কার যা চাইবে, এরা তোমাকে দেবে।'

'আমার কোনো পুরস্কারের দরকার নেই'– হামুন বলল– 'এই তাঁবুর অভ্যন্তরে তোমরা যে-জগত দেখতে পাচ্ছ, যদি একে আবাদ থাকতে দাও, তাহলে এ-ই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। আমার জন্য এ-ই যথেষ্ট।'

সেরাতে নুশির সঙ্গীরা অনুভব করল, মেয়েটার মুখে আজ কোনো কথা নেই। অথচ সে অনেক কথা বলত। আজ তার উপর নীরবত ছেয়ে আছে এবং গভীর ভাবনায় হারিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তাকে জিজ্ঞেস করবার কেউ প্রয়োজন বোধ করল না। সবাই জানে মেয়েটা জাতীয় চেতনার ব্যাপারে কতখানি অনুভূতিপ্রবণ এবং রোমসাম্রাজ্যের মর্যাদাকে সে নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও সম্ভ্রম জ্ঞান করে। আর যেহেতু তার সামনে কোনো পথ খোলা নেই, তাই অস্থিরতার মধ্যে সময় পার করা তার পক্ষে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

* * *

আরও একটা দিন কেটে গেল। তারপর আরেকটা রাত এল। রাতের অর্ধেক কেটে গেল। চাঁদ পৃথিবীতে ফকফকা জোছনা বিছিয়ে রেখেছে। হঠাৎ সাইলিনুশ চোখ খুলল এবং শয্যা ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। কারণ, সে কিছুটা ভয়-ভয় অনুভব করছিল। মনে-মনে ভাবল, বাইরে কিছুক্ষণ বসে তারপর এসে শুয়ে পড়ব। কিন্তু বেরুবার পর মনে হলো, খানিক দূরে একটা গাছের গোড়ায় কে যেন বসে আছে। তার স্বভাবে অনুসন্ধানের মানসিকতা বিরাজ করছিল। একই স্বভাবের কারণেই সেদিন নুশিদের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল এবং তাদের মনের সব গোপন ভেদ বের করে নিয়েছিল। আজও এই গভীর রাতে তার একই মানসিকতার প্রকাশ ঘটল। সাইলিনুশ ধীরপায়ে গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। চোখে তার ঘুম-ঘুম ভাব। এইমাত্র সে গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে। এখনও তার আড়মোড়া কাটেনি।

কাছে গিয়ে দেখল, মানুষটা নুশি; একলাটি নিজেকে গভীর ভাবনায় হারিয়ে বসে আছে। হঠাৎ সাইলিনুশকে কাছে দেখে নুশির চমকে ওঠার কথা ছিল। কিন্তু সে চকিত হলো না। উলটো প্রশান্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাল যে, সাইলিনুশ আমার কাছে

এসে পড়েছে। নুশি সাইলিনুশকে টেনে নিজের পাশে বসিয়ে নিল। সাইলিনুশ জিজ্ঞাসা করল, এত রাতে এখানে বসে কেন?

'আমি জানি না, তুমি কেমন মানুষ'– নুশি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল– 'আমি নিশ্চিত হতে পারছি না, তোমাকে বিশ্বাস করব কি করব না।'

'আমার কপালে তো কিছুই লেখা নেই'– সাইলিনুশ বলল– 'এতটুকু তো ভাবতে পার, যাচ্ছিলাম অন্য কোথাও। পথে তোমাকে পেয়ে গেলাম। কথা বললাম। তোমার কথা শুনলাম। তারপর তোমার সঙ্গে এখানে এসে পড়লাম। এখন পরিবারের লোকেরা আমাকে খুঁজে ফিরছে, আমি কোথাও হারিয়ে গেলাম নাকি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মরেই গেলাম। তোমার প্রতি আমার কোনো মোহ নেই, কোনো লোভ নেই। এতটুকুই কি যথেষ্ট নয়, আমার প্রতি তুমি আস্থা স্থাপন করবে? এতটুকুই কি যথেষ্ট নয়, তোমার হবু স্বামী তোমার আস্থাভাজন লোক?'

'না'– নুশি সোজা-সাপটা উত্তর দিল– 'তার থেকে আমার আস্থা উঠে গেছে। এখন আমি একা। এখন আমি নিঃসঙ্গ। আমার কাছে ঘোড়া আছে। মনে ভাবনা জাগে, এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

'কেন?'– সাইলিনুশ বলল– 'কোন বিষয়টা তোমাকে তোমার হবু স্বামী থেকে এভাবে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে?'

'আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও'– নুশি বলল– 'আমার কোনো কথা তুমি আমার হবু স্বামীকে বলবে না। আমার ভৃত্যের এ ব্যাপারে কিছু জানবার প্রয়োজন নেই।'

সাইলিনুশ তাকে নিশ্চয়তা দিল, তোমার সব কথা আমি আমার মনের সমাধিতে দাফন করে ফেলব। তুমি নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় মনের সব কথা আমাকে বলতে পার।

'এই হামুন জাদুকরটা থেকে আমাকে বাঁচাও'– নুশি বলল– 'লোকটা একাকি আমাকে কাছে বসিয়ে তোমাদের বের করে দিয়েছিল। তখন সে নিজের উপর অন্য একটা অবস্থা তৈরি করে নিয়েছিল। কখনও আমার মুখটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আমার চোখে তাকাতে লাগল আবার কখনও নিজের মুখটা আমার মুখের এত কাছে নিয়ে এল যে, তার কপাল আমার কপালের সাথে লেগে গেল। সেসময় তার মুখ থেকে যে-দুর্গন্ধ আমার নাকে ঢুকেছিল, জানি না, কেন আমি তখন সংজ্ঞা হারাইনি। তার শ্বাস এত গরম যে, আমি মুখে জ্বলন অনুভব করতে শুরু করেছিলাম। ভালোই হলো যে, মুখটা সে তাড়াতাড়ি পেছনে সরিয়ে নিয়েছিল। তারপর সে এমন কিছু বিস্ময়কর ও অভিনব আচরণ করল, যার কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না।

তারপর সে আমার দিকে পিঠ দিয়ে তার নাগটার পাশে গিয়ে বসল এবং নাগকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল, নাগ তাকে উত্তর

দিচ্ছিল। আওয়াজটা তেমনই ছিল যেমনটা তোমরা শুনেছিলে। অবশেষে নাগ সেই সূক্ষ্ম ও কম্পমান আওয়াজে বলল, এই মেয়েটা যদি একটুখানি ত্যাগ স্বীকার করে, তাহলে এ রানি হতে পারবে এবং এর সমস্ত কামনা-বাসনা পূরণ হয়ে যাবে।

নাগের সাথে আরও কিছু কথা বলে সে আমার দিকে ফিরে বসল এবং আমাকে কাছে ডাকল। আমি তার একেবারে কাছে গিয়ে বসলাম। সে নিজের মতো করে আরও কিছু কথা বলল। অবশেষে বলে বসল, আমি যদি তার সাথে একটা রাত একদম উলঙ্গ হয়ে কাটাই, তাহলে আমার প্রত্যয় পূর্ণতায় পৌঁছে যাবে। আমি পুরোপুরি সফল হয়ে যাব। সে বলল, তোমার এই সৌন্দর্য আর রূপবান শরীরের প্রতি আমার এক বিন্দু অনুরাগ নেই। কিন্তু আমি যে-অদৃশ্য শক্তির কব্জায় আছি, তার আদেশ হলো, তোমাদের দুজনের দেহদুটো যদি একাকার হয়ে যায় আর দুজনের আত্মাদুটো যদি উপরে উঠে যায়, তাহলে প্রতিটা মুশকিলই আসান হয়ে যাবে এবং প্রতিটি মনোবাঞ্ছা-ই পূরণ হবে।'

'আমি বুঝে ফেলেছি'– সাইলিনুশ বলল– 'এই লোকটা যা চাচ্ছে আমার আর বুঝতে বাকি নেই। বলো, তোমার চিন্তা কী, তুমি কী করতে চাও?'

'আমি আগে কী বলেছি তোমার নিশ্চয় মনে আছে'– নুশি বলল– 'আগে যা বলেছি, আমি এখনও তা-ই বলব যে, রোমসাম্রাজ্যের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করে দেব। কিন্তু সাইলিনুশ! আমার সম্ভ্রম আমি বিসর্জন দিতে পারব না। আমার সম্ভ্রমকে আমি আমার হবু স্বামীর আমানত মনে করি। কেউ চাইলেই আমার সম্ভ্রম আমি তাকে দিয়ে দেব এর অনুমতি আমার ধর্ম আমাকে দেয় না হোন তিনি আমার রাজা-মহারাজা। তাছাড়া পাপই যদি করতে হয়, এই নোংরা, অপয়া ও অপদার্থ লোকদার সঙ্গে করব কেন?'

'বিষয়টা কি তুমি তোমার হবু স্বামীকে বলনি?' সাইলিনুশ জিজ্ঞাসা করল।

'বলিছি'– নুশি উত্তর দিল– 'কিন্তু লোকটা আত্মমর্যাদাহীন ও লোভী প্রমাণিত হলো। বলল, এতে কোনো পাপ নেই। কোনো দোষ নেই। তার সঙ্গে তুমি একটা রাত কাটাও। তারপর তুমি হবে রানি আর আমি রাজা। হামুন আমাকে বলেছে, হেরাকল আমাকে মিশরের একটা অংশ দান করবেন, যেখানে আমার রাজত্ব চলবে। একথাটা আমার হবু স্বামীকে বললে সে আমার পেছনে পড়ে গেল যে, আমি হামুনের এই আব্দারটা পূরণ করি। আজ সন্ধ্যায় যখন আমি হামুনের ওখান থেকে ফিরে এলাম, তখন তার সঙ্গে আমার এক চোট লড়াই হয়ে গেছে। প্রেমনিবেদনের জন্য আমরা আমাদের তাঁবুটা আলাদা রাখলাম। কিন্তু সে একদম ভিন্ন রকম প্রমাণিত হলো। তুমি বলো সাইলিনুশ! আমি পালিয়ে যাব, নাকি নিজেই নিজের জীবনটা শেষ করে দেব।'

'জীবন শেষ করবে কেন?'– সাইলিনুশ বলল– 'এ ছাড়া জগতে আর কি কোনো পুরুষ নেই, যে তোমার স্বামী হতে পারে? এবার আমি তোমাকে একটা বিষয় বলব, যা আমি তিন-চার দিন আগ থেকেই অনুভব করছি। একসময় আমি হামুনের অলৌকিক জ্ঞানের কথা বিশ্বাস করতাম। এখন করি না। আমি দেখেছি, লোকটার চোখ কেবলই তোমার উপর নিবদ্ধ থাকত। তুমি মেয়েটাও এতই বেশি সুন্দরী ও চিত্তহারী যে, পাদরি-পুরোহিতও তোমাকে দেখলে নিজের ধর্মের কথা ভুলে যাবে। এই হামুন লোকটাকে আমি একজন ভেলকিবাজের চেয়ে বেশি কিছু মনে করি না। এই যে বাতিগুলো আপনা-আপনি জ্বলে উঠল, নিজে-নিজে নিভে গেল এটা একটা ভেলকি। এখন তো তুমি তার সবটুকু মুখোশ তুলেই দেখালে। তুমি বলেছ, আমি যেন তোমাকে হামুন থেকে রক্ষা করি। তোমাকে আমি রক্ষা করব।'

'কী করবে?' নুশি জানতে চাইল।

'এটা জিজ্ঞেস করো না'– সাইলিনুশ বলল– 'শুধু এটুকু বলে দিচ্ছি, তুমি নিজের জীবন হরণ করো না– হামুনের জীবন হরণ করো। কীভাবে করবে তা আমি তোমাকে বলে দেব। তুমি শুধু আমার কথা অনুযায়ী কাজ করবে।'

'এখনই বলে দাও আমাকে কী করতে হবে'– নুশি অস্থির হয়ে উঠল– 'তুমি সম্ভবত বুঝতে পারছ না, আমি কীরূপ বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়েছি। আমার হবু স্বামীর মানসিক অবস্থা তো আমি তোমাকে এখনও বলিনি। ও তো জীবন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় মেতে উঠেছিল। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলছে, তুমি হামুনের মনোবাঞ্ছা পূরণ করো।'

'তোমাকে যা করতে হবে'– সাইলিনুশ বলল– 'তাহলো, আজ রাত তুমি হামুনের কাছে চয়ে যাবে। বুঝতে দেবে না, তার প্রস্তাবে তুমি নারাজ।'

'আমাকে সমস্যায় ফেলো না সাইলিনুশ!'– নুশি বলল– 'যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে আমাকে নগ্না হয়ে যেতে বলবে। গেলে কী করবে, তা সে আগেই বলে দিয়েছে।'

'সে বললেও তুমি উলঙ্গ হবে না'– সাইলিনুশ বলল– 'হতে পারে সে জোর করে তোমাকে নগ্ন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না। তোমার শরীর বিবস্ত্র হবে না।'

নুশি অত্যন্ত সাহসী ও জোশ-জযবাওয়ালী মেয়ে ছিল যে, শুধু ভৃত্যকে সঙ্গে করে ফরমা থেকে রওনা হয়েছিল এবং পাহাড়-উপত্যকা অতিক্রম করে অজানা-অচেনা এই বেদুইন এলাকায় এসে উপনীত হয়েছে। কিন্তু এখন তার অবস্থা হলো, ভীতি তাকে চেপে ধরেছে এবং কারও সাহায্যের প্রত্যাশী হয়ে উঠেছে। সাইলিনুশকে সমব্যথী ও সহযোগী বানিয়ে নিয়েছিল বটে; কিন্তু তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না, তার ব্যাপারে লোকটা কতখানি বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন। কিন্তু

সাগরে ডুবে যাওয়া ব্যক্তির জন্য একটা খড়ও অনেক বড় অবলম্বন। নুশি ঝুঁকি বরণ করে নিল যে, এমন একজন লোকের কাছে নিজেকে সঁপে দিল যে, যাকে সে আগে থেকে চিনে না। লোকটা বেদুইন এবং হামুনের জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিল। লোকটা তাকে ধোঁকাও দিতে পারে এবং ব্যাপারে সে হিংস্রও হয়ে উঠতে পারে। সব মিলে নুশি সমস্যার একটা আবর্তে পড়ে গেল। চারদিকেই ঝুঁকি! চারদিকেই বিপদ!

নুশি ওখান থেকে উঠে দাঁড়াল এবং নিজের তাঁবুর দিকে হাঁটা দিল। নুশি ও তার হবু স্বামীর তাঁবু সাইলিনুশের তাঁবুর সন্নিকটে। কিন্তু নুশি খানিক ঘুরে তাঁবুর দিকে যাচ্ছিল। সাইলিনুশ সোজা তার তাঁবুতে চলে গেল।

নুশি সবে আধা পথ অতিক্রম করেছে; এমন সময় তার হবু স্বামী তার সামনে পড়ে গেল। হঠাৎ সজাগ হয়ে লোকটার চোখ খুলে গেলে দেখল, নুশি শয্যায় অনুপস্থিত। সে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। রাত জোছনা ছিল। তাই সে নুশিকে সাইলিনুশের সঙ্গে বসা দেখে ফেলল।

'এই গভীর রাতে ওই বেদুইনটার কাছে কেন গেলে?' হবু স্বামী নুশিকে শাসনের সুরে জিজ্ঞাসা করল।

নুশি ঘটনাটা ঠিক-ঠিকই বলে দিল এবং সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল, আমি আমার সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে পারব না।

'তার সঙ্গে এই আলাপটা তুমি দিনের বেলায়ও করতে পারতে'– নুশির হবু স্বামী বলল– 'তুমি এই বেদুইনদের রানি হতে চাচ্ছ আর তার জন্য এই বেদুইন সাইলিনুশকে একজন উপযুক্ত লোক পেয়েছ তাই না?'

নুশি আগে থেকেই অস্থিরতা ও সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে ছিল। এবার হবু স্বামীর এহেন উক্তি শুনে, তার শাসকসুলভ আচরণ দেখে জ্বলে উঠল এবং তার হৃদয় থেকে এই হবু স্বামীটার প্রেম-ভালবাসা উবে যেতে শুরু করল।

'আমি যেখানেই যাব, সেখানেই রাজকন্যা ও রানিই হব'– নুশি বলল– 'সম্রাট হেরাকল-এর বংশ আমার পরিচয়। এই বংশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক অনেক দূরের। আমি চাইলে তোমাকে তাড়িয়েও দিতে পারি। কিন্তু তা আমি চাই না। আমি চাচ্ছি, তুমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে ফেলো এবং আমার উপর এমন হীন অপবাদ আরোপ করা থেকে বিরত থাকো।'

দুজনেরই মনের অবস্থা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে, এই চিন্তাটা কারুই মাথায় এল না, আমরা পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝি দূর করে আপস করে নিই। নুশির ভাষা ও বক্তব্য শুনে এবং তার কথা বলার ধরন দেখে হবু স্বামী আগুনের মতো গরম হয়ে গেল। মুখ থেকে তার এমন হুমকি বেরিয়ে গেল যে, সাইলিনুশকে আমি হত্যা করে ফেলব। বলল, এই বেদুইনরা আমার প্রজা।

নুশি বরাবরই একরোখা ও বিদ্রোহী মনোভাবের রাজকন্যা। সে তার হবু স্বামীর হুমকিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরে নিল এবং বলল, তুমি সাইলিনুশকে হত্যা করতে পারবে না। তবে হতে পারে, তুমি নিজে তার হাতে খুন হয়ে যাবে।

নুশির তার হবু স্বামীকে আর কথা বলবারই সুযোগ দিল না এবং সেখান থেকে দ্রুতপায়ে কেটে পড়ল। তাঁবুর কাছে গিয়ে দেখল, সাইলিনুশ তাঁবু সম্মুখে দণ্ডায়মান। সাইলিনুশ তাকে জিজ্ঞেস করল, ফিরতে এত দেরি হলো কেন? নুশি বিলম্বের কারণ বর্ণনা করল এবং হবু স্বামীর সঙ্গে তার কথোপাকথন ও বাগ্বিতণ্ডা হয়েছে, তাও শোনাল।

'তুমি অনেক ভারী দুটা পাথরের তলে এসে পড়েছ নুশি!'– সাইলিনুশ বলল– 'তবে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করো না। কাল রাত হামুনের তাঁবুতে চলে যাবে। বাকি কাজ আমার।'

নুশি এখনও সাইলিনুশের সঙ্গে কথা বলছিল। এরই মধ্যে তার হবু স্বামী এসে পড়ল এবং নুশিকে আদেশ দিল, নিজের তাঁবুতে চলে আসো। সে বোধহয় ভুলে গিয়েছিল নুশি কতখানি একরোখা ও একগুঁয়ে মেয়ে।

'আমি তোমার আদেশ মানতে বাধ্য নই'– নুশি বলল– 'নিজের ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো বিবেক ও সাহস আমার আছে। ওই তাঁবুতে আমি যাব না। বাকি রাতটুকু আমি সাইলিনুশের তাঁবুতে কাটাব।'

'না নুশি!'– সাইলিনুশ বলল– 'এটা আমি মেনে নেব না।'

তারপর সাইলিনুশ নুশির হবু স্বামীকে বলল, ভুল বোঝো না শাহজাদা! ভেবে দেখা দরকার, তুমি কোথায় আছ এবং এখানে কেন এসেছ। নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যর কথা মনে রাখো। এটা ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করারও সময় নয়, আবেগতাড়িত হয়ে কথা বলারও সময় নয়।'

'তুই চুপ কর বদ্দু!'– নুশির হবু স্বামী রাজকীয় প্রভাব ঝেড়ে বলল– 'একে তোর কাছে রাখ; তারপর দেখ কী হয়।'

'এসে পড়ো নুশি!'– সাইলিনুশ নুশির একটা বাহু ধরে একধারে সরিয়ে নিয়ে বলল– 'এই ছেলেটার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি হুশ-জ্ঞান ঠিক রাখো। আমার তাঁবুতে এসে পড়ো। অন্যথায় দুজনে বাকি রাত যুদ্ধ করে কাটাবে।'

নুশি সাইলিনুশের সাথে তার তাঁবুতে চলে গেল। নুশির হবু স্বামী জ্বলতে-পুড়তে নিজের তাঁবুতে গিয়ে ধপাস করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। সাইলিনুশকে সে নিজের শত্রু ভাবতে শুরু করল।

'এখন আর একে আমি আমার হবু স্বামী বলব না'– তাঁবুতে বলে নুশি সাইলিনুশকে বলছিল– 'আমি রোমসাম্রাজ্যকে বহাল করার প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নেমেছি।

মুসলমানদের পরাজিত করে তাদের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলা আমার জীবনের ব্রত। কিন্তু এই যে-লোকটাকে আমি আমার হবু স্বামী মনে করে বসেছি, এ শুধু আমার রূপ, যৌবন আর এই শরীরটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। কোনোদিনও ভাবিনি, আমি কতখানি রূপসী, কতখানি চিত্তাকর্ষী। নিজের এই শরীরটার সঙ্গে আমার কোনোই হৃদ্যতা নেই।'

পরবর্তী দিনটা কিছু সময়ের হামুনের তাঁবুতে কাটল এবং তার সেই পাগলামি, সেই লাফালাফি, সেই কম্পন, সেই নাগের সাথে কথা বলা দেখল। সাইলিনুশ নুশি ও তার হবু স্বামীর মাঝে সমঝোতা করে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু হবু স্বামীর জিদ কোনোমতেই পানি হলো না। বরং তার ক্ষোভ আগের চেয়ে আরও বেশি বেড়ে গেল। অবশেষে নুশি ঘোষণা দিল, আজ রাত আমি হামুনের তাঁবুতে যাব। এবার নুশির হবু স্বামীর রাগ কিছুটা দুর্বল হলো।

* * *

রাত গভীর হলে এবার নুশি হামুনের তাঁবুর দিকে হাঁটা দিল। হামুন আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, শুধু নুশি তার কাছে যাবে; অবশিষ্ট সবাই তাঁবুতেই অবস্থান করবে।

হামুন নুশিকে তার সম্মুখে বসিয়ে নিল। এমনভাবে বসাল যে, দুজনের হাঁটু পরস্পর লেগে গেল। হামুন নুশির মুখটা দু-হাতের মধ্যে নিয়ে নিজের মুখের একেবারে কাছাকাছি নিয়ে গেল। নুশি না এর থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করল না বটে; কিন্তু তার সমস্ত শরীরে ঘৃণার একটা ঢেউ খেলে গেল।

নুশি পরিষ্কার বুঝে ফেলল, হামুন চরমভাবে নেশাগ্রস্ত। লোকটা দাঁড়িয়ে লাঠিটা হাতে তুলে নিল এবং নর্তন-কুর্দন শুরু করে দিল। তারপর নুশিকে দাঁড়িয়ে যেতে বলল। নুশি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল।

'সবগুলো কাপড় খুলে ফেলো'– হামুন নুশিকে আদেশ দিল– 'এমনভাবে বিবসনা হয়ে যাও যে-রকম তুমি জন্ম লাভ করেছিলে। এই শরীরটা কিছুই নয়। আমাকে তোমার আত্মাটা দরকার। তোমার আত্মাটা আমাকে দিয়ে দাও। খুলে ফেলো এসব পোশাক।'

'না'– নুশি বেঁকে বসল– 'তোমার যদি শুধু আত্মারই প্রয়োজন হয়, তাহলে তা এই শরীরটাকে নগ্ন না করেও তা পেতে পার। আমি কাপড় খুলব না।'

নুশির উপর নিজের তেলেসমাতি প্রয়োগের জন্য হামুন কিছু ভংচং আচরণ করল এবং কিছু ভেলকিও পরীক্ষা করল। কিন্তু নুশি অনড়ই রইল– কাপড় খুলতে রাজি হলো না।

হামুন প্রথমবারের মতো লাঠিটা হাতে নিয়ে নাচতে-লাফাতে ও বিস্ময়কর ধরনের আচরণ করতে শুরু করল। নুশি দাঁড়িয়ে তামাশাটা দেখতে থাকল। নাচতে-নাচতে হামুন নুশির কাছে চলে গেল। তার বাহুতে জামার হাতায় হাত রাখল এবং এত জোরে টান মারল যে, হাতাটা একদম ছিঁড়ে গেল। নুশি মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলো এবং নিজেকে বাঁচাতে এদিক-ওদিক পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু হামুন পুরুষ বলে কথা। সে নুশির গায়ের পোশাকটা এমনভাবে ছিঁড়ে শুরু করল, যেমন কোনো হিংস্র প্রাণী তার শিকারকে ছিঁড়ে-ফেড়ে খায়।

নুশির গায়ের অর্ধেক পোশাকই হামুন ছিঁড়ে ফেলেছে। মেয়েটা এখন অর্ধনগ্না। হামুন আরও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে। এখন লোকটা আস্ত একটা হায়েনা আর সম্মুখে নুশি মেয়েটা তার বৈধ শিকার, যাকে সে খাবলে খাবে। ঠিক এমনি সময়ে তার পাদুটো মাটি উপরে উঠে গেল এবং পরক্ষণেই চিত হয়ে শয্যায় পড়ে গেল। সে দেখল, তার মাথার কাছে সাইলিনুশ দাঁড়ানো। সাইলিনুশ অতিদ্রুত তাঁবুতে প্রবেশ করে হামুনকে ঝাঁপটে ধরল, উপরে তুলল এবং পূর্ণ শক্তিতে মাটিতে ছুড়ে মারল।

সাইলিনুশ হামুনকে এত জোরে আছাড় মারল যে, তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হলো না। সাইলিনুশ হামুনের পেটের উপর পা রেখে সজোরে চাপ দিল এবং বিদ্যুদ্গতিতে খাপ থেকে তরবারিটা বের করে তার আগাটা হামুনের ধমনিতে রেখে সামান্য চাপ বসিয়ে দিল। হামুন প্রথম-প্রথম সাইলিনুশকে ভয় দেখাল, আমি আমার জিন-ভূতদের ডেকে তোমাকে টুকরা-টুকরা করে ফেলব। কিন্তু এসব কথা সাইলিনুশের উপর কোনোই ক্রিয়া করল না।

'ঠিক আছে; ওরা এসেই তোমাকে আমার থেকে উদ্ধার করুক।' বলেই সাইলিনুশ হামুনের পেটের উপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিল এবং তরবারির আগাটা তার ধমনিতে ঢুকিয়ে দিল। হামুন ছটফট করতে লাগল।

'এবার দেখ কে কাকে হত্যা করে'– সাইলিনুশ বলল– 'তোর বেঁচে থাকার একটা-ই পন্থা আছে। তোর আসল রূপটা উন্মোচন করে দে। নিজের মুখে বলে দে এগুলো সব ভেলকিবাজি ও প্রতারণা।'

হামুন সাইলিনুশকে ভয় দেখাতে আবারও আবারও হুমকির সুরে কিছু কথা বলল। কিন্তু সাইলিনুশ তার কোনোই প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করছিল না।

'তোর অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগ কর'– সাইলিনুশ বলল– 'হাতে যদি তোর কোনো শক্তি থাকত, তাহলে এতক্ষণে আমি আক্রান্ত হয়ে যেতাম। এই মেয়েটার সম্ভ্রম নিয়ে তুই খেলতে চেয়েছিলি। বল। দেরি না করে সব বলে দে।'

সাইলিনুশ তরবারির আগাটা হামুনের ধমনিতে এতখানি সেঁধিয়ে দিল যে, একটুখানি রক্ত বেরিয়ে এল।

'তলোয়ারটা সরিয়ে নাও'– হামুন বলল– 'আমার সঙ্গে ওয়াদা করো, আর কাউকে বলবে না। এই মেয়েটাকেও বলে দেবে, যেন জবান বন্ধ রাখে।'

সাইলিনুশ হামুনের ধমনি থেকে তরবারির আগাটা সরিয়ে নিল। কিন্তু তরবারিটা ওখানেই রেখে দিল। নিজের একটা পা তার পেটের উপর রেখেই চাপ কিছুটা কমিয়ে দিল। তারপর তাকে নিশ্চয়তা দিল, এই ভেদ কেউ জানতে পারবে না। এই মেয়েটা তো এখান থেকে চলেই যাবে। আর একথাটাও মনে রেখো, এ রাজপরিবারের কন্যা। যদি মিথ্যা বল, তাহলে এ তোমাকে অত্যন্ত নির্মম মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করাতে পারবে। কিন্তু তার আগে আমার তরবারি তোমার ধমনিটা কেটে ফেলবে।

'তুমি সঠিকই বুঝেছ'– হামুন বলল– 'আমি শুধু জাদুর কীর্তি দেখাতে পারি। আর এগুলো সবই ভেলকিবাজি। এই যে আমি নর্তন-কুর্দন ও অন্যান্য আচরণ করি; এর অর্থ হলো, মানুষ আমার দ্বারা প্রভাবিতও হোক, সন্ত্রস্তও হোক। বিনিময়ে আমি কী পাই? গোত্রের নেতারা পর্যন্ত এসে আমার পায়ের উপর বসে থাকে। তারা আমার ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ জোগান দেয়। যখনই একটা মেয়ের ফরমায়েশ করি, তো কোনো-না-কোনো নেতা দেখে-শুনে একটা রূপসী মেয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমার কোনো চাহিদা-ই অপূর্ণ থাকে না।'

'তুমি নাগটাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে'– সাইলিনুশ জানতে চাইল– 'নাগ কি উত্তর দিত? নাকি ওই চিকন কম্পমান আওয়াজটা অন্য কারও ছিল?'

'ওটা আমারই পরিবর্তিত কণ্ঠ ছিল'– হামুন উত্তর দিল– 'ওই সময় আমার পিঠটা তাঁবুতে উপবিষ্ট লোকগুলোর দিকে থাকে আর মুখ থাকে নাগের দিকে। কেউই বুঝতে পারে না, চিকন ও কম্পমান আওয়াজে আমি-ই উত্তর দেই।'

'আর ওই যে বাতিগুলো আপনা-আপনি জ্বলে উঠেছিল?'

'এটা আমার ভেলকিবাজি'– হামুন উত্তর দিল– 'এমন আরও কয়েকটা কৃতিত্ব আমি দেখাতে পারি। আমি সুন্দরী মেয়েদের দক্ষ শিকারী। এই মেয়েটা এমন যে, আমি সব কিছু ভুলে গেছি এবং পেতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। তুমি ঢুকে না পড়লে আমার মনোবাসনা পূরণ হয়েই যেত।'

'তুমি ভুল বুঝেছ'– সাইলিনুশ বলল– 'এই মেয়েটা কালই আমাকে তোমার মতলব বলে দিয়েছিল। এ কোনোমতেই নিজের সম্ভ্রম বিকাতে রাজি ছিল না। আমার শরণাপন্ন হয়ে বলল, তুমি আমাকে রক্ষা করো। আজ একে তোমার কাছে আমি পাঠিয়েছি। একে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে তাঁবুর বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে

তোমার কাণ্ড-কীর্তি অবলোকন করছিলাম। তারপর যথাসময়ে এসে তোমাকে ধরে ফেললাম।'

'আমার অবাক লাগছে এই কাজটা তুমি কেন করলে!'– হামুন বলল– 'এর ইজ্জত বাঁচানোর চিন্তা তো এর হবু স্বামীর করার কথা। কিন্তু সে তোমার থেকে আলাদা হয়ে আমার কাছে এসে বলে গেল, এক দিন কেন তুমি ওকে দুরাত তোমার কাছে রাখো আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করো যে, তুমি ওকে রানি, আমাকে রাজা বানিয়ে দেবে আর সম্রাট হেরাকল আমাদেরকে মিশরের কিছু অংশ দান করবেন, যেখানে আমাদের রাজত্ব চলবে।'

সাইলিনুশ নুশির দিকে আর নুশি সাইলিনুশের দিকে তাকাল।

'আমি তোমাকে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে পারি না'– সাইলিনুশ বলল– 'তুমি সরল ও অবুঝ লোকদের সঙ্গে প্রতারণা করছ এবং তাদের কন্যাদের সম্ভ্রম নিয়ে তামাশা করছ।'

একথা বলেই সাইলিনুশ তরবারির আগাটা হামুনের ধমনির উপর রেখে এমনভাবে চাপ দিল যে, তরবারি হামুনের ঘাড় অতিক্রম করে মাটিতে গিয়ে গেঁথে গেল। সাইলিনুশ তলোয়ারটা বের করে আনল এবং আরেকবার ধমনিতে তরবারির আগাটা ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বের করে আনল এবং ঘাড়টা লম্বালম্বিভাবে কেটে দিল। এবার হামুনের পেট থেকে পা সরিয়ে এনে পিছনে সরে এল। হামুন জবাইকরা ছাগলের মতো ছটফট করতে লাগল এবং তার ঘাড় থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটতে শুরু করল।

'চলো নুশি!'– সাইলিনুশ তরবারিটা খাপে ঢুকিয়ে বলল– 'একে ছটফট করে মরতে দাও।'

সাইলিনুশ ও নুশি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল।

* * *

'আমি আমার হবু স্বামীর কাছে যাব না'– বাইরে এসে নুশি বলল– 'তুমিই বলো, এখন আমি কী করব। তুমি তো জান, আমি এখানে কেন এসেছিলাম। কিন্তু ঘটনা ঘটে গেল অন্যকিছু। তুমি তো আমাকে সঙ্গ দেবে না জানি। ভৃত্যটাও আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। আর হবু স্বামীটাকে তো আর চিনতে আমার বাকি নেই যে, ও চেনে শুধু আমরা রূপ আর শরীরটা। আমার চেতনার সঙ্গে ওর কোনোই সম্পর্ক নেই। লোকটা আমাকে বিপথগামী ও নষ্ট করতে পারবে বটে; কিন্তু আমাকে সঙ্গ দিতে পারবে না।'

'আমি যা বলি মেনে নাও'– সাইলিনুশ বলল– যে-প্রত্যয় নিয়ে তুমি এসেছ, তাতে তুমি সফল হবে না। যে-বেদুইনরা মুসলমানদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিয়েছে, তাদের প্রকৃতি খানিক আলাদা। আর এরা ওদের চেয়ে ভিন্ন। এই বেদুইনদের থেকে দূরে থাকা-ই তোমার জন্য শ্রেয়। তুমি ফিরে যাও।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পার?' নুশি বলল– 'আমি এতটাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছি যে, একা যেতে আমার ভয় লাগছে। তুমি চলো; আমি তোমাকে এত পরিমাণ পুরস্কার নিয়ে দেব যে, তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

'এই শয়তানটা থেকে আমি তোমাকে কোনো লোভে পড়ে উদ্ধার করিনি'– সাইলিনুশ বলল– 'এটা আমার নিজস্ব চরিত্র। নিজের কর্তব্য জ্ঞান করে আমি এসব করেছি। যদি তোমাকে তোমার পিতার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হয়, তাও আমি কর্তব্য মনে করেই আঞ্জাম দেব।'

'তাহলে চলো এখনই রওনা হই'– নুশি বলল– 'আমার হবু স্বামীরও এখনই জানবার প্রয়োজন নেই, ভৃত্যটারও নয়। আমি ওদিকে গিয়ে দাঁড়াই; তুমি তোমার ও আমার ঘোড়াদুটো তৈরি করে নিয়ে আসো।'

সাইলিনুশ আবারও হামুনের তাঁবুতে ঢুকল। হামুন নিথর-নির্জীব পড়ে আছে। চোখদুটো খোলা। কিন্তু সেগুলো থেকে জীবনের চমক নিঃশেষ হয়ে গেছে। সাইলিনুশ তাচ্ছিল্যভরা চোখে লাশটার পানে তাকাল এবং তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। নুশিকে বলল, তুমি ওই দূরে ওখানটায় গিয়ে দাঁড়াও। বলেই নিজেদের তাঁবুর দিকে হাঁটা দিল।

সাইলিনুশ ও বেদুইন ভৃত্য একই তাঁবুতে অবস্থান নিয়েছিল। ঘোড়াগুলো তাঁবু থেকে খানিক দূরে একটা জায়গায় বাঁধা থাকত আর জিনগুলো রাখা ছিল তাঁবুর ভিতরে। সাইলিনুশ তার তাঁবুতে ঢুকে প্রথমে ভৃত্যটাকে দেখল। লোকটা গভীর ঘুম ঘুমিয়ে আছে। সে নিজের ও ভৃত্যের জিনদুটো নিয়ে নিল। দুটা জিনের ওজন অনেক। কিন্তু সাইলিনুশ ওজনটা বরণ করে নিল এবং বিড়ালের মতো পা টিপে-টিপে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল। নিজেরটাসহ দুটা ঘোড়ায় জিন বাঁধল। তারপর নিজেরটায় চড়ে বসে অপরটার লাগাম হাতে নিয়ে নিল। এবার সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল, যেখানে নুশি তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

নুশি এক লাফে খালি ঘোড়াটার পিঠে পড়ে বসল। দুজন ছুটতে শুরু করল।

ছয়

'কথা বলো সাইলিনুশ!'– পথ চলতে-চলতে, পাশাপাশি ঘোড়া হাঁকাতে-হাঁকাতে অনেকক্ষণ পর নুশি বলল– 'চুপচাপ থেকো না। তোমার নীরবতা আমাকে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে।'

'আমি তো তোমাকে অনেকই বীর ও নির্ভীক মেয়ে মনে করেছিলাম নুশি!'– সাইলিনুশ মুখ খুলল– 'তোমাকে যার ভয় ছিল, তাকে তো তোমারই চোখের সামনে খুন করে এসেছি। তার থেকে তুমি রক্ষা পেয়ে চলে এসেছ। আপন বাগদত্তার ভয় না করাই উচিত। কারণ, ও তোমার হবু স্বামী– শত্রু নয়। তোমার লাপাত্তা হওয়ার সংবাদ ও পেতে-পেতে আমরা অনেক দূর চলে যেতে পারব। তা ছাড়া আমরা কোন দিকে এসেছি, তা তো ও জানতেই পারবে না। হতে পারে, ও সন্দেহ করবে, আমি তোমাকে জোরপূর্বক কিংবা প্রতারণায় ফেলে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তা-ই যদি হয়, তাহলে ও বেদুইনদের তাঁবুতে-ঝুপড়িতে আমাদের খুঁজে বেড়াবে।'

'সবার আগে সে হামুন জাদুকরের তাঁবুতে যাবে'– নুশি বলল– 'যখন রক্তের মাঝে ডুবে থাকা হামুনের লাশটা দেখবে, তখন তার সন্দেহ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হবে, তুমি হামুনকে হত্যা করে আমাকে নিয়ে পালিয়েছ।'

'ও আমাদের পেছনে আসবে না'– সাইলিনুশ বলল– 'কাজেই ওর ভয়ে তটস্থ হওয়ার কোনোই কারণ নেই। বাকি রইলাম আমি। তোমার আমাকে ভয় করা যথার্থ বটে। আমার কাছে এমন কোনো যন্ত্র বা উপায় নেই, যার দ্বারা তোমার অন্তর থেকে আমার ভয় বের করে দিতে পারি। এই ভীতি তোমার হৃদয় থেকে তখন দূর হবে, যখন আমি তোমাকে তোমার পিতামাতার কাছে পৌঁছিয়ে দেব।'

'আমি আগেও বলেছি সাইলিনুশ!'– নুশি বলল– 'এখন আবারও বলছি, আমাকে আমার পিতামাতার কাছে পৌঁছিয়ে দিলে তোমাকে আমি বিপুল পরিমাণ পুরস্কার পাইয়ে দেব। তুমি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যাবে। তোমাকে আরও একটা কাজ করতে হবে। আমার পিতামাতাকে এই সমস্ত কাহিনী শোনাতে হবে। আমি শোনালে হয়তবা তারা বিশ্বাস করবেন না। আমার এই বাগদত্তটার ব্যাপারেও বলবে লোকটা কোন চরিত্রের মানুষ এবং কীভাবে সে তার আসল চেহারা খুলে দিয়েছে।'

'এ তো আমি বলবই নুশি!'– সাইলিনুশ বলল– 'কিন্তু পুরস্কারের কথাটা বারবার মুখে এনো না। কোনো পুরস্কার আমি চাই না। আমি আমার পুরস্কার উসুল করে নিয়েছি। আর...'

'কী বললে?'– সহসা চমকে উঠে সাইলিনুশকে থামিয়ে দিয়ে নুশি আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল– 'মতলব তোমার এ নয় তো আবার যে, আমাকেই পুরস্কারস্বরূপ উসুল করে নিয়েছ? তুমি কি আমাকে আমার পিতামাতার কাছে নিয়ে যাচ্ছ না?'

'বোকা মেয়ে'– সাইলিনুশ উত্তর দিল– 'আমার বক্তব্য পুরোপুরি শুনে তারপর মন্তব্য করো। আমি বদ্দু নই নুশি! আমি খ্রিস্টানও নই।'

'তাহলে কী তুমি?' নুশির কণ্ঠে এক পাহাড় বিস্ময়।

'মুসলমান'– সাইলিনুশ উত্তর দিল– 'আমি মিশরি নই– আরবি। নাম আমার সাইলিনুশ নয়– আব্বাস ইবনে তালহা। তোমার অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ভরে আছে। আমি যখন তোমাকে তোমার ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেব, তখন বোলো, মুসলমান কেমন হয় আর তাদের চরিত্র কীরূপ। আর মনে করো না, একা আমি-ই ভালো মুসলমান। আমার জায়গায় অন্য কোনো মুসলমান হলে সেও তা-ই করত, যেমনটি আমি করেছি। এ আমাদের ধর্মের শিক্ষা, যাকে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান বলে পালন করি।'

নুশির বিস্ময়ের অবধি রইল না। মেয়েটা যেন হঠাৎ আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। সমস্তটা শরীর তার নিথর ও অসাড় হয়ে গেল। কষে বাগ টেনে ধরে ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে নিয়ে আব্বাস ইবনে তালহার পানে এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যেন লোকটা অন্য কোনো জগতের প্রাণী আচম্বিত তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। এ যেন সে নয়, যার সঙ্গে সে দীর্ঘ একটা সময় কাটিয়ে এসেছে এবং যে তাকে একটা প্রতারক ও লম্পটের হাত থেকে রক্ষা করে নিয়ে এসেছে। আব্বাস ইবনে তালহা খানিক সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। সে দেখল, নুশি তার সঙ্গে তার নেই। ফলে সে মোড় ঘুরিয়ে তাকাল। নুশি দাঁড়ানো ঘোড়াটার পিঠে বসে একনাগাড়ে তার পানে তাকিয়ে আছে। মুখে তার বিস্ময় ও দ্বিধার ছাপ পরিস্ফুট। আব্বাসের বোধহয় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নুশি সঙ্গে-সঙ্গে মেনে নেবে, সে মুসলমান আর মুসলমানদের ব্যাপারে তার ধারণাটাও পালটে যাবে এবং ইচ্ছার বাইরে হলেও বলে উঠবে, মুসলমান তো খুবই ভালো মানুষ!

'দাঁড়িয়ে গেলে কেন নুশি!'– আব্বাস ইবনে তালহা মোড় ঘুরিয়ে ওদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল– 'এসে বিস্ময়ের কী আছে যে, আমি মুসলমান আর মুসলমান মানেই ভালো মানুষ!'

কিন্তু নুশির প্রতিক্রিয়া অন্য রকম। সে ঘোড়ার লাগামটা এমনভাবে টেনে ধরে রাখল, যেন তার ঘোড়া ধীরে-ধীরে উলটোপায়ে হাঁটছে আর সে ডানে-বাঁয়ে এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন পালাতে চাচ্ছে। আব্বাস খানিক দূরে থাকতেই নুশি ঘোড়াটা একদিকে ঘুরিয়ে দিল।

এবার আর কোনোই সংশয় রইল না, নুশি পালাবার সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করে ফেলেছে। আব্বাস নিজের ঘোড়াটা দ্রুত হাঁকিয়ে নুশির ঘোড়ার সামনে নিয়ে গেল। নুশির মুখটা রাগে-ক্ষোভে জ্বলজ্বল করছে। সে লাগামটা সজোরে একদিকে ঝটকা দিয়ে ঘোড়াটাকে একটুখানি হাঁকাল।

'আমার পথ থেকে সরে যা আরবের বদ্দু!'– নুশি দাঁত কড়মড় করে বলল– 'আমি তোর সাথে যাব না।'

'মাথাটা ঠিক রাখো নুশি!'– আব্বাস স্বাভাবিক গলায় বলল– 'কী বুঝে বসেছ তুমি?'

'আমার থেকে দূরে থাক ধোঁকাবাজ!'– নুশি তরবারিটা খাপ থেকে বের করল এবং হুঙ্কার ছাড়ল– 'তুই বোধহয় মনে করেছিস, আমি রাজকন্যাটা মনের শখে তলোয়ার নিয়ে ঘুরে ফিরছি। তরবারি বের কর। আগে আমাকে হত্যা কর। তারপর আমার মরদেহটা নিয়ে তামাশা কর। কিন্তু মনে রাখিস, আমাকে তুমি সহজে হত্যা করতে পারবি না।'

'তোমাকে আমি ধোঁকা দিচ্ছি না নুশি!' আব্বাস ইবনে তালহা নুশিকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা চালাল।

'তোর প্রতারণার ফাঁদে আমি আসব না কখনও'– নুশি একটুও ঠাণ্ডা হলো না– 'মুসলমান বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে এ আমি মানতেই পারব না। তবে তুই মুসলমানও নস, খ্রিস্টানও নস। যদি আরব হয়ে থাকিস, তাহলে তুই মরুদস্যু। তলোয়ার বের কর, যাতে আমার আক্ষেপ না থাকে, আমি তোকে মোকাবেলা করার সুযোগ দেইনি।'

'তোমার সঙ্গে আমার কোনোই গাঁটছড়া নেই নুশি!'– আব্বাস সুধাল– 'এখানে তোমাকে একলা ফেলে আমি নিজের পথ ধরতে পারি। কিন্তু একজন মুসলমান হয়ে একটা যুবতী মেয়েকে এই বিয়াবানে একলাটি ছেড়ে আমি যাব না। হতে পারে, কোনো তস্কর এদিকে চলে আসবে। তখন সে আমার মতো মহৎ উদ্দেশ্যে সম্মানের সাথে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না।'

নুশি এতখানিই উত্তপ্ত যে, আব্বাসে কোনো দাওয়া-ই তাকে শান্ত করতে পারছে না। মেয়েটা একটুও ঠাণ্ডা হচ্ছে না। বারবারই তরবারি উড়িয়ে আব্বাস ইবনে তালহাকে হুঙ্কার দিয়ে চলছে। অবেশষে আব্বাস নিজের তলোয়ারটা বের করল এবং তার নুশির ঘোড়ার পায়ের সামনে ছুড়ে মারল। তারপর কটিবন্দ থেকে খঞ্জরটা বের করল এবং সেটাও ছুড়ে মারল। তারপর এমন কিছু কথা বলল যে, নুশির ক্ষোভের আগুন ধীরে-ধীরে নিভতে লাগল।

আমার দুটা প্রশ্নের উত্তর দাও'– নুশি শান্ত সুরে বলল– 'এক. এখানে তুমি কী করতে এসেছিলে? দুই. তুমি কী পুরস্কার উসুল করে নিয়েছ?'

'আমি গোয়েন্দা'– আব্বাস ইবনে তালহা উত্তর দিল– 'চরবৃত্তির জন্য আমি অনেক সামনে চলে গিয়েছিলাম। এখন বাহিনীতে ফিরে যাচ্ছিলাম। পুরস্কারটা উসুল করেছি; আমি তোমার ও তোমার হবু স্বামী থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পেয়েছি। কেন তোমাদের বাহিনী কেবলই পেছনে সরে যাচ্ছে এ আমি আগে থেকেই জানতাম। তোমাদের কাছ থেকে আমি তার সত্যায়ন পেয়েছি। তা ছাড়া তোমার ও তোমার হবু স্বামী থেকে আমি আও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করেছি। একে আমি আমার ও আমার বাহিনীর জন্য বিরাট পুরস্কার মনে করি। একজন মুসলমানের জন্য এটিও বিরাট পুরস্কার যে, আমি হামুন জাদুকরকে হত্যা করেছি। ইসলাম এসব কুসংস্কারপুজা আর ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন করে না। অনাগত ভবিষ্যতের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর মানুষের সকল সমস্যার সমাধানও তিনি ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। হামুন সরল-সহজ মানুষগুলোকে স্রেফ প্রতারণার মাধ্যমে নিজের ভক্ত বানিয়ে রেখেছিল। তোমার সঙ্গে আমার একটা-ই সম্পর্ক ছিল যে, একটা শয়তান ধোঁকা দিয়ে তোমাকে বে-আবরু করতে চেয়েছিল আর ম মুসলমান হিসেবে আমার কর্তব্য ছিল, তোমাকে আমি রক্ষা করব।'

'আমাকে তুমি আমার পিতামাতার কাছে পৌছিয়ে দিতে যাচ্ছ'– নুশি এখন পুরোপুরি ঠাণ্ডা– 'তোমার পরিচয়টা কি তুমি আমার বাবাকে বলে দেবে? আমার মতে এমনটা করা ঠিক হবে না। আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তোমার প্রকৃত পরিচয় আমি আমার পিতামাতা থেকে গোপন রাখব। এটি কি একটি পুরস্কার হবে না? জানতে পারলে বাবা তোমাকে গ্রেফতার করে ফেলবেন। হত্যাও করতে পারেন। এমনটা আমি হতে দেব না।'

'আমি তোমার পিতা পর্যন্ত যাবই না নুশি!'– আব্বাস ইবনে তালহা বলল– 'আমাকে কোনো লোভ দেখিয়ো না, কোনো উৎসাহ দিয়ো না। ভয় দেখানোরও চেষ্টা করো না। তোমাকে বিলবিস নগরীর বাইরে নিরাপদ কোথাও রেখেই আমি উলটোপায়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দেব। তুমি যখন তোমার পিতার কাছে পৌছবে, ততক্ষণে আমি অনেক দূর চলে আসব। আমি তোমাকে আবারও বলছি, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখো, হুশ-জ্ঞান ঠিক রাখো। তোমার কুধারণা আমাদের মাঝে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে দিল, যেন তুমি আমার থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছ আর আমি তোমাকে ফুসলিয়ে অপহরণ করতে চাচ্ছি। ধারণাটা যদি বদলাতে না পার, তাহলে যাও; এটা আমার পথ আর ওটা তোমার পথ।'

রোমান রাজপরিবারের এই মেয়েটার উপর এবার এমন নীরবতা ছেয়ে গেল, যেন সে কী যেন ভাবছে কিংবা আব্বাস ইবনে তালহার প্রতি তার কুধারণা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করছে।

ঘোড়া থেকে নেমে আসো'– আব্বাস বলল– 'আমার তলোয়ার আর খঞ্জরটা তুলে নাও। অস্ত্রদুটো তোমার কাছে রাখো আর আমার সঙ্গে রওনা হও।'

নুশি আব্বাস ইবনে তালহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অপলকচোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে আব্বাসের তলোয়ার ও খঞ্জরটা তুলে হাতে নিল। ধীরপায়ে আব্বাসের কাছে গেল এবং অস্ত্রদুটো তার দিকে এগিয়ে ধরল। আব্বাস বলল, না; তোমার কাছেই রাখো। কিন্তু নুশি মুখে কিছু না বলে মাথা দুলিয়ে বলল, আমি রাখব না। তোমার অস্ত্র তোমারই কাছে থাকুক। আব্বাস অস্ত্রগুলো নিয়ে নিল আর নুশি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। মাথা দ্বারা আব্বাসকে ইশারা দিল, চলো। দুটা ঘোড়া পাশাপাশি বিলবিসের দিকে এগিয়ে চলল।

* * *

'তোমাদের রাজপরিবারে শারিনা নামে একটা মেয়ে ছিল'– আব্বাস ইবনে তালহা বলল– 'জান ওকে?'

'জানি বই কি'– নুশি বলল– 'সম্রাট হেরাকল-এর কন্যা ছিল। কিছুদিন আগে এমনভাবে উধাও হয়ে গেল যে, আর কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। তা তুমি ওকে জান কী করে?'

'এভাবে যে, ও আমাদের কাছে আছে'– আব্বাস উত্তর দিল– 'আমাদের কেউ তাকে অপহরণ করেনি। নিজের মর্জিতে, আপন হৃদয়ের হাতে অপারগ হয়ে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে চলে এসেছিল আর এখন তার বউ। আমার এই বন্ধু আমার মতো গুপ্তচর। তোমাদের ওখানে গোয়েন্দাগিরির জন্য গিয়েছিল। শারিনার সঙ্গে দেখা হলো আর হার্দিক সম্পর্ক দুজনকে এক করে দিল।'

'আমার তখন ছেলেবেলা'– নুশি বলল– 'ওর সঙ্গে আমার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। খুবই ভালো মেয়ে ছিল। তোমাদের কাছে ও কেমন সুখে আছে কে জানে।'

'আমি বললে তুমি মানবে না নুশি!'– আব্বাস উত্তর দিল– 'গিয়ে নিজচোখে দেখলেই তবে বিশ্বাস হবে, ও কেমন সুখে আছে। মেয়েটা সত্যিই একজন মহৎ নারী। তোমাকে শুধু আমি এটুকুই বলব, ও যে রোমসম্রাটের কন্যা সেকথা ও ভুলেই গেছে। আমাদের পরিবেশটা-ই এমন যে, ওখানে ধোঁকা-প্রতারণা বলতে কিছু নেই– আছে শুধু প্রেম আর নিষ্ঠা।'

বেশ কিছু পথ শারিনার আলোচনা চলতে থাকল আর নুশি পরম আগ্রহ ও কৌতূহলের সাথে জিজ্ঞেস করতে থাকল, মুসলমানদের ওখানে নারীর জীবনাচার ও অন্যান্য ব্যাপার-স্যাপার কেমন। আব্বাস ইবনে তালহা তাকে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকল।

'বুঝতে পারছি না, এ বিষয়গুলো মনের মাঝে কেন উদয় হচ্ছে' নুশি অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে আনমনে বলল– 'হৃদয়ে আগ্রহ জাগছে, তোমার সঙ্গেই চলে যাব। এমনটা মনে হচ্ছে, যেন তোমার থেকে আলাদা হয়ে গেলে পরে আফসোস হবে, লোকটাকে ছাড়লাম কেন। ওই অভাগা হবু স্বামী আমার হৃদয়টাকে চুরমার করে দিয়েছে। ফলে আমি ভিন্ন কিছু ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। আরও একটা চিন্তা আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। আমার রাজপরিবারে সম্মান ও আত্মমর্যাদাবো শেষ হয়ে যাচ্ছে। রাজপরিবারে অপরাধ ও অপকর্ম একটা বৈধ প্রথার মতো চলছে। তুমি তো দেখেছ, নিজের সম্ভ্রমের খাতিরে বেদুইন জাদুকরটাকে তোমাকে দিয়ে খুন করিয়েছি আবার এখন একই লক্ষ্যে তোমারই মোকাবেলায় তরবারি কোষমুক্ত করেছি।'

'তোমার ব্যাপারে এমন কোনো চিন্তা-ই আমি করিনি'– আব্বাস তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল– 'আর এমন ভাবনা আমি ভাববই না। তোমার মনে যা-যা চিন্তার উদয় হচ্ছে হচ্ছে ভাবতে থাকো। আমি আমার কর্তব্যপালনে ত্রুটি করব না।'

'আরও একটা চিন্তা মাথায় আসছে'– নুশি বলল– 'তোমার সঙ্গে নাহয় গেলাম; কিন্তু জানা তো নেই, তোমার বংশ কেমন, পরিবার কেমন। আর তোমারইবা প্রকৃত রূপ কী। তার মানে... ।'

'আমি তোমার কথার অর্থ বুঝে ফেলেছি'– আব্বাস নুশির কথা কেটে দিয়ে বলল– 'মানে, তুমি জানতে চাচ্ছ আমিও তোমার মতো কোনো রাজাপরিবারের সন্তান কিনা। যদি বলি, আমি অনেক বড় বিত্তশালী পরিবারের সদস্য, তাহলেই আমার সঙ্গে যাবে; অন্যথায় নয় তা-ই না?'

নুশি হিহি করে হেসে উঠল। এই হাসির অর্থ হলো, তুমি ঠিকই ধরেছ; আমি এমনটি-ই বোঝাতে চেয়েছি।

'শুনে বোধহয় অবাক হবে নুশি!'– আব্বাস বলল– 'ইসলামে কোনো রাজপরিবার হয় না। যাদের আমরা আমাদের শাসক বানাই, তাঁরাও রাজপরিবারের কেউ নন। আমরা সবাই এক। আমাদের প্রত্যেকের অধিকার ও মর্যাদা সমান। আমাদের খলিফা যদি বাহিনীর মাঝে এসে হাজির হন, তুমি মানবেই না, এই লোকটি একটা বিজেতা জাতির সবচেয়ে বড় নেতা। তুমি বলবে, আরে! ইনি তো একজন সাধারণ মানুষ! ইসলামে রাজা-প্রজার কোনো ভেদাভেদ নেই। মানবতার প্রেম আর সহমর্মিতা আমাদের ঈমান। একটা দুশ্চরিত্র লম্পটের হাত থেকে তোমাকে আমি এজন্য রক্ষা করে আনিনি যে, তুমি অতিশয় রূপসী ও রাজপরিবারের মেয়ে। বরং এজন্যে করেছি যে, তুমি একটা অসহায় ও মেয়ে এবং আবেগতাড়িত হয়ে একটা ভুল ও বিপজ্জনক পথে বের হয়েছ।'

'তাহলে কি মুসলমানদের ব্যাপারে আমি যাকিছু শুনে আসছিলাম, সবই ভুল?'– নুশি বলল– 'শুনেছি, মুসলমানরা নাকি লুটেরা ও জংলি মানুষ।'

'আমার কাছে জানতে চেয়ো না'– আব্বাস বলল– 'আমরা মিশরের দুটা বৃহৎ নগরী আরিশ ও ফরমা জয় করেছি। এই দুই নগরীর অভ্যন্তরে এবং আশপাশে অসংখ্য জনবসতি আছে। ওখানে গিয়ে খ্রিস্টানদের জিজ্ঞেস করো, মুসলমানরা তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করছে। তখনই তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছ। মনে করো, আমি রাজপরিবারেরই সদস্য। কিন্তু তোমাকে আমি নেব না। কারণ, আমার হাতে তুমি একটি আমানত। তুমি তোমার পিতামাতার আমানত। আমার ধর্মের আদেশ হলো, যার আমানত তার কাছে পৌঁছিয়ে দাও।'

* * *

'থামো নুশি! থামো!'– আব্বাস ঘোড়ার বাগ টেনে ধরে বলল– 'ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছ?'

নুশিও তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল এবং কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেল। একটা ধাবমান ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ খুবই দূরের আওয়াজের মতো শোনা যাচ্ছে। এই ঘোড়ার আরোহী যে-কেউ হতে পারে। কিন্তু আব্বাস ও নুশির মনে একটা ভয় অনুভূত হচ্ছিল, নুশির হবু স্বামী যদি টের পেয়ে যায়, নুশি ও সাইলিনুশ লাপাত্তা, তাহলে তাদের ধাওয়া করবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কাজেই এই অশ্বারোহী নুশির হবু স্বামী হতে পারে, আবার কোনো বেদুইনও হতে পারে। কেউ হয়ত দেখে ফেলেছে, হামুন মৃত পড়ে আছে আর সাইলিনুশ নুশিকেসহ উধাও। হত্যার সন্দেহ; বরং দৃঢ় বিশ্বাস তাদেরই উপর হতে পারে। কাজেই হতে পারে কোনো বেদুইন তাদের ধাওয়া করতে আসছে।

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ এখন অনেক স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং মনে হচ্ছে, যেন ঘোড়াটা তাদেরই দিকে আসছে। দুজন মোড় ঘুরিয়ে দেখতে থাকল।

ঘোড়াটা বেশ দ্রুত দৌড়াচ্ছে। কিন্তু এদের গতি সাধারণ। পূর্ণ চাঁদ মাথার উপর উঠেছে। বনের জোছনা এখন আগের চেয়ে বেশি ফকফকা। এবার পিছনের দিকে তাকিয়েই তারা ঘোড়া দেখতে পেল। অশ্বারোহী যদি সাধারণ কোনো পথিক হতো, তাহলে গতিও তার সাধারণই হতো। কিন্তু সে ঘোড়াটা দ্রুত হাঁকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসছিল এবং দেখতে-না-দেখতেই একেবারে তাদের কাছে চলে এল।

'নুশি!'– অশ্বারোহী হুঙ্কার ছেড়ে বলল– 'এত সহজে যেতে পারবে মনে করো না। তলোয়ার বের কর বন্দু! পরে একথা বলতে পারবে না, আমি তোকে মোকাবেলার সুযোগ দেইনি।'

'আমি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি হে রোমান!'– আব্বাস ইবনে তালহা বলল– 'এই মেয়েটাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি না। একে আমি এর পিতামাতার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে যাচ্ছি।'

'মিথ্যুক কোথাকার!'– নুশির হবু স্বামী দাঁতে দাঁত পিষে বলল– 'আমি জানি একে তুই কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস।'

নুশি আব্বাস ইবনে তালহাকে ডাক দিয়ে বলল, তলোয়ার কোষমুক্ত করে নাও আর ওর সাথে কোনো কথা বলো না। সে নিজেও তরবারি বের করে নিল। নুশির হবু স্বামী এমন কিছু অপ্রীতিকর কথা বলে ফেলল যে, আব্বাস তরবারি বের না করে পারল না। অন্যথায় আব্বাস ইবনে তালহার চেষ্টা ছিল, ব্যাপারটা যেন লড়াই পর্যন্ত না গড়ায়। কিন্তু নুশির হবু স্বামী লোকটা রাগে পাগলের মতো হয়ে গেল এবং সামনে এগিয়ে-এগিয়ে তরবারিটা আব্বাসের সম্মুখে নাড়াতে লাগল। অবশেষে আব্বাস ও নুশির হবু স্বামীর মাঝে তরবারিচালনা শুরু হয়ে গেল। দুজনই আপন-আপন ঘোড়া ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এবং পজিশন বদল করে-করে একজন অপরজনের উপর আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দুজনই দক্ষ অসিবিদ বলে কেউই কাউকে ঘায়েল করতে পারছিল না। তলোয়ারে-তলোয়ারে টক্কর খেতে থাকল এবং দেহদুটো তরবারির আঘাত থেকে নিরাপদ থাকল।

নুশিও তরবারি ঘুরিয়ে হবু স্বামীর উপর আক্রমণ চালাতে এগিয়ে এল। কিন্তু আব্বাস তাকে ধমক দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিয়ে বলল, একজনের মোকাবেলায় দুটো তরবারি আসা কাপুরুষতা। দুজনের লড়াই তীব্র-থেকে-তীব্রতর হতে থাকল। নুশি রাগে-ক্ষোভে এতটাই অগ্নিশর্মা যে, এই যুদ্ধ থেকে সে আলগা থাকতে পারল না। বারবারই সে দুজনের মধ্যখানে চলে আসছে। দুজন পুরুষের লড়াইয়ে তার হস্তক্ষেপ বিফল হচ্ছে। আব্বাস বারবারই তাকে পিছনে সরে যেতে আদেশ করছে।

'একে আসতে দাও সামনে'– নুশির হবু স্বামী চরম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল– 'একে আমারই তরবারির আঘাতে মরতে হবে। দুজনের একজনও বেঁচে থাকতে পারবে না।'

'তুমি পিছনে সরে যাও আব্বাস!'– নুশি বলল– 'এ আমার হাতে মরতে চাচ্ছে; আমাকে তুমি সুযোগ দাও।'

'পেছনে থাকো নুশি'– আব্বাস গর্জে উঠে বলল– 'আমি একে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।'

নুশির হবু স্বামী ঘোড়াটা একধারে সরিয়ে নিল এবং দুজনের চারপাশে দৌড়াতে লাগল।

'কী নাম বললে এর?' নুশির হবু স্বামী বিস্মিত গলায় নুশিকে উদ্দেশ করে জানতে চাইল।

'আব্বাস ইবনে তালহা'– নুশির আগে আব্বাসই উত্তর দিল– 'আমার নাম সাইলিনুশ নয়। আমি মুসলমান।'

'হা-হা'– নুশির হবু স্বামী তিরস্কারের সুরে বলল– 'আমার তরবারি তো মুসলমানের রক্তেরই পিয়াসী ।'

এবার নুশির হবু স্বামী আক্রমণের তীব্রতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল । কিন্তু এরই মধ্যে আব্বাসের তরবারি তার পাঁজড়ে ঢুকে গেল । আব্বাস তরবারিটা টেনে বের করে ঝটপট আবার তার ঘাড়ে এমন একটা আঘাত হানল যে, ঘাড়টা অর্ধেক কেটে গেল । নুশির হবু স্বামী এক দিকে কাত হয়ে পড়ে গেল ।

'চলো নুশি!'– আব্বাস ইবনে তালহা বলল– 'একে আমি বেঁচে থাকার অনেক সুযোগ দিয়েছিলাম । কিন্তু এই পরিণতিই এর কপালের লিখন ছিল ।'

কিন্তু আব্বাস ইবনে তালহা নুশির পক্ষ থেকে কোনো উত্তর পেল না, যেন নুশি ওখানে ছিলই না । নুশির যেখানটায় থাকবার কথা ছিল আব্বাস সেদিকে তাকাল । কিন্তু ওদিকে নুশির ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে । নুশি ঘোড়ার পিঠে নেই । আব্বাস দেখল, নুশি মাটিতে পড়ে আছে । সে ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে নেমে গেল এবং নুশির কাছে গিয়ে দাঁড়াল । নুশির পরিধানের কাপড়-চোপড় রক্তে লাল হয়ে গেছে!

আব্বাস ইবনে তালহা নুশির পাশে বসে পড়ল এবং জিজ্ঞেস করল, এ কী হয়েছে তোমার? নুশি ব্যথায় কোঁকাতে-কোকাতে শুধু জীবনের শেষ কথাটুকু বলল, হতভাগা মরতে-মরতে তরবারিটা আমার বুকে গেঁথে দিয়ে গেছে । নুশি আর কোনো কথা বলতে পারল না । মাথাটা তার একদিকে কাত হয়ে গেল ।

আব্বাস জানতেই পারেনি, নুশিকে তার হবু স্বামী কখন এবং কীভাবে তলোয়ারের আঘাত হেনে গেছে । এই আশঙ্কায়ই আব্বাস নুশিকে বারবার বলছিল, তুমি দূরে থাকো । কিন্তু কোন ফাঁকে যেন মেয়েটা তার কাছে চলে গিয়েছিল আর তরবারির আঘাত হেনে সে তারও জীবনপ্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে গেল!

আব্বাস ইবনে তালহা লাশদুটো ওখানেই ফেলে রাখল এবং তাদের ঘোড়াদুটোর বাগ নিজের ঘোড়ার পিছনে বেঁধে নিয়ে রওনা হলো । এমন উন্নত জাতের ঘোড়াগুলো ফেলে যাওয়া সে সমীচীন মনে করল না । তার মনে এতটুকুও অনুশোচনা জাগল না, এমন একটা রূপসী মেয়ে মরে গেল । মনটা তার এই ভেবে শান্ত হলো যে, আল্লাহ তাকে সেই কর্তব্য থেকে অতি সত্বর অব্যাহতি দিলেন, যেটি সে আপনা থেকেই নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়েছিল । আর মনে-মনে আত্মতুষ্টি অনুভব করল, আমি আমার আমানতে খেয়ানত করিনি ।

* * *

যেরাতে নুশি ও সাইলিনুশ জাদুকর হামুনকে হত্যা করে এবং নুশির বেদুইন ভৃত্য ও হবু স্বামীকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে ওখান থেকে চলে এসেছিল, সেরাতের কথা । নুশি-সাইলিনুশ নিশ্চিন্ত ছিল, হবু স্বামী ও ভৃত্য টের পায়নি, তারা ওখান থেকে চলে এসেছে । ইতিমধ্যে তারা বহু দূর চলে আসতে সক্ষম হয়েছে ।

কিন্তু মৃত্যু নুশির হবু স্বামীকে এদিকে নিয়ে এসেছিল। অন্যথায় নুশি ও আব্বাসকে তাঁবুতে না পেয়ে তাদের অনুসন্ধানে সে অন্য একদিকে রওনা হয়েছিল। পরে সে এদিকে কেন এল? তার একটা উত্তর হলো, আব্বাস ইবনে তালহার হাতে নিহত হওয়া তার কপালের লিখন ছিল। তাই যম তাকে এদিকে টেনে এনেছে। আসল জবাবটাও পাওয়া গেল। আব্বাস ইবনে তালহা যখন নুশি ও তার হবু স্বামীর লাশদুটো ফেলে রেখে সামনের দিকে রওনা হলো এবং সামান্য পথ অতিক্রম করল, তখন সে নুশির হবু স্বামী যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিক থেকে ধাবমান ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল। আব্বাস ঘোড়াটা ওখানেই দাঁড় করিয়ে নিল এবং আগন্তুক অশ্বারোহীর অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘোড়ার পদধ্বনি ক্রমে উচ্চ ও নিকটতর হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরই স্বচ্ছ চাঁদের আলোয় একটা অশ্ব ও অশ্বারোহীর অবয়ব তার চোখে পড়তে শুরু করল। আরোহী একা একজন। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, তার হাতে কোনো তরবারি নেই। আব্বাস তার একটা হাত তরবারির হাতলে রাখল। লোকটা কোনো বেদুইন হওয়ার সম্ভাবনা-ই বেশি।

অশ্বারোহী সেই জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়ে গেল, যেখানে নুশি ও তার হবু স্বামীর লাশদুটো পড়ে আছে। সে ঘোড়া থেকে নামল এবং লাশগুলোর কাছে দিয়ে বসে তাদের দেখতে শুরু করল। চাঁদের আলো বেশ পরিষ্কার ছিল বটে; কিন্তু অতখানি দূর থেকে লোকটার মুখচ্ছবি চেনা যাচ্ছে না। আব্বাসে মনে হলো, লোকটা নুশির বেদুইন ভৃত্য। আব্বাস সেদিকে এগিয়ে গেল। হাঁ; লোকটা বেদুইন ভৃত্যই বটে। আব্বাসকে ওদিকে যেতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। আব্বাস ঘোড়া থেকে নামল এবং তার কাছে চলে গেল। এই লোকটার পক্ষ থেকে তার কোনো ভয় নেই। কারণ, একে তো বেচারা ভৃত্য, তায় আবার বেদুইন।

'এ কী হয়ে গেল?' বেদুইন ভৃত্য ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল। চোখে তার অশ্রু টলমল করছে।

'মৃত্যু এই হতভাগাকে এদিকে নিয়ে এসেছিল'– আব্বাস উত্তর দিল– 'আর তোমার শাহজাদি তার এই হবু স্বামীর হাতে খুন হয়েছে। সে প্রাণ হারিয়েছে আমার তরবারিতে। তা তুমি কি এদের পেছনে এসেছ?'

'আমি আমার শাহজাদির খোঁজে এসেছি'– ভৃত্য উত্তর দিল– 'অনেক ভালো রাজকন্যা ছিলেন। আমাকে ভৃত্য মনে করতেন না।'

ভৃত্যর চোখ থেকে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা বেদনাশ্রু ঝরে পড়ল।

নুশির হবু স্বামী এদিকে কীভাবে এল, আব্বাস ইবনে তালহা এই ভৃত্যর কাছে তার ইতিবৃত্ত জানতে পারল। আব্বাস যখন নিজের তাঁবু থেকে দুটা জিন তুলে নিয়ে বের হচ্ছিল, তখন এই ভৃত্যর চোখ খুলে গিয়েছিল। ছোট মানুষ বিধায় আব্বাসকে

জিজ্ঞেস করার সাহস করল না, এগুলো নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন। কিন্তু আব্বাস যখন বেরিয়ে গেল, তখন উঠে দেখতে লাগল লোকটা কী করে এবং কোন দিকে যায়।

ভৃত্য আব্বাসকে ঘোড়ার পিঠে জিন কষতে দেখল। তারপর তাকে ও নুশিকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসতে দেখল। তারপর ওরা কোন দিকে গেল তাও দেখল। এবার সে তাঁবুতে ঢুকে বসে পড়ল। নুশির হবু স্বামীকে ব্যাপারটা সঙ্গে-সঙ্গে জানাতে পারত। কিন্তু সাহসের অভাবে তাও বলল না। ভৃত্য তাঁবুতে বসে থাকল।

অনেকখানি সময় পার হওয়ার পর বেদুইন ভৃত্য দেখল, নুশির হবু স্বামী তাঁবু থেকে বের হয়ে কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং হামুনের তাঁবুর দিকে তাকাচ্ছে। কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা হামুনের তাঁবুর দিকে চলে গেল। এবার ভৃত্য তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল এবং লোকটা কী করে দেখতে থাকল। তখনও তার মনে সাহস জাগেনি, বলবে, ওরা দুজন কোথাও চলে গেছে।

ক্ষণকাল পর নুশির হবু স্বামী দৌড়ে তার তাঁবুর দিকে এল। এবার ভৃত্য এগিয়ে গেল এবং জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার; আপনি দৌড়াচ্ছেন কেন? সে জানাল, হামুন তার তাঁবুতে মৃত পড়ে আছে। ওই বদ্দুটা (আব্বাস) আর নুশিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'তোমার অবশ্যই জানা থাকবে, বদ্দুটা কোথায় থাকে'– নুশির হবু স্বামী ভৃত্যকে বলল– লোকটা হামুনকে হত্যা করে নুশিকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। আমি নিশ্চিত, নুশিকে ও নিজের বাড়িতেই নিয়ে গেছে। তুমি আমার সাথে চলো আর বলো, বেদুইনরা কোথায় থাকে। আমাকে তুমি ওদের নেতার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও।'

'ভৃত্য কোনো তথ্য না দিতেই নুশির হবু স্বামী দৌড়ে তার তাঁবুতে গেল এবং জিন নিয়ে এল। ভৃত্যকে বলল, দেরি না করে তোমার জিনটাও নিয়ে আসো এবং তাড়াতাড়ি ঘোড়া প্রস্তুত করো।'

ভৃত্য বলল, ওরা ওদিকে বেদুইন পল্লীর দিকে যায়নি। ওর বিলবিসের দিকে গেছে।

'এই বদ্দু সাইলিনুশটা না ফরামার দিকে যাবে, না বিলবিসের দিকে যাবে'– নুশির হবু স্বামী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল– 'তুমি শুধু এটুকু তথ্য দাও, ওদিকেও বেদুইনদের কোনো গোত্র বাস করে কিনা।'

'অনেকখানি দূরে গিয়ে রাস্তা ডান দিকে মোড় নিয়েছে'– ভৃত্য উত্তর দিল– 'এই পথটা অনেকখানি অতিক্রম করে আবার ডান দিকে মোড় নিয়েছে। তারপর কতটুকু সামনে গেলে একটা পল্লী আছে। ওখানে বেদুইনদের দুটা গোত্র বাস করে।'

'আচ্ছা; তুমি কি সাইলিনুশকে জান?'– নুশির হবু স্বামী জিজ্ঞেস করল– 'ও কোন গোত্রের নেতা?'

'না'– ভৃত্য উত্তর দিল– 'ওকে আমি এ-ই প্রথমবার দেখেছি। আমার মনে সন্দেহ আছে, লোকটা বেদুইনই নয়।'

'এই সন্দেহ আমারও'– নুশির হবু স্বামী বলল– 'নুশিকে বাগানোর জন্যই আমাদের সঙ্গে ভাও দিয়েছিল। সে যা হোক; এখন তুমিও আমার সঙ্গে চলো।'

ভৃত্য দাসসুলভ ভঙ্গিতে অপরাগতা প্রকাশ করল। বলল, আমি ঘোড়া অতটা দ্রুত হাঁকাতে পারি না। কোথাও যুদ্ধ করার প্রয়োজন হলে তাও আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। নুশির হবু স্বামী এতই ক্ষুব্ধ ও তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিল যে, ভৃত্যকে তার সঙ্গে যেতে বাধ্য করার সময়টুকুও সে পেল না। সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল।

ভৃত্য আব্বাসকে জানাল, নুশির হবু স্বামী তো রওনা হয়ে গেল; কিন্তু ভাবলাম, আমারও এখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করা ঠিক হবে না। আমি চিন্তা করলাম, এখন নিজের বাড়িতেই ফিরে যাব এবং বিলবিস আর যাব না। রাজমহলে রাজনীতি দেখে-দেখে আমি বিষিয়ে উঠেছিলাম। এই চিন্তা মাথায় নিয়েই আমি আমার এলাকার পথ ধরে এগুতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ নুশির কথা মনে পড়ে গেল যে, এমনও তো হতে পারে, নুশি বিলবিস ফিরে গেছে। তখন তো সে দু-চারজন সৈনিক পাঠিয়ে আমাকে গ্রেফতার করে নিতে পারে। অগত্যা আমি সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যেই বিলবিসের দিকে রওনা হলাম।

ভৃত্য পথে নুশি ও তার হবু স্বামীর লাশদুটো দেখে ওখানেই থেমে গেল। লোকদুজন কীভাবে মরল আব্বাস ভৃত্যকে তার কাহিনী শোনাল। তারপর বলল, তুমি যদি বিলবিস যাও, তাহলে নুশির বাবা-মাকে অবহিত কোরো ও কীভাবে ও মারা গেল। কিন্তু ভৃত্য বলল, এখন আর আমার বিলবিস যাওয়া হবে না। আমাকে এখন নিজের গ্রামেই চলে যেতে হবে। কারণ, আশঙ্কা আছে, নুশির পিতা সত্যাসত্য যাচাই না করে এর দায়টা আমার উপর চাপিয়ে দেবেন এবং এর শাস্তিটা আমাকেই ভোগ করতে হবে।

এসব আব্বাস ইবনে তালহার বিষয় ছিল না। নুশির পিতামাতা সংবাদটা পেল কি পেল না, বেদুইন ভৃত্য বিলবিস যাবে, নাকি নিজের গোত্রে ফিরে যাবে এসবের সঙ্গে আব্বাসের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আব্বাস ঘোড়ার মুখটা ফরমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

* * *

দেড়-দুদিন পথ চলার পর আব্বাস ইবনে তালহা ফরমা পৌঁছে গেলেন এবং সোজা সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কাছে চলে গেলেন। আমর ইবনে আস (রাযি.) তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের যে-ব্যবস্থাপনা সমগ্র মিশরে জালের মতো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আব্বাস ইবনে তালহা তারই একজন সুযোগ্য ও বিচক্ষণ

সদস্য। গুপ্তচরবৃত্তির মিশন সম্পন্ন করে এক মাস কয়েকদিন পর এখন তিনি ফিরে এলেন।

'নতুন কোনো খবর এনেছ কি?' আমর ইবনে আস কোনো ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞেস করলেন।

আব্বাস ইবনে তালহা সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে তার গোয়েন্দাগিরির পূর্ণ বৃত্তান্ত উপস্থাপন করলেন। শেষে নুশি ও হামুনের কাহিনীও শোনালেন। একটা কথাও বাদ রাখলেন না এবং খানিক বিশ্লেষনের সাথেই শোনালেন। সিপাহসালার আব্বাসকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন, তুমি খামোখা পরের ব্যাপারে নাক গলাতে গেলে কেন! এমনও তো হতে পারত, তুমিই বরং তার হাতে খুন হয়ে যেতে!

'আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ ছিল না সিপাহসালার!'– আব্বাস ইবনে তালহা বললেন– 'আমি মেয়েটের জবানিতে শুনলাম, ও দুটা মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে। এক. বেদুইনদের ও রোমান বাহিনীতে যুক্ত করবে। দুই. বেদুইনদের যে-বাহিনীটা আমাদের সঙ্গে আছে, প্ররোচনা দিয়ে আমাদের থেকে তাদের সরিয়ে নিবে। তখন পরিচয় বদল করে আমি তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া কর্তব্য জ্ঞান করলাম। ভাবলাম, আমাকে দেখতে হবে, এরা কী করে এবং কতখানি সাফল্য অর্জন করে। বিষয়টা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ছিল।...

'ওই হামুন জাদুকরটাকে আমি অন্য এক কারণে হত্যা করেছি। ও মেয়েটার প্রতি হাত বাড়িয়েছিল এবং তার অমতে তার সম্ভমহানি ঘটাতে চেয়েছিল। আরেকটা কারণ হলো, আমি জানতে পেরেছি, বেদুইননেতাদের উপর তার এতই প্রভাব যে, তারা ওর কথায় ওঠে-বসে। চিন্তা করলাম, মেয়েটাতে হাত করার জন্য হয়ত সে বেদুইননেতাদের বলে দেবে, একটা নিজস্ব বাহিনী গঠন করে তোমরা রোমান ফৌজে পাঠিয়ে দাও। হামুনকে হত্যা করে আমি এই শঙ্কাটাও দূর করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত রাজপরিবারের এই মেয়েটাও মারা গেল, ওর হবু স্বামীও প্রাণ হারাল। এখন আর এমন কোনো ভয় নেই যে, উক্ত অঞ্চলের বেদুইনরা রোমানদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে আর আমাদের সঙ্গে থাকা বেদুইনরা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাবে।...

'আরও একটি বিষয় দেখুন মাননীয় সিপাহসালার! ওদের থেকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে গেছি। কোনো-কোনো তথ্যের সত্যায়নও হয়ে গেছে। এই তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল যে, মিশরের প্রতিরক্ষা কীভাবে করবে এ ব্যাপারে মুকাওকিস ও আতরাবুন এক মত নয়। মুকাওকিস সাবধানি পন্থা অবলম্বন করতে চাচ্ছে আর আতরাবুন যুদ্ধের পক্ষে। ওই রোমান মেয়েটা আমাকে বলেছিল, হেরাকল তাদের দুজনকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু পাশাপাশি বলে রেখেছে, কিবতি

খ্রিস্টানদের উপর চোখ রাখবে, পাছে ওরা বিদ্রোহ করে বসে। তা-ই যদি ঘটে যায়, তাহলে মুসলমানদের হাত থেকে মিশর রক্ষা করা সম্ভব হবে না।...

'মেয়েটা রাজপরিবারের সন্তান ছিল। তাই আমি তার প্রতিটি কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছি। হেরাকল-এর বিরুদ্ধে ও ঘৃণা প্রকাশ করছিল আর বলছিল, আমাদের সম্রাট সাহস হারিয়ে বসে পড়েছেন। শামের পরাজয় তার কোমর ভেঙে দিয়েছে। এখন মিশর থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছেন বোধহয় এজন্য, আরেকটা পরাজয়ের দাগ যেন তার মাথায় না লাগে।'

'এই বেদুইনরা আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না'– আমর ইবনে আস বললেন– 'ফরমার গনিমত আমাদের নিজস্ব বাহিনীতে যে-হিসাবে বণ্টন করেছি, তাদেরও একই হিসাবে দিয়েছি। তারা খুবই খুশি।'

'ফয়সালা তো শেষ পর্যন্ত আপনিই নেবেন মহামান্য সিপাহসালার!' আব্বাস ইবনে তালহা পরামর্শ দিলেন– 'আমি যা-কিছু দেখে এসেছি, তার আলোকে আমার পরামর্শ হলো, মদিনার সাহায্যের অপেক্ষা করা ঠিক হবে না এবং অনতিবিলম্বে অগ্রযাত্রা করে বিলবিস পৌঁছে যাওয়া দরকার। রোমানদের আত্মসংবরণ ও নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দেবেন না। ওদের চিন্তা করার মওকা দেবেন না।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)-এর কারও পরামর্শের প্রয়োজন হতো না। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সাহসী ছিলেন। হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাযি.)-এর সবগুলো গুণই তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। হযরত ওছমান (রাযি.) আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)কে বলেছিলেন, আপনি মিশর-অভিযানের অনুমতি দেবেন না। কারণ, আমর ইবনে আস খালিদ ইবনে অলীদ-এর মতো অবলীলায় এমন-এমন ঝুঁকির মধ্যে লাফিয়ে পড়ে, যেখানে গোটা বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে।

ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, সিপাহসালার আমর ইবনে আস সহযোগী বাহিনীর অপেক্ষায় থাকার পক্ষে ছিলেন না। তিনি আগেই বাহিনীকে প্রস্তুত অবস্থায় রেখেছিলেন এবং অধীন সালার ও কমান্ডারদের বলে রেখেছিলেন, শত্রুবাহিনীকে তটস্থ রাখতে হবে এবং ওদের নিঃশ্বাস ফেলার সময়টুকুও দেওয়া যাবে না।

* * *

নুশি যখন বেদুইন পল্লীতে গিয়ে পৌঁছেছিল, ততক্ষণে তার পরাজিত সেনাপতি পিতা বিলবিস গিয়ে উপনীত হলো এবং ফরমার পরাজয়ের দুঃসংবাদ শোনাল। শুনে ওখানকার সবাই পাথরের মতো মূক হয়ে গেল, যেন মৃত্যুর নীরবতা তাদের ছেয়ে ফেলেছে। তার বাহিনীর বিক্ষিপ্ত সৈনিকরা যখন একজন-একজন, দুজন-দুজন করে বিলবিস পৌঁছল, তারা মুসলমানদের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার এমনসব কাহিনী শোনাল যে, বিলবিসে যে-বাহিনীটা ছিল, তারাও আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

দুজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, রোমান বাহিনীতে খবর চাউর হয়ে গিয়েছিল, মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা অনেকই কম দেখা যায়। কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তখন তাদের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তাতে এই প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়ে গেল যে, মুসলমানদের মাঝে কোনো একটা রহস্যময় ও অদৃশ্য শক্তি আছে। নাহয় মানুষ এভাবে লড়াই করতে পারে না।

গুপ্তচররা সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রাযি.)কে রোমান বাহিনীর এই অবস্থাটাও অবহিত করে রেখেছিল। এটি সেই জিহাদি চেতনার কারিশমা ছিল, ইসলামের সৈনিকরা যার দ্বারা সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁরা সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে রেখেছিলেন।

সংঘাতমুখর দুটি শক্তির জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্ত যুদ্ধের মাঠেই হয়ে থাকে। ইতিহাস সেই সৈনিকদেরই, সেই সেনাপতিদেরই কাহিনী শোনায়, যারা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে। কিন্তু যুদ্ধের অন্তরালে এমন কিছু ড্রামাও খেলা হয়, যার ইতিবৃত্ত অনাগত প্রজন্মের কাছে বলতে গেলে পৌঁছেই না। এগুলো সেই লোকগুলোর একান্ত নিজস্ব উপাখ্যান বলে বিবেচিত হয়, যারা রণাঙ্গন থেকে দূরে এমন কিছু ভূমিকা পালন করে, যা জয়-পরাজয়কে প্রভাবিত করে। কিন্তু তাদের সেই কাহিনী ইতিহাসে জায়গা পায় না।

তাদের মাঝে গাদ্দারও থাকে এবং নুশি-আব্বাসের মতো সেই চরিত্রও থাকে, যারা চেতনা দ্বারা উন্মাতাল হয়ে জীবনের বাজি লাগায়। তাদের সামনে জাগতিক কোনো স্বার্থের লোভ থাকে না। নুশি এমনই একটা মেয়ে ছিল, জাতীয় চেতনা যাকে পাগলিনী বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যত যা-ই হোক ছিল তো ও মানুষ। আবার টগবগে সুন্দরী যুবতী। এ জাতীয় কাহিনীগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বুক থেকে বুকে এসে পৌঁছায় কিংবা কোনো কাহিনীকার এসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে অনাগত প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে যান।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

design : shakir ahsanullah

ISBN : 978-984-91933-4-0
978 984 91933 4 0

অনিঃশেষ আলো-২

আলতামাশ

Anisshesh Alo-2

Altamash